প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭, এপ্রিল ১৯৬০

উৎসর্গ

বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রথম
মঞ্চালোকবিজ্ঞানী প্রাতঃস্মরণীয়
সতু সেন স্মরণে—

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ : নাট্যনিবন্ধ : নাট্যবিজ্ঞান (চারখণ্ড)—১. মঞ্চস্থাপত্য, ২. অভিনয়বিজ্ঞান, ৩. প্রয়োগবিজ্ঞান, ৪. মঞ্চালোকবিজ্ঞান ; নাটক ও রাজনীতি ; গিরিশচন্দ্রের নাট্যচিন্তা ; আন্তর্জাতিক নাট্যচিন্তা ; প্রাগার্য ভারতে নাট্যকলা ; **নাটক :** জনক-জননী, সেমসাইড, বনবাস, বিবিবিলাস ; **গল্পগ্রন্থ :** প্রজাপতির রঙ, প্রথম পরশ, শ্রেষ্ঠ গল্প ; **উপন্যাস :** বলেশ্বরী, অতসী, দিবস রজনী, উপকণ্ঠ, বিহঙ্গবিলাস, সীমাহীন, নিশিরঙ্গ, চিৎপুর চরিত্র ।

বিষয়-সূচী

বিষয় মঞ্চালোকবিজ্ঞান

১.

"আলোর সেই অনির্বচনীয় অনুরণনের ক্ষমতাকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে হাজির করা হলো"… বিশ্ববিখ্যাত মঞ্চালোকবিজ্ঞানী, ইয়েল স্কুল অফ ড্রামার শিক্ষক ডোনাল্ড ওয়েনস্লেজার খুব অল্প কথায় মঞ্চালোককলা প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ রচনা করে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। প্রবন্ধটির নাম 'লেট দেয়ার বি লাইট'। এই প্রবন্ধের ১৪ অনুচ্ছেদে তিনি বললেন, "সাহসের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে শিল্পীর, স্থপতির, কবির কল্পনাকে লাগানো হলো কাজে—যেমন করে ছেনি বা তুলির ব্যবহার হয়, তেমনি করেই মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর সঙ্গে মিলে, আলোকে ধরে তাকে ব্যবহার করতে হবে গতিবেগ সৃষ্টির জন্য। আলোর আল্পনায় তৈরি হবে নতুন নতুন কারুকর্ম। ফাঁকা মঞ্চসীমার মধ্যে নানা রূপে বহুরূপী আলো বিকশিত হবে যেমন: দৃশ্যমান আলো, উত্তপ্ত আলো, স্নিগ্ধ ও কালো আলো। আর এরাই নব নব সাজে, রঙেঢঙে মঞ্চকে তৈরি করবে মায়ার পট, বাস্তব পটও। সব সময় মনে রাখতে হবে ম্যাজিকই হচ্ছে থিয়েটারের মূল মন্ত্র।…"এই কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবাদ রয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। আসলে আমি বলতে চাই, থিয়েটার হচ্ছে মানুষের কল্পনাকে, জীবন ও সমাজের ছবিকে রূপ দেবার বাস্তব ল্যাবোরেটারী।

উপরোল্লিখিত মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে জানতে হবে, মঞ্চে আলাকসম্পাত-এর প্রকৃত অর্থ কী। আমরা শিখেছিলাম: অভিনয়শিল্পীরা মঞ্চের যে-সব এলাকায় অভিনয় করবেন, চলাফেরা করবেন, সেই সব জায়গাগুলোতে ঠিকমতন আলোকসম্পাত করাই হবে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাজ। এর মানে নিশ্চয় এই যে, কেবলই অভিনয়-শিল্পীর চোখমুখের অভিব্যক্তি, দৈহিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকে স্পষ্ট করে দেখাবার জন্যেই আলোক-প্রক্ষেপণকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করা হবে। এবং তা করতে হবে সাধারণভাবেই। কিন্তু আলোক-সম্পাতের এই মূলমন্ত্র তথা নীতি ও পদ্ধতি সময়, সভ্যতা, সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেছে অনেক। এখন মনে করা হয় দৃশ্যসজ্জাকে প্রাধান্য না দিয়ে কেবল অভিনয়শিল্পীর ওপর আলোকে ধরে রাখা নীতি বহির্ভূত কাজ। অভিনয়শিল্পীদের অভিনয়ের বিশদকে অবশ্যই আলোকিত করা হবে, তবে আলোক-পরিকল্পনা যদি এমন হয় যে, ওই আলোতেই মঞ্চদৃশ্যগুলির বিশদ দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে—তবে সেটাই হবে মঞ্চালোকবিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার। বিশ্ব-

বিখ্যাত মঞ্চালোকবিজ্ঞানীরা বলেছেন : একটি দৃশ্যকে আলোকিত করার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, শুধুই দৃশ্যপট বা দৃশ্যসজ্জাকে আলোকিত করাই মঞ্চলোকবিজ্ঞানের শেষ কথা। যদিও অধিকাংশ মঞ্চসজ্জাই (সাধারণ) অভিনয়শিল্পীর অভিনয়াংশের প্রক্ষেপিত আলোতেই মোটামুটি বিকশিত হবার সুযোগ পেয়ে থাকে। কারণ মঞ্চসজ্জা, এখানে, নাট্যিক ক্রিয়ার সঙ্গে একটা সঠিক সম্পর্কের পরিমাপ মতোই দর্শকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়তে বাধ্য। এই যুক্তিকে বর্তমান যুগে মেনে নেওয়া কি সঙ্গত? একেবারেই না। কারণ, যে-সব নাটো দৃশ্যের বিশেষ বিশেষ পরিবেশ অথবা আসবাবপত্র-এর অধিকতর জোরালো ভূমিকা থাকে, সেখানে অবশ্যই দৃশ্যসজ্জা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রকে তার প্রাধান্য অনুযায়ী গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য।

মঞ্চালোকের গতিপ্রকৃতি ও তার নাট্যিক বিকাশভঙ্গির সিঁড়িগুলোতে পা দেবার আগে অতীতের দিকে একবার তাকালে ক্ষতি কী? তখন অন্ধকার ভাবলেশহীন সময়—যখন এই বিশ্বের, এই জগতের পরিচিত, অপরিচিত কোনো চেহারা সম্পর্কেই কারো স্পষ্ট ধারণা ছিলো না, থাকার কথাও নয়। ছিলো না কোনো নাটকের পাণ্ডুলিপি—তখন বিধাতা পুরুষ নাকি চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, "আলো, আরও আলো চাই।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বিশ্বচরাচর আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো। আলোর যতো ভালোগুণ তা রূপে রঙে ধরা পড়লো। অন্ধকার ছিলো বলেই আলোর গুরুত্ব স্বীকৃতি পেলো। আবার আলোকচ্ছটায় বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত হলো বলেই অন্ধকারেরও কিন্তু গুরুত্ব বেড়ে গেলো অনেক।

কে দিয়েছিলো সেই আলো? সূর্য। যে সূর্য আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উৎস। সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাত থেকেই আমরা সূর্যালোকের কোলে স্নেহার্দ্র শিশুর মতন। কেবল তাই কি? না। এই বসুন্ধরা সূর্যের আলো এবং শক্তিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করছে এবং নানা রূপে, নানা বর্ণে প্রকৃতির লীলাভূমিতে তা করেছে প্রতিফলিতও। আমাদের এই জীব শরীর পর্যন্ত গাছগাছালি, লতাপাতা ফুল, নদী, পাহাড়ের মতো আলো দিয়ে গড়া নয়? মানুষের চলাফেরা, ওঠানামা—শরীরিক সব রকমের ক্রিয়াকর্ম তো আসলে আলোরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টির কথাই বলো, অথবা আনন্দ উদ্ভাসিত মুখ, বিষন্ন চোখ, আবেগ মথিত বিম্বোষ্ঠ কিংবা ক্রোধের আগুনে দীপ্ত রক্তিম মুখভঙ্গির কথাই বলা হোক—এ সবের মূলে রয়েছে আসলে আলোই। ভাবের আদানপ্রদান-এর প্রধান মাধ্যম হলো এই আলো। এই আলো আর কী কী করে? আমাদের মনের অন্ধকার কোণগুলোকে স্বচ্ছ নির্মল করে তোলে। তার মানে তো এই যে অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত

কোনো সৃষ্টিই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত আমারা বলে থাকি যে অমুক অভিনয়শিল্পী তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পবোধ-এর গভীরতা পরন্তু উপলব্ধি দিয়ে চরিত্রটির ওপর আলোকপাত করলেন। কথাটা কি ঠিক। কিন্তু ওই সময়ে মঞ্চের আলোগুলো যদি মঞ্চালোকবিজ্ঞানের পরিকল্পনাকে না মেনে যা-খুশি, যেমন খুশি জ্বলতো, নিভে যেতো—তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াতো ?

আলোকিত দিবা এবং রাত্রির অমা অন্ধকার আমাদের জীবনের সঙ্গেই মিলেমিশে রয়েছে। বলা হয়েছে ট্রাফিক লাইটের আলোর মতনই আমাদের জীবনের গতিবিধি এবং কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে আলো। বিজ্ঞান সেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করেই তো অন্ধকার মঞ্চে আলো জ্বালে : আবার আলোর মধ্যে টেনে আনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কিন্তু এখনও কি বলা যায়, আমাদের আলোক ব্যবহার ও প্রক্ষেপণের কেরামতি সত্যি সত্যিই প্রাকৃতিক আলোর জাদুকরী বিস্ময়কে অতিক্রম করতে পেরেছে ? শ্রীওয়েনপ্লেজার বলেছেন : মনে করা যাক সেই অদ্ভুতদর্শন সামুদ্রিক প্রাণীর কথা—যারা স্মরণাতীত কাল থেকে গভীর সমুদ্রের তলদেশের অতল অন্ধকারে তাদের মাথায় বসানো হেডলাইট, সার্চলাইটের আলোয় পথ চিনে নিচ্ছে। অথবা ভাবা যাক নিউজিল্যাণ্ডের প্রস্তরাচ্ছাদিত অন্ধকার গুহাগর্ভের সেই সব প্রাণীর কথা, যাঁরা অনাদি অনন্তকাল ধরে নিজ নিজ দেহস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-বর্তিকা জ্বেলে চলাচল করছে। জোনাকীর স্নিগ্ধ আলোর জন্য তাকে সূর্যের সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ করতে হয় না।

২.

শুধু থিয়েটার কেন, অঙ্কনচিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতিবিদদের কাছে আলোই সর্বপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম—যা ভিন্ন এ-সব শিল্পসৃষ্টি হওয়াই সম্ভব নয়। রেমব্রাণ্ট, ভ্যানগগ, থেকে শুরু করে আজকের বিখ্যাত শিল্পীরাও আলোকবোধ থেকেই নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করেছেন। এখানে আলোর নতুন নতুন অনুভূতি ও উপলব্ধিকে কাজে লাগানো হয়েছে। আলো এখানে গতি ও ছন্দের রূপ পেয়েছে। এবং এ-পথ ধরেই এসেছে মঞ্চালোকবিজ্ঞান।

কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে নাট্যে আলোর কাজ করা কি সম্ভব ? না। আগে এবং এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ মঞ্চালোকবিজ্ঞানী একজন খ্যাতানামা মঞ্চালোক-নির্দেশকের অধীনে হাতে কলমে কাজ করতে করতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। এই দক্ষতাকে বলা যায় কারিগরী জ্ঞানলাভ। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনশীল প্রতিভা, উপলব্ধির গভীরতা কি এই পথে আসা সম্ভব ? না। একজন মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে যদি

প্রশ্ন করা যায়, আলো আসলে কী এবং কেন ? তাঁর পক্ষে জবাব দেওয়া কঠিন। আসলে 'আলোকবিজ্ঞান' সম্পর্কে পড়াশোনা না করে এই বিজ্ঞানের অ-আ -ক-খ না জেনেই তিনি কাজ করছেন। আমি অদ্যাবধি প্রকাশিত প্রায় অর্ধশতাধিক মঞ্চালোক-বিজ্ঞানের গ্রন্থ সংগ্রহ করে দেখেছি, প্রত্যেকটিতেই আলোচনা রয়েছে কেবলই মঞ্চালোক রচনা সম্পর্কে। কেউ বলেননি, আলোকের কেমন প্রতিফলনের জন্য পুকুর পাড়ে অবস্থিত কোন ছায়া কেমন আঁকাবাঁকা হয়, বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের বেলায় রশ্মির আপতন কোণ কতো ডিগ্রি হওয়া উচিত। রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল, অভিসারী, অপসারী, নামে কেন চিহ্নিত হয়েছে ? সদ্ ও অসদ্ প্রতিবিম্ব বলতে কী বোঝায় ? কাকে বলা হয় ছায়া ? প্রতিবিম্ব কতো রকমের হতে পারে ? আলোকের প্রতিসরণ কি ? আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলতে কী বোঝায় ?—এ-রকমের লক্ষ প্রশ্নের কোনোটাই তাঁর জানা নেই, কারণ আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁর কম। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানলাভ করে মঞ্চালোকবিজ্ঞানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন তবে তাঁর জ্ঞান এ-ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারবে নতুন নতুন সৃজনশীল বিজ্ঞাননির্ভর মায়া। এ-জন্য নাট্যবিজ্ঞান-৪কে আমি দু' পর্বে ভাগ করলাম : (১) আলোকবিজ্ঞান, (২) মঞ্চালোকবিজ্ঞান।

আজ থেকে আট বছর আগে মঞ্চালোকবিজ্ঞান-এর পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করেছিলাম। এই আট বছর মধ্যে প্রযুক্তি, পদার্থ ইত্যাদি বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন নতুন সূত্র, তথ্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। মঞ্চালোকবিজ্ঞানও বসে নেই। সুতরাং পুরনো পাণ্ডুলিপি বর্জন করে নতুন করে এ-কাজটি আবার সম্পন্ন করতে হলো। আমার বিশ্বাস এ-পথেই মঞ্চালোকবিজ্ঞানের সকল রহস্য উন্মোচিত করা সম্ভব হয়েছে। এবং এ গ্রন্থ পাঠ করে যারা জীবিকা হিসেবে এই বিজ্ঞানকে বেছে নেবে তাদের জ্ঞানের পরিধি কিছুতেই সংকীর্ণ থাকবে না।

৩.

আজ বলা হচ্ছে, মঞ্চে উৎকৃষ্ট আলোকযন্ত্র ও তার সাজসরঞ্জাম চাই, যদি ভালো, সার্থক নাট্য পরিবেশন করতে হয়। তবে এই সূত্রে আধুনিক প্রযোজনার জন্য আলোকযন্ত্রের একটি তালিকা যুক্ত করছি—যা একান্ত প্রয়োজন :

(a) **A switch-board with preset control to obtain mobility,**

(b) **A multi Capacity electronic dimmer.**

(c) **Suitable mechanical dimmers for fluorescent tubes.**

(d) **Radar control of electrical equipment.**

(e) **A high-wattage lamp that remain cool.**

(f) A lamp capable of such control that any desired colour can be produced.

(g) A lamp that will dim without growing worm in tone,

(h) A spot light with accurate, simple control and focusing apparates.

(i) A spot-light capable of throwing light without spill.

(j) Shadowless illumination.

(k) Greater variety of hit resisting glass colour filters.

(l) Stereoscopic projected scenery to be obtained by better colours and with more compact and more intense light source.

এ-কাজে অর্থকরী দিকটার ওপর চাপ পড়বে নিশ্চয়। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, উন্নতমানের থিয়েটারের জন্য চাই উন্নতমানের মঞ্চালোকবিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি। এখানে একটি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, "Painters sculpters and architects intuitively respond to every mood of light and instinctively seize full advantage of its special characteristic. In their hands light reveals character, define scales, meazures time and gives substance to shadow. Light they convert into motion and rhythm. With light they touch off the inner spark of marble. bronze, wood and pigment...Come back now to the stage of the theatre. Bring back the interpretative power and abstruct beauty of light with you. Summon it forth onto the scene with the artists sensitivity. Adopt the bold, visionary approach of the painter, the sculpter and the architect. Handle light with the brush or the chisel or the rule. Conspire with the lighting engineer. Release and set light in motion. Draw light ptterns from the empty air like cloud forms. Allow light to clothe the bare stage with visible light, black light, Cold light. warm light. Never forget that magic is legitimate in the theatre and that the theatre is a laboratory for the imagination. On your stage defy space and time. Fire the beacon in the actors eye. Sensitize the scene."

মঞ্চের অন্ধকার দূর করতেই মঞ্চালোকের প্রয়োজন বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের উদ্দেশে বলি, অন্ধকারকে বাদ দিয়ে যেমন আলোর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি আলোকবিহীন নিরঙ্কুশ অন্ধকার মানেই তো মৃত্যু। শিল্প তথা আর্ট মৃত হতে পারে না। মঞ্চের ক্ষেত্রে আমরা বলি আলোছায়া। তার মানে আলো এবং অন্ধকার। এ আঁধার গাঢ় না হতে পারে কিন্তু মিহি তো? তা ছাড়াও আমার বলার কথা, যে মঞ্চালোকবিজ্ঞানী সঠিক অন্ধকার তৈরি করতে জানেন না, সময় মতন আনতে পারেন না অন্ধকার কিংবা আঁধিয়ার চাদরটিকে নির্দিষ্ট সময়ে সরাতে পারেন না—তাঁর এ-পথ থেকে সরে থাকাই ভালো। একটি দৃশ্যের উপমা যুক্ত করছি এখানে: প্রচণ্ড জল ঝড়ের রাত্রি। অন্ধকার সূচিভেদ্য। মঞ্চের আপার রাইট অংশে একটু গেস্ট হাউসের আভাস। তার আশপাশের গাছ গাছালি ভয়ঙ্কর ঝড় বাদলে আথালিপাথালি খাচ্ছে। এমন সময় দূর থেকে একটি মোটর কার এর হেড লাইটের আলো এসে পড়লো। গাড়িটি

এদিকেই আসছে। হেড লাইটের আলোর জোর বাড়ছে। এবার মঞ্চালোকবিজ্ঞানী আলোর কাজ করতে গিয়ে অন্ধকারকে কাজে লাগাবেন তো? এবং জায়গা বিশেষে, গাছের ঝুলুনিতে ওই অন্ধকারের পরিমাণের পরিমাপ করতে হবে। তা হ'লে কেমন করে বলি মঞ্চের অন্ধকার দূর করতেই মঞ্চালোকের প্রয়োজন? যদি আঁকা দৃশ্যপট থাকে এবং তাতে থাকে সূর্যের আলো—সেখানে পরিমাণ মতো আলো না ফেললে সেটা সূর্যালোক হয়ে উঠবে না কিছুতেই।

কীভাবে মঞ্চালোকবিজ্ঞানী তার লোকজনদের নিয়ে কাজ করবে এবং প্রয়োজনীয় আলোর অল্পনা আঁকবে এখানে তার নির্দেশজনিত একটি নমুনা যুক্ত করছি: *All right Jake, give me no 19 spot on the pipe. Hit the steps. Now tip it down—further still Pull your focus back. Sharpen it up more—way back. Watch your spill on the wall. A high hat will help? Pass a high hat upto Jake. Now you've lost your position. Hit the steps again—ok. Give it a combination 53 and 3.*

Now Joe, are you on the board? Take no. 1. down easy—to 3 points up a hair. Now gang No 19 up with No 15 and No. 11. Jack (he is the stage manager) take this reading: during Act 11 on cue 6, Miss Bankheads exit, this hook-up will dim out on the count of 8 along with the circuit of left blue booms. Check? Ok, now lets try it.

৪.

নাট্যবিজ্ঞান রচনার কাজ শুরু করেছিলাম ১৯৬২ সালে। প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে স্থির করেছিলাম মোট চারটি খণ্ডে গ্রন্থটি সমাপ্ত করবো। তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পর প্রচুর পত্র আসে। সকলেরই বক্তব্য এক: স্টেজ-লাইটিং এর ওপর সহজবোধ্য কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নেই। আমি যেন তিনটি খণ্ডের মতোই চতুর্থ খণ্ডটি কেবলমাত্র স্টেজলাইটিং-এর ওপর রচনা করি। শর্ত হলো সর্বজনবোধ্য করার। বহু নাট্যকর্মী, শিল্পী, গবেষক, নাট্যামোদীদের ক্রমাগত অনুরোধ আসতে থাকে। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, পড়াশোনার মাধ্যমে জানা, বোঝা ইত্যাদি অনুযায়ী গ্রন্থটি অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে রচনার কাজ শেষ করার চেষ্টা করেছি। এ-কাজে আমার বিশেষ লক্ষ্য: যাতে পঠন পাঠনের-এর কাজে লাগে গ্রন্থটি এবং শিক্ষার্থীরা এ-গ্রন্থ পাঠ করে, হাতে কলমে অনুশীলন করে মঞ্চালোকবিজ্ঞানে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। এই সঙ্গে উল্লেখ থাকে যে, পূর্বঘোষিত চারখণ্ডে প্রকাশিত নাট্যবিজ্ঞান প্রকল্পের এটিই শেষ খণ্ড।

২৮, ৭, ১৯৮৬

মধ্যালোকবিজ্ঞান / পর্ব ১

আলোকবিজ্ঞান

আলোকবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার-সুবিধার্থে সচিত্র ব্যাখ্যার প্রচলিত উদাহরণ।
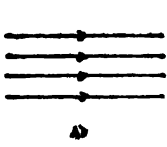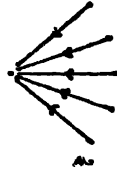
সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ   অপসারী রশ্মিগুচ্ছ   অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ

চিত্র A৪ A৫ / লেন্সের মধ্য দিয়ে পাঠানো রশ্মিগুচ্ছ
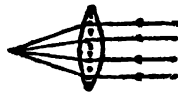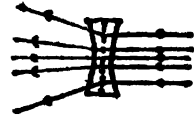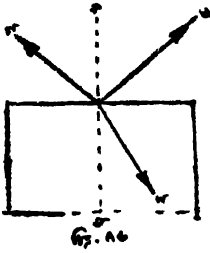
চিত্র / A৩ আলোকরশ্মির প্রতিফলন ও প্রতিসরণ

চিত্র A৭ / নিয়মিত প্রতিফলন, বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

চিত্র A১৮ / প্রিজম
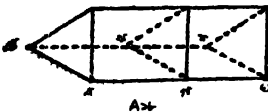
চিত্র A৮ / বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

চিত্র A৯ / আপতন কোণ, প্রতিফলন কোণ

চিত্র A১০ / সদবিম্ব গঠন

চিত্র A১১ / অসদবিম্ব গঠন

ছায়ার পরিমাপ
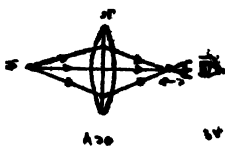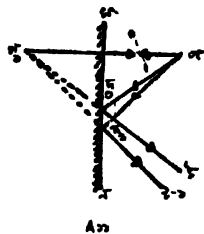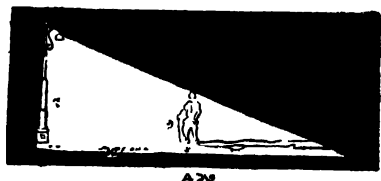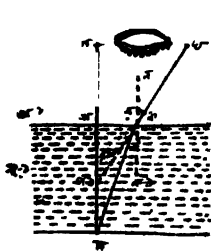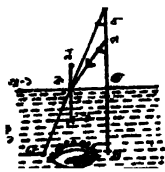
লক্ষ্যবস্তু ও মাধ্যম / ১

লক্ষ্যবস্তু ও মাধ্যম / ২
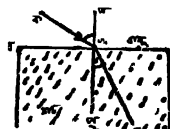
প্রতিসরণ-এর বিশদ
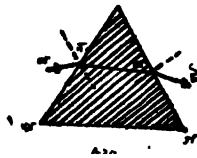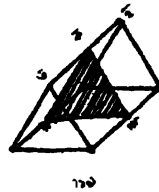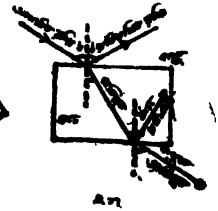
চ্যুতিকোণ   প্রিজম   ঘন মাধ্যমে প্রতিসৃত
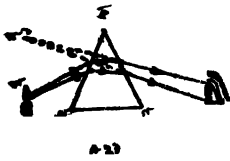
প্রতিসারক মাধ্যম   উত্তল ও অবতলোত্তল লেন্স   অন্যান্য লেন্স
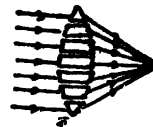
অবতল লেন্স   উত্তল লেন্স দ্বারা সমতল রশ্মিগুচ্ছের রূপান্তর
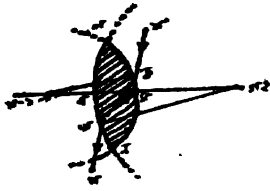
লেন্সের আলোক কেন্দ্র
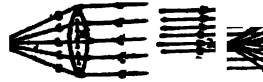
উত্তল ও অবতল লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস
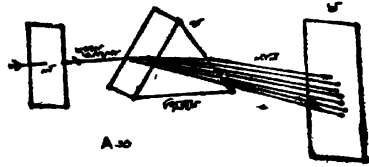
শাদা আলোর বর্ণ বিভাজন
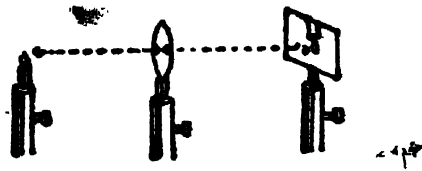
উত্তল লেন্স কর্তৃক প্রদীপ শিখার প্রতিবিম্ব রচনা
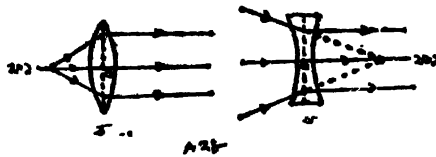
উত্তল ও অবতল লেন্সের প্রথম মুখ্য ফোকাস

১.

আলোকের উৎস ও প্রতিফলন : উৎস, সক্রিয় অণু, ফোটন, উৎপাদন ও উৎপন্ন আলো, আলোক ও শক্তি, প্রাকৃতিক আলো, কৃত্রিম আলো, আলোর প্রকৃতি, অবাধত্ব ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, আলোক প্রভব ; আলোক মাধ্যম, আলোকরশ্মি ও রশ্মিগুচ্ছ, আলোক প্রতিফলন, নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ; প্রতিবিম্ব, সদ ও অসদবিম্ব, ছায়া, ছায়ার পরিমাপ···

আলো আসল যে কী—হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তা জানতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে কিন্তু তার আসল রহস্য কিছুতেই উদ্ধার করা যায়নি তখন। তারপর একদিন মানুষ ভাবতে শিখলো, আলো আসলে আমাদের চোখ থেকে নির্গত এক জ্যোতির ঝর্ণা—যা, যে-কোনো বস্তুর ওপর পড়লেই অথবা বস্তু থেকে ধাক্কা খেয়ে আবার চোখে ফিরে আসে বলেই আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। যদি চোখের রশ্মির সামনে কিছু রেখে বাধার সৃষ্টি করা হয় তবে কি বস্তুটি দৃশ্যমান হতে পারে ? পারে না—এই অবৈজ্ঞানিক ধারণা একদিন ভুল প্রতিপন্ন হলো। দীর্ঘ ১৬০০ বছর ধরে বৈজ্ঞানিকরা আলো সম্পর্কে নানা গবেষণা করলেন, বহু তথ্যও আবিষ্কৃত হলো। অতঃপর ধরা পড়লো 'আলোক' নামক শক্তির রূপান্তর ঘটতে পারে এবং তা স্বাধীন-ভাবে ছড়িয়েও পড়তে পারে। তাই যদি হয়, তবে আলোক নামক শক্তির আসল ব্যাখ্যা কী হতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তর : রশ্মি বিকিরণ। কার রশ্মি ? আলোর। এই বিকিরণই এক মহাশক্তি। এবার প্রশ্ন হতে পারে : রশ্মি বিকিরণই কি এক প্রকার ? উত্তর : না। তারও বিকাশরূপ অনেক রকমের এবং তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা। যেমন : অবলোহিত রশ্মি, বেতার তরঙ্গ, অতি-বেগনী রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি ইত্যাদি। আমরা হয়তো জানি না যে, রশ্মি-বিকিরণ-শক্তির খুব অল্প অংশমাত্রই আমরা চোখে দেখতে পাই। আর এই অংশেরই নাম দৃশ্যমান আলো অর্থাৎ সাধারণ আলো। এই আলো আসছে কোথা থেকে ? এটা হতে পারে পরবর্তী প্রশ্ন। তারপরের প্রশ্নগুলো হবে : প্রাকৃতিক আলো বলতে কী বোঝায় ? বস্তুর সংস্পর্শে আসার পর আলোর আচরণ কী এবং কেমন হতে পারে ? আলোর পরিমাপ কি সম্ভব ?

ওপরের প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হ'লে আমাদের যেতে হবে সেই অজানা অচেনা জগতে যেখানে রয়েছে আলোর উৎস।

আলোর উৎস

আসলে আমরা যা যা দেখি, তার মধ্যে প্রধান হলো সূর্য। তারপর জলন্ত বাতি বা প্রজ্জলিত আগুন। কেন? কারণ তারা আলো ত্যাগ করে বা বিনির্গত আলোক-শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। এ-জন্যই বলা যেতে পারে, এরাই আলোর উৎস। কিন্তু এমনও তো লক্ষ কোটি বস্তু রয়েছে এ জগতে—যা আলোকশক্তি ত্যাগ করে না, করতে পারে না—তারাও আমাদের চোখে দৃশ্যমান হয়। কেন হয়? হয়, কারণ উৎস থেকে বিনির্গত আলো ওই সব বস্তুর ওপর পড়ার পর তারা আলোকিত হয় বলেই আমাদের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে এবং আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই।

বিজ্ঞান আলোর উৎসকে দু'ভাগে ভাগ করেছে: (ক) প্রাকৃতিক; (খ) কৃত্রিম। প্রাকৃতিক আলো আসে এমন উৎস থেকে—যা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধিকারের বাইরে। যেমন: সূর্য, অনন্ত নক্ষত্ররাজি। আর কৃত্রিম আলো আসে এমন উৎস থেকে, যা মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—যেমন: বাতি, বৈদ্যুতিক আলো। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে, সব রকমের আলো—সে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যাই হোক; তা আসে ক্ষুদ্রতম অণু নামক অংশ থেকে। এই অণুকে বলা হয় পরমাণু (atom)। আর আমরা সকলেই বোধ হয় জানি যে, সকল বস্তুর পরমাণুতেই থাকে শক্তি। একটি অণুর শক্তির পরিমাণ তার সাধারণ শক্তির অনুভূমিকত্ব থেকে ভিন্ন হতেই পারে। এখানে অনুভূমিকত্ব অর্থে বুঝতে হবে অণুর সাধারণ এনার্জি লেভেল। যদি একটি অণু বাড়তি শক্তি গ্রহণ করে তবে তা উচ্চতর অনুভূমিকত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের অণুকে বলা হয় সক্রিয় অণু (excited atom)। এই বাড়তি শক্তি গ্রহণের পর আবার প্রমাণ করা যায় যে, অণু খুব তাড়াতাড়িই নিম্নতম শক্তির অনুভূমিকত্বে ফিরে আসে। কেন? কারণ অণু তখন শক্তি ত্যাগ করার অধিকার পায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, মাঝে মাঝে অণু দুই বা তার চেয়ে অধিক ধাপে শক্তি ত্যাগ করে। আবার বলা হয়ে থাকে, অণু তার মূল তলে ফিরে আসতে পারে প্রত্যেক ধাপে শক্তি ত্যাগ করে। এই অণুগুলো **সমষ্টিগতভাবে যে শক্তি ত্যাগ বা গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় 'ফোটন'** (Photon): When light or other electromagnetic wave strike matter, they behave as if they were individual Particles of energy instead of continuous waves. These Particles are called photons

or quanta. They travel at the speed of light. The idea of photons is essentials to the quantum theory in physics. This theroy resulted from experiments conducted by the German physicist Max planck in 1900. He showed that a photon's energy is proportional to the frequency of its light. সহজ করে বললে বলতে হয় এই ফোটন প্রবাহ দিয়েই আলো তৈরি হয়। কিন্তু এটাও জেনে রাখা দরকার, সব ফোটনেরই সম পরিমাণ শক্তি থাকে না। কারণ একটি অণু তখনই উচ্চতলে পৌছতে পারে যখন সে নেমে আসার আগে এবং ফোটন ত্যাগ করার ঠিক আগ-মুহূর্তে অবস্থান করে। এই সঙ্গে জেনে রাখা দরকার, বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ফোটন বিভিন্ন রঙের আলো তৈরি করে থাকে। যেমন: (ক) খুব বেশি তেজসম্পন্ন আলোর কণা তথা ফোটন **নীল আলো** তৈরি করে; (খ) কম শক্তির আলোর কণা তথা ফোটন তৈরি করে **লাল আলো**। জেনে রাখতে হবে, অন্যান্য রঙের আলোর মধ্যেও লাল এবং নীল আলোর শক্তি সমন্বিত আলোক কণা বা ফোটন থাকবেই। স্মরণ রাখা দরকার **শাদা আলো** এমন সক্রিয় ফোটনের সংমিশ্রণ—যার মধ্যে সব রকমের দৃশ্যমান আলোর অস্তিত্ব থাকে। সে জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, শাদা আলোর মধ্যে সব রঙের আলোই থাকে।

আলোর উৎপাদন বা উৎপন্ন আলো:

ফোটন ত্যাগ করেও অণুগুলো সক্রিয় হতে পারে (স্মরণ রাখা দরকার এই পরিত্যাগ ক্রিয়াকে বলা হয় Emit.। উত্তপ্তকরণ তার একটি উপায়। উদাহরণ: একখণ্ড লোহা সে যতক্ষণ না শ্বেততপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত চুল্লীতে তাপ দেওয়া হয়। এবং তখনই তার শক্তিতল বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আর তখনই অণুগুলি নিম্নতলে নেমে আসতে পারে এবং আলোক কণা তথা ফোটন পরিত্যাগ করে।

প্রশ্ন: লোহা পোড়ালে কেন শাদা আলো নির্গত হয়?

উত্তর: কারণ অণুগুলো সক্রিয় ফোটন পরিত্যাগ করতে করতে আলোর জগতে আসে। যদি আবার উত্তাপ সহযোগে অণুগুলোকে উচ্চতর তলে আনা হয় তবে ওই লৌহখণ্ড সব সময়েই শাদা আলো নির্গত করে যাবে।

এবার চুল্লী থেকে লৌহখণ্ডটি বের করে আনলে তার কী অবস্থা দাঁড়াবে? তখন লৌহখণ্ডটি ঠাণ্ডা হয়ে আসবে এবং তার ফলে অণুগুলি কম ফোটন পরিত্যাগ করবে।

প্রশ্ন: লৌহখণ্ডটিকে কখন আমরা রক্ততপ্ত দেখি?

উত্তর : লাল আলো বেশি পরিমাণে আলোক কণা তথা ফোটন দেয় যখন। জেনে রাখতে হবে, আরও একটি পদ্ধতিতে অণু শক্তি অর্জন করে এবং ফোটন ত্যাগ করে থাকে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অণুপ্রভা (Phosphorescene)। এই পদ্ধতিতে অণুগুলো একটা উৎস থেকে আলোক-শক্তি গ্রহণ করে এবং নিজেও আলো পরিত্যাগ করে।

আলোক ও শক্তি

আমরা পড়েছি : একটি ধাতব বলকে কয়লার আগুনে তপ্ত করলে সে তাপশক্তি বিকিরণ করবে। তার মানে কয়লার রাসায়নিক শক্তিই তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এবার ওই বলটিকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করতে থাকলে এক সময় তা আলোক উৎপন্ন করবে। তখনই রাসায়নিক শক্তির খানিক অংশ আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত হলো। এই সূত্র ধরেই বলা যায়, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বললেও বিদ্যুৎ শক্তির একটা অংশ আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যেতেই পারে, আলোকও একরূপ শক্তি। যদি প্রশ্ন করা হয় : আলোকে কি আমরা দেখতে পাই? উত্তর হবে : না, পাই না।

তবে আমরা কী দেখি?

উত্তর : আলোকিত বস্তু।

তার মানে, আমাদের জেনে রাখতে হবে, অন্যান্য শক্তির মতন আলোকশক্তিও অদৃশ্য।

প্রাকৃতিক আলো

সূর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোক-উৎস—যা বিশ্বচরাচর এবং সমস্ত ভূমণ্ডলকে রক্ষা করে যাচ্ছে। ফোটন ছেড়ে দেবার পর সূর্যের আলোর অণুগুলোকে সক্রিয় করে যে শক্তি, সেই শক্তিই সূর্যের অভ্যন্তরের আণবিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থকে পরিণত করে বা বলা যেতে পারে রূপান্তরিত করে শক্তিতে। নক্ষত্রগুলোও অবশ্যই প্রাকৃতিক আলোর উৎস কিন্তু তারা পৃথিবী থেকে এতো দূরে রয়েছে যে, তাদের ক্ষীণ আলোকে আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিতেই শিখিনি।

এ-ছাড়াও কিছু প্রাকৃতিক আলোর জীবন্ত উৎস রয়েছে আমাদের কাছাকাছি। যেমন : জোনাকী, একরকমের ব্যাকটেরিয়াও। একেই বলা হয় জীবন্ত আলোক শক্তি (Bioluminescene)। এই শক্তি জীব ও উদ্ভিদের অণুগুলোকে তাদের

জৈবিকতার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সক্রিয় করে থাকে ফোটন ছেড়ে দিয়ে। প্রাকৃতিক আলোর আরও একটা চমৎকার উদাহরণের নাম 'মেরুর প্রভা' বা উত্তরালোক। কখনও কখনও এই উজ্জ্বল প্রভা উত্তর মেরুর রাত্রির আকাশে দেখা যায়। পৃথিবীর উপরিতলের বায়ুমণ্ডলীয় অণুগুলোকে সূর্য থেকে আগত ইলেকট্রন যখনই সক্রিয় করে তোলে তখনই এই মেরুপ্রভার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কৃত্রিম আলো

সূর্যের আলো যে-মানুষের প্রাণ, কৃত্রিম আলো সেই মানুষেরই হাতিয়ারস্বরূপ। অর্থাৎ কৃত্রিম আলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষের সভ্যতা যতো এগিয়েছে, কেবল প্রাকৃতিক আলোর সাহায্যে তা সম্ভব ছিলো না। উদাহরণ: কৃত্রিম আলোই কারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ, বিমান, মোটর প্রভৃতি চালায়, অন্ধকারে আলো দেয়, চলচ্চিত্র, নাট্যকলা প্রয়োগে সাহায্য করে।

প্রশ্ন: এই কৃত্রিম আলো আসে কোথা থেকে?

উত্তর: নানা উৎস থেকে। এর মধ্যে বিজলী ও ফ্লুরোসেণ্ট বাতিই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।

১৯৫০ সালের শেষভাগে বিজ্ঞানীরা একপ্রকার বা ধরনের আলোক-বিবর্ধন যন্ত্র আবিষ্কার ও তাঁর উন্নতি সাধন করেছিলেন। ইংরেজিতে একে বলা হয় Laser (a device which amplifies an input of light producing an extremely narrow and intense beam.)। এই পদ্ধতি ফোটনের একটা সরু জ্যোতিরেখা বিকীর্ণ করে—যার সব অংশেরই থাকে সমান শক্তি। এ-জন্যই লেসার একরঙা খাঁটি আলো উৎপাদন করে থাকে।

এবার জানা দরকার কৃত্রিম আলো বা লেসার কী কী কাজে লাগানো হয়ে থাকে। আলোকবিজ্ঞানীরা বলছেন: যোগাযোগ ব্যবস্থা, যান্ত্রিক পরিবহন, শিল্পবাণিজ্য, ওষুধপত্র তৈরিতে তো লাগেই। তা ছাড়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে নানাভাবে এই লেসার ব্যবহারের প্রয়োজন অপরিহার্য বলে ধরা হয়ে থাকে।

আলোর প্রকৃতি

আমরা পড়েছি: পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় মূলত দৃষ্টির মাধ্যমে। বন্ধ চোখ খুলে তাকালেই আমরা আমাদের চারদিক, নানা জিনিসপত্র,

প্রকৃতি প্রভৃতি দেখতে পাই। এখন প্রশ্ন, শুধু চোখ থাকলেই কি সব দেখা সম্ভব? না। একটি অন্ধকার ঘরে যদি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা যায় তা হ'লে কি কোনো বস্তু দেখা সম্ভব? আবার দেখো, পূর্ণ আলোকিত ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে থাকলেও কোনো জিনিস দেখা সম্ভব নয়। তার মানে চোখ দিয়ে দেখতে গেলে একটি বাহ্যিক কারণের অবশ্য প্রয়োজন। এবার বিষয়টি নিশ্চয় কিছু স্পষ্ট হলো অর্থাৎ আমরা বুঝতে ও জানতে পারলাম কোনো বস্তু থেকে আলো যখন চোখে এসে পড়ে তখনই ওই বস্তু সম্পর্কে আমাদের দর্শন-অনুভূতির জন্ম হয়। সুতরাং আলোকে এমন এক বাহ্যিক প্রেরণা হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারি, যা কোনো দ্রব্য সম্পর্কে আমাদের চোখে দর্শন-অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

প্রশ্ন: আলোকে কি এক প্রকার শক্তি আখ্যায় ভূষিত করা যায়?

উত্তর: নিশ্চয়ই। আগেই বলেছি তাপ ও বিদ্যুতের মতো আলোও এক শক্তি। ধাতব একটি বল নিয়ে, তাকে যদি আগুনে তপ্ত করি তা হ'লে দেখবো, ওই বল থেকে তাপশক্তি বিনির্গত হচ্ছে। তার মানেটা কী? মানে হলো এই যে, এখানে কয়লার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ঠিক এই সূত্র ধরেই বলা যায়, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালালে বিদ্যুৎশক্তি অংশত আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার মানে আলো যে এক ধরনের শক্তি তা স্বতঃসিদ্ধ।

প্রশ্ন: তা হ'লে আসল সত্য কী দাঁড়াচ্ছে?

উত্তর: আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে কিন্তু নিজে থাকে দৃষ্টির আড়ালে অর্থাৎ অদৃশ্য। আমরা আলো দেখতে পাই না, দেখি আলোকিত বস্তু। যুক্তিটা কি ধাঁধার মতন লাগছে? কেউ বলতেই পারে, ভোর ভোর সকালে প্রথম রৌদ্রের আলো যখন বারান্দার কোণে এসে পড়ে, অথবা পড়ে উঠোনে, লাউমাচায়—তখন তা আমরা দিব্যি দেখতে পাই। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আসলে যা দেখতে পেয়েছো বলে মনে করছো, তা রৌদ্রোজ্জ্বল কোনো অংশমাত্র। কোনো দুষ্টু ছেলে ক্লাসে দাঁড়িয়ে শিক্ষকমশাইকে বলতে পারে: রাত্রিতে মোটর কার-এর, লরীর হেড-লাইট যে বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করে তা কী আমরা দেখি না? শিক্ষকমশাইকে তখন বলতে হবে: একেবারেই না। তা হ'লে কী দেখি আমরা? দেখি অসংখ্য ধূলিকণা—যার ওপরে আলো পড়েছে। অর্থাৎ আলোকিত ধূলিকণা মাত্র। অতএব এমত সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছতে হচ্ছে, অন্যান্য শক্তির মতন আলোক-শক্তিও প্রত্যক্ষ করা যায় না।

আলোর ফোটন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কণা-প্রবাহের মতনই প্রবাহিত হতে পারে। যেমন: মেশিনগানের গুলি। জেনে রাখতে হবে, ফোটন আবার আলাদাভাবেও

তরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে, যেমন জলাধারে ওঠে মৃদু আলোড়ন। কী করে এবং কেমন করে কণা তরঙ্গবৎ আচরণ করে, আবার তরঙ্গ কেমন করে কণার মতো হুবহু কাজ করে যায়—এই রহস্য উদ্ধার ও আবিষ্কার করা খুবই কঠিন। বহুকাল ধরে বিজ্ঞানীরা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, আলো বাস্তবিক কণার সমন্বয় বা তরঙ্গের। তাঁরা তখন বুঝতেই পরেননি, উভয়ইবা কেমন করে সম্ভব হতে পারে। তবু কণা আর তরঙ্গকে বাদ দিয়ে তাঁরা আলোর কোনো আলাদা ব্যাখ্যা বা বিশদ উপস্থিত করতে পারেননি।

১৯০০ সালে জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারটি হলো: যা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা তথা ফোটন তা কেন তরঙ্গবৎ আচরণ করে তা বোঝবার চাবিকাঠি। তাঁর এই থিয়োরী গিয়ে পৌছোয় Quantam Theory (পদার্থের শক্তির স্ফুরণ ও বিলয় অবিরাম হতে পারে না—হয়ে থাকে পর্যায় অনুযায়ী) তে—যা বিজ্ঞানীদের এমন কল্পনায় পৌছতে সাহায্য করেছিলো যে, আলো আসলে, কণা এবং তরঙ্গ উভয়ের মতনই আচরণ করে থাকে।

আলোকে কণা এবং তরঙ্গ—দু'হিসেবেই যদি ধরা হয়, তবে এ-কথাটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আলোই অযৌগিক কণা বা অজটিল তরঙ্গ মাত্র।

আলোক তরঙ্গ অথবা অন্যান্য ধরনের তরঙ্গ বিষয়ক ব্যাখা বা বিশ্লেষণের সময় বিজ্ঞানীরা নানা পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। কল্পনা করা যাক এমন বেশকিছু তরঙ্গের—যা পাহাড় শীর্ষ থেকে গড়ানি খেতে খেতে এক শান্ত জলাশয়ে এসে মিশেছে। এই উঁচু জলতরঙ্গের উচ্চতা এবং ঢালুর গভীরতা আর সেই শান্ত জলাশয়ের তরঙ্গ শীর্ষকে বলা হয় তরঙ্গের বিস্তৃতি তথা অবাধত্ব (aptitude), তরঙ্গ শীর্ষের একটি বিন্দু থেকে পরবর্তী তরঙ্গশীর্ষের সঙ্গে তুলনীয় দূরত্বকে বলা হয় থাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length)। প্রতি সেকেণ্ডে যে কোনো বিন্দু দিয়ে অতিক্রান্ত তরঙ্গের সংখ্যাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক (Frequency of the wave). সব সময়েই মনে রাখতে হবে আলোকের তরঙ্গ তির্যক (Transverse) এবং এর দৈর্ঘ্য খুবই কম। আলোকের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬০০০ মাইল।

আলোর জগৎ বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হতে গেলে এই বিজ্ঞান সম্পর্কিত সংজ্ঞাগুলি অবশ্যই জেনে এবং বুঝে রাখতে হবে।

(১) আলোক-প্রভব (Source of light):

ক) আলো দিতে পারে যে-বস্তু তাকেই আলোক-প্রভব বলা হয়। এরই মধ্যে

আবার এক এক রকমের বস্তু থাকে যারা নিজেরাই আলোক বিকীর্ণ করতে পারে। যেমন—সূর্য, নক্ষত্র, জলন্ত বাতি। এদের বলা হয় স্বপ্রভ (Luminous)।

(খ) আর এক প্রকারের বস্তু রয়েছে যারা স্বপ্রভ বস্তু থেকে আলো গ্রহণ করে সেই আলোই বিকিরণ করে। এদের বলা হয় অপ্রভ (Non-luminous)। চাঁদ সুতরাং অপ্রভ বস্তু। কেন? কারণ চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সে সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া আলো বিকিরণ করে মাত্র। আগেই বলেছি বেশিরভাগ বস্তুই আসলে অপ্রভ। তারা চাঁদেরই মতন স্বপ্রভ বস্তুর আলো গায়ে মেখে দৃশ্যগোচর হয়।

(গ) এবার **বিন্দু-প্রভব** ও **বিস্তৃত-প্রভব** প্রসঙ্গে আসতে হবে। আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ভূমিকাও কম নয়। বিন্দু-প্রভব (Point source)-এর মানে করতে গেলে জ্যামিতিক বিন্দু বোঝায়। আর বিস্তৃত-প্রভব (Extended source) বলতে এমন বস্তু বোঝায় যার কোনো না কোনো আকার আছেই। আলোকবিজ্ঞান-চর্চাকারীকে মনে রাখতে হবে, আকার-বিশিষ্ট বিস্তৃত প্রভবকে বিন্দু-প্রভবের সমষ্টি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(২) আলোক মাধ্যম (Optical medium)

যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে তাকেই বলা হয় আলোক-মাধ্যম।

(ক) **সমসত্ত্ব (Homogeneous)**ঃ এই মাধ্যম এমনও হতে পারে, যার চারদিকেই সমান গতিতে আলো যেতে পারে। উদাহরণ: জল, বায়ু, কাচ। এদের সমসত্ত্ব মাধ্যম বলে।

(খ) **স্বচ্ছ (Transperent)**ঃ যে সমসত্ত্ব মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আলো অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে তাকে বলা হয় স্বচ্ছ মাধ্যম। যেমন: কাচ, জল ইত্যাদি।

(গ) **অস্বচ্ছ (Opaque)**ঃ যে ধরনের মাধ্যমের ভেতর দিয়ে একেবারেই আলোর যাতায়াত বন্ধ তাকে অস্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যথা—পাথর, লোহা ইত্যাদি।

(ঘ) **ঈষৎ স্বচ্ছ (Translucent)**ঃ এমন সব বস্তু রয়েছে যার ভেতর দিয়ে আলো আংশিকভাবে যেতে পারে তাকে ঈষৎ-স্বচ্ছ মাধ্যম বলা হয়। যেমন—ঘষা কাচ, তেলতেলে কাগজ ইত্যাদি।

(৩) আলোকরশ্মি ও রশ্মিগুচ্ছ (Ray of light and a beam of light) ঃ

আগেই বলেছি, সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় যাতায়াত করে। তার মানে এই সরলরেখাই আলোর পথ। এ-ধরনের বেশ কিছু আলোকরশ্মির সমষ্টির নাম রশ্মিগুচ্ছ। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন : একটি রশ্মি কিন্তু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। প্রভব যতোই ক্ষুদ্র অথবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক, তা থেকে সব সময়ই রশ্মিগুচ্ছ বিকীর্ণ হতে থাকবে।

রশ্মিগুচ্ছ কতো রকমের অর্থাৎ কয় প্রকারের হতে পারে ? উত্তর : তিন প্রকারের : ক. সমান্তরাল (Parallel) ; খ. অপসারী (Divergent) ; গ. অভিসারী (Convergent)।

(ক) **সমান্তরাল ঃ** এই রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল (চিত্র A১ দেখ)। অনেও দূরে থাকা কোনো প্রভব থেকে আসা রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলা যায়। যেমন—সূর্য থেকে আসা রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল। এ-ছাড়াও লেন্স বা গোলক-দর্পণ থেকেও কৃত্রিম উপায়ে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ তৈরি করা সম্ভব। এ বিষয়ের বিশদ পরে আলোচিতব্য।

(খ) **অপসারী :** কোনো প্রভব থেকে যখন রশ্মিগুচ্ছ মোচার আকারে ছড়িয়ে পড়ে—যে প্রভব ওই মোচার শীর্ষবিন্দু, তখন ওই রশ্মিগুচ্ছকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে (চিত্র A২ দ্রষ্টব্য)।

(গ) **অভিসারী :** যদি কোনো প্রভব থেকে রশ্মিগুচ্ছ একটি বিন্দুতে মিলিত হবার জন্য আসে এবং ওই বিন্দুতে মিলিতও হয়, তখন তাকে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে (চিত্র A৩)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যদিও লেন্স প্রসঙ্গ অন্য পরিচ্ছেদে আলোচিত, তবুও এখানে লেন্সের একটি প্রসঙ্গ না আনলে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থাকে। এজন্য বলি, অবতল (Concave) লেন্সের মধ্য দিয়ে একটি সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ পাঠালে তা কিন্তু অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় (চিত্র A৪)। আবার উত্তল (Convex) লেন্সের মধ্য দিয়ে পাঠালে ওই রশ্মিগুচ্ছ অভিসারীতে পরিণত হবে (চিত্র A৫)।

(৪) আলোক প্রতিফলন (Reflection of light)

সমসত্ত্ব স্বচ্ছ কোনো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আলোকরশ্মি যখন অন্য

কোনো মাধ্যমের ওপর আপতিত হয়, তখন কিন্তু এর অল্প কিছু অংশ দ্বিতীয় মাধ্যম উদরসাৎ করে। অর্থাৎ শোষিত হয়ে থাকে। আবার কিছু অংশ, জেনে রেখো, দ্বিতীয় মাধ্যমের তল থেকে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী। এই যে ফিরে আসা, একেই বলা হয়েছে আলোকের প্রতিফলন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিশেষ অবস্থায় ওই আপতিত রশ্মির কিছু অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে। এই যে ঘটনা ঘটলো, একে বলা হয় **আলোকের প্রতিসরণ**। আলোকবিজ্ঞান-শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে, প্রতিফলিত আলোর পরিমাণ নির্ভর করে দু'টি বিষয়ের ওপর: (ক) আপতিত রশ্মি প্রতিফলন-তলে কী পরিমাণ কোণে পড়লো তার ওপর; (খ) প্রতিফলন-তলের ও মাধ্যমের ওপর।

এখানে বেশ একটু মজার ব্যাপারও রয়েছে: (১) দেখো, প্রতিফলন তল-এ আলোকরশ্মি যতো বেশি কাৎ হয়ে পড়বে প্রতিফলিত রশ্মির পরিমাণও ততো বেশি হয়ে যাচ্ছে। এখানে এ-অর্থে কিন্তু আপতন কোণের কথা বলা হচ্ছে। বলতো, কখন আলোর সম্পূর্ণ অংশই জলে প্রবেশ করতে পারে? ভাববার বিষয় তো? সরল করে বলে দিচ্ছি এবার: বায়ু থেকে আলো জলের ওপর অভিলম্বভাবে পতিত হলেই এমনটি ঘটতে পারে। আবার: (২) বায়ু থেকে আলো কাচের ওপর অভিলম্বভাবে পড়লে এর সামান্য অংশ (৪°৫%) মাত্র প্রতিফলিত হতে পারে। কিন্তু বায়ু থেকে এই আলো যদি আয়নার ওপর অভিলম্বভাবে পতিত হয় তা হ'লে কিন্তু এর অনেক বেশি অংশই (৮০%) প্রতিফলিত হতে বাধা থাকে না। আর ওই আয়না যদি পালিশ করা হয় তবে আরও বেশি পরিমাণ আলোর প্রতিফলন দেখা যাবে (উদাহরণ চিত্র A৬)।

নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (Regular and Scattered reflection):

এটা নির্ভর করে প্রতিফলক-এর তল-এর ওপর। এই তল অনুযায়ী আলোকের প্রতিফলন ঘটে দু' রকমের: নিয়মিত প্রতিফলন ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (চিত্র A৭ লক্ষ্য করো)।

(১) **নিয়মিত প্রতিফলন:** কোনো প্রতিফলকের মসৃণ তল যখন কোনো আলোক রশ্মিগুচ্ছকে নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী এরূপভাবে প্রতিফলিত করে যে, আপতিত রশ্মিগুচ্ছের সঙ্গে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তখন এই প্রতিফলনকেই নিয়মিত প্রতিফলন বলা হয়ে থাকে।

* জেনে রেখো, সমতল আয়নায় আলোকরশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।

(২) **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন :** অমসৃণ প্রতিফলক-এর তল-এ যখন কোনো আলোকরশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত হয়, তখন আপতিত রশ্মিগুচ্ছের সঙ্গে প্রতিফলিত রশ্মির কোনো মিল থাকতে পারে না। তখন কী হয় ? প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। এই চারদিকে ছড়িয়ে পড়া প্রতিফলনকেই বলা হয় বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (চিত্র A৮ দ্রষ্টব্য)।

বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য এবার চিত্রের মাধ্যমে (A৯) প্রমাণ করা যাক : আলোর প্রতিফলনের সময় আপতিত রশ্মি, আপতিত কোণ, প্রতিফলন কোণ কেমন করে রচিত হয়।

পফ সমতল দর্পণ। **কভ** আপতিত রশ্মি। **ভ** আপতন বিন্দু। **ভখ** প্রতিফলিত রশ্মি। **ভব** আপতন বিন্দুতে আয়নার সঙ্গে আঁকা অভিলম্ব।

আপতন কোণ : আপতন বিন্দুতে আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সঙ্গে যে-কোণ উৎপন্ন করে।

প্রতিফলন কোণ : আপতন বিন্দুতে অভিলম্বের সঙ্গে প্রতিফলিত রশ্মি যে কোণ উৎপন্ন করে। তার মানে ∠ **কভব** আপাতন কোণ আর ∠ **খভব** প্রতিফলন কোণ।

প্রতিবিম্ব, সদ্‌বিম্ব ও অসদ্‌বিম্ব (Image, real image, virtual image)

আলোকরশ্মি যখন কোনো বস্তু থেকে সরাসরি আমাদের চোখে এসে পৌছোয় তখন বস্তুটিকে যথাস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিন্দু বস্তু থেকে আসা রশ্মিগুলো যখন কোনো মাধ্যম কতৃক প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হবার পর দৃষ্টিগোচরে এসে পৌছোয় তখন কিন্তু বস্তুটিকে অন্য জায়গায় অবস্থিত বলে মনে করে আমাদের দৃষ্টি। আসলে মজা হলো, বস্তুটি কিন্তু ঠিক জায়গাতেই থাকে। চোখের ওপর আপতিত রশ্মিগুলোকে পেছন দিকে বাড়িয়ে দিলে তারা কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হবে। তার মানে, বস্তুকে ওই বিন্দুতে অবস্থিত দেখা যাবে। বস্তুর এই যে নতুন অবস্থান, তাকে বলা হয় **প্রতিবিম্ব**। আবার আমরা পড়েছি : যখন কোনো বিন্দু-প্রভব থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছ কোনো মাধ্যম কতৃক প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর অন্য কোনো বিন্দুতে সত্যসত্যই মিলিত হয় বা কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তবে ওই বিন্দুকে উক্ত বিন্দু-প্রভবের **প্রতিবিম্ব** বলে মনে করা হয়। সে যাই হোক, শিক্ষার্থীর জানা দরকার প্রতিবিম্বও দুই রকমের। সদ্‌ ও অসদ্‌।

(১) সদ্‌বিম্ব (Real image) : কোনো বিন্দু-প্রভব থেকে নির্গত রশ্মিগুচ্ছ যদি কোনো মাধ্যম কর্তৃক প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে অন্য কোনো বিন্দুতে মিলিত হয়ে প্রতিবিম্ব প্রতিষ্ঠা করে, তবে ওই প্রতিবিম্বকেই বিন্দু-প্রভবের সদ্‌বিম্ব বলে। চিত্র A১০ লক্ষ্য করো এবং মিলিয়ে নাও : উত্তল লেন্স দেখো। চোখের দৃষ্টি ক বিন্দুকে ক-১ অবস্থিত দেখবে। এবার ওই লেন্স দিয়ে কোনো বিন্দু প্রভব ক-এর সদ্‌বিম্ব ক-১ বিন্দুতে গঠিত হয়েছে দেখতে পাবে।

(২) অসদ্‌বিম্ব (Virtual image) : কোনো বিন্দু-প্রভব থেকে উৎপন্ন রশ্মিগুচ্ছ যদি কোনো মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় অথবা হয় প্রতিসৃত এবং অন্য কোনো বিন্দুতে থেকে অপসৃত হতে থাকে, তা হ'লে ওই প্রতিবিম্বকে অসদবিম্ব আখ্যা দেওয়া হয়।

উদাহরণ : চিত্র A১১ দেখো : মন সমতল দর্পন। প এক বিন্দু প্রভব। এবার দেখো রশ্মিগুচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে পড়ছে। প্রতিফলিত রশ্মিগুলোকে পেছন দিকে বাড়ালে তা প-১ বিন্দুতে এসে পৌছোচ্ছে এবং তখন প বিন্দুকে প-১ বিন্দুতে অবস্থিত দেখা যাবে। তার মানে প-১ আসলে প-এর অসদবিম্ব।

ওপরের এই ব্যাখ্যা সকলের কাছে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। এ কারণে সদবিম্ব ও অসদবিম্ব-এর পার্থক্য বুঝিয়ে লিখছি :

(ক) কোনো বিন্দু-প্রভব থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিগুচ্ছ কোনো মাধ্যম মারফৎ প্রতিফলন বা প্রতিসরণ-এর পরে কোনো বিন্দুতে মিলিত হ'লে বিন্দুর সদবিম্ব রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো বিন্দু থেকে ওই রশ্মিগুলো অপসৃত হচ্ছে দেখা গেলে প্রমাণিত হবে বিন্দুর অসদবিম্ব রচিত হয়েছে।

(খ) সদ্‌বিম্ব চোখে তো দেখা যায়ই, পর্দায়ও ফেলা যায়। অসদবিম্বকে চোখে দেখা যায় বটে কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না।

(গ) সদ্‌বিম্ব বস্তুর সাপেক্ষে সোজা হয় কিন্তু অসদ্‌বিম্ব বস্তুর সাপেক্ষে উল্টো হয়।

* আরও জেনে রাখো :

(ক) সমতল দর্পনে প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলা যায় না সুতরাং তা অসদ্‌বিম্ব।

(খ) সিনেমার প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলা যায় সুতরাং তা সদ্‌বিম্ব।

(গ) মরীচিকা—অসদ্‌বিম্ব। কারণ এখানে রশ্মিগুলোকে পেছন দিকে বাড়িয়ে প্রতিবিম্ব রচিত হয়।

(ঘ) ক্যামেরার প্রতিবিম্ব—সদ্‌বিম্ব। কেন? কারণ তা পর্দায় ফেলা যায়।

(ঙ) চোখের পর্দায় পড়া প্রতিবিম্ব সদ্‌বিম্ব—যেহেতু তা চোখের ভেতরের পর্দায় গঠিত হয়ে থাকে।

(চ) মাইক্রোসকোপের প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলা যায় না সুতরাং তা অসদ্‌বিম্ব।

ছায়া (Shadow)

আলোকবিজ্ঞানের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'ছায়া'। তা হ'লে জানা দরকার দরকার ছায়া কী, কেন ইত্যাদির বিস্তৃত ব্যাখ্যা। শিক্ষার্থীদের সুবিধের জন্য বিষয়টি সহজভাবে আলোচনা করা হচ্ছে: কোনো আলোক-উৎসের সামনে যদি কোনো অস্বচ্ছ বস্তু রাখা হয় তবে ওই বস্তুর ওপর পড়া রশ্মিগুলো অস্বচ্ছ বস্তুকে ভেদ করে যেতে পারে না সত্যি, কিন্তু বাকি রশ্মিগুলো ঠিক সোজা পথে চলে যেতে পারে। এই অবস্থায় বস্তুর পেছনে একটা পর্দা রাখা হ'লে তাতে ওই অস্বচ্ছ বস্তুর কালো ছায়া পড়বেই।

এবার জানা দরকার ছায়া আর প্রতিবিম্ব-এর মধ্যকার পার্থক্যটা কী? জেনে রেখো, ছায়া সব সময়েই পর্দায় ফেলা যায় কিন্তু প্রতিবিম্বকে সব সময় পর্দায় ফেলা যায় না। কেন? কারণ ছায়া গঠনের সময় আলোক-উৎস থেকে রশ্মিগুলো বস্তুতে বাধা পেয়ে পেছনে যেতে পারে না বলেই পেছনের পর্দায় ছায়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। রশ্মির প্রতিফলন বা প্রতিসরণ এ-ক্ষেত্রে ঘটে না। কিন্তু প্রতিবিম্ব রচনার সময় উৎস বা বস্তু থেকে আসা রশ্মিগুচ্ছ কোনো মাধ্যম দ্বারা প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হওয়ার পর রশ্মিগুলোকে পেছন দিকে বাড়িয়ে দিলে তা একটি বিন্দুতে মিলিত হবে। এই বিন্দুকেই প্রতিবিম্ব বলা হয়।

ছায়ার পরিমাপ

ধরো একটি আলোকিত পথ ধরে একজন যাত্রী যাচ্ছে। তখন রাত্রি। দূরে দূরে আলোর উৎস। যাত্রীটি রাস্তার আলোর উৎসের কাছাকাছি আসছে। চিত্র A১৩ দেখো। রাস্তার বাতির উচ্চতা যদি ধরি ১২ ফুট এবং যাত্রীর উচ্চতা ৬ ফুট এবং বাতিস্তম্ভ থেকে যদি যাত্রীর দূরত্ব হয় ১৫ ফুট। তা হ'লে যাত্রীর ছায়ার দৈর্ঘ হবে কতো?

ছায়ার দৈর্ঘ্য ক ধরলে হিসাবে আসবে:

$$\frac{\text{বাতির উচ্চতা}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা}} = \frac{\text{ছায়ার শীর্ষবিন্দু থেকে আলোকস্তম্ভের দূরত্ব}}{\text{ছায়ার শীর্ষবিন্দু থেকে ব্যক্তির দূরত্ব}}$$

অথবা, $\frac{১২}{৬} = \frac{১৫ + ক}{ক}$ অথবা ২ক = ১৫ + ক, অথবা ক = ১৫ ফুট

তার মানে যাত্রীর ছায়ার দৈর্ঘ্য হবে ১৫ ফুট।

২

আলোর প্রতিসরণ ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঃ সচিত্র ব্যাখ্যা, প্রতিফলনের সূত্র, আপেক্ষিক ও চরম প্রতিসরাঙ্ক, প্রতিসরাঙ্কের সঙ্গে আলোর গতিবেগের সম্পর্ক, প্রতিসরণ দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন, লক্ষ্যবস্তু ঘন মাধ্যম, চোখ লঘু মাধ্যম, লক্ষ্যবস্তু লঘু মাধ্যম, চোখ ঘন-মাধ্যম ; আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন, সাধারণ প্রতিফলন ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলকের তুলনামূলক টেবল···

আমরা জানি যখন কোনো বস্তুর উপরিতলে (Surface) আলোর রশ্মি এসে পড়ে তখন একটি অথবা তিনটি অবস্থার সমন্বয় সাধিত হয়ে থাকে। ক) আলো প্রতিফলিত হতে পারে (Thrown back), (খ) তা হ'তে পারে প্রতিসারিত (Pass into the object); (৩) বস্তুদ্বারা হ'তে পারবে বিশোষিত (Absorption)। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে আলোর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কোনো পদার্থে প্রতিফলিত, প্রসারিত বিশোষিত অবস্থায় বস্তুর আলাদা আলাদা রঙ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দিয়ে থাকে। যদি কোনো বস্তু তার ভেতর দিয়ে আলোকে যেতে দেয়—যেমন ধরো জানলার পরিষ্কার শার্সির কাচ—তা হ'লে তাকে বলা হয় **আলোকভেদ্য** (Transperent) বা স্বচ্ছ। আবার কোনো বস্তু—যেমন ঘষা কাচ বা দুধের পাতলা সর আলোকে বিচ্ছুরিত করে—যে আলো বস্তুকে ভেদ করে ফিরে এসেছে তাকে বলা হয় **আলোকভেদ্য কিন্তু অস্বচ্ছ** (Translucent)। তৃতীয়ত কোনো বস্তুর ভেতর দিয়ে আদপেই যদি কোনো আলো না যেতে পারে—তাকে বলা হয় **অনচ্ছ** (Opeque) বা **আলোকের** পক্ষে অভেদ্য।

বিলিয়ার্ড খেলার টেবিলের প্রান্ত থেকে যেমন করে বিলিয়ার্ড বল ফিরে আসে, ঠিক তেমনিভাবেই কোনো বস্তুর ওপর থেকে আলো ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। যখন কোনো প্রতিফলকের ওপর আলোকরশ্মি পড়ে, যেমন—আয়না। তখন তা একটি কাল্পনিক রেখার সাহায্যে সমকোণ তৈরি করে। এটা কিন্তু কেবল আয়নার ক্ষেত্রেই সম্ভব। এই কোণকে বলা হয় **আপতিত কোণ** (Angle of incidence)। আবার আয়না থেকে প্রতিফলিত রশ্মি কিন্তু একটি স্বাভাবিক রেখাতে কোণ তৈরি করে, যাকে

বলা হয় প্রতিবিম্বিত কোণ (Angle of reflection)। প্রতিফলনের বিজ্ঞানসম্মত কানুন বা সূত্রানুযায়ী এই দুটি কোণই কিন্তু সমান সমান।

আলোর প্রতিসরণ তখনই ঘটে যখন বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়ে আলো চলে যেতে পারে। যেমন: জল ও কাচ। এই দুই বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করলেই আলো নেমে আসে। সমকোণ ভিন্ন যে কোনো কোণ থেকে যদি আলো বস্তুতে প্রবেশ করে, তবে এই নেমে আসার সূত্রানুযায়ী এই বস্তুটির তল থেকে আলো বেঁকে যেতে বাধ্য। এই বক্রতাকে বলা হয় প্রতিসরণ (Refraction)। এক গ্লাস জলের মধ্যে একটি পেন্সিল খাড়াভাবে ডুবিয়ে দিলে, জলের মধ্যকার অংশকে দেখে মনে হবে তা বেঁকে গেছে। এরও কারণ প্রতিসরণ। আলোর এই বক্রতা নির্ভর করে আপতিত কোণ এবং পদার্থে আলোর অনুপ্রবেশের গতির ওপর।

যখন পদার্থ আলোক শোষণ করে নেয়, ওই পদার্থের শক্তিতল তখন হয় আলোকেই বাড়িয়ে দেয়, নয়তো করে পরিবর্তন। উদাহরণ: অনুপ্রভ পদার্থের দ্বারা শোষিত আলো ওই পদার্থেরই পরমাণু শক্তিতল বৃদ্ধি করে থাকে। পরে, পরমাণুশক্তি ত্যাগ করে আলোর ফোটন হিসেবেই। সূর্যালোকে বেশিরভাগ বস্তুই তপ্ত হয় আলোক শোষণ করে।

বিক্ষিপ্তকরণও কিন্তু প্রতিফলনের সমান। যখনই পদার্থের ওপর আলো এসে পড়বে তখনই বস্তুকণা আলোকে বিক্ষিপ্ত করবে—যেমনটি দেখা যায় বাতাসের ক্ষেত্রেও। এই বিক্ষিপ্ত আলোর পরিমাণ এবং পরিবেশন নির্ভর করবে ওই পদার্থের পরিমাণ ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ওপর।

চিত্রসহ ব্যাখ্যা: ধরো একটি আলোকরশ্মি বায়ু মাধ্যমে কখ সরল রেখায় এমন একটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কাচখণ্ডের ওপর তির্যকভাবে আপতিত হলো (চিত্র A১৪ দ্রষ্টব্য)। আলোকরশ্মি এবার কাচের ভেতর প্রবেশ করবে। কিন্তু কাচের ভেতরকার রশ্মি যে সরল রেখায় যাবে তা কখ থেকে আলাদা। কেন? কারণ খ বিন্দুতে আলোকের প্রতিসরণ হবে। ধরো, কাচের ভেতরকার আলোকরশ্মি খগ সরল রেখায় গমন করবে না। এ ক্ষেত্রে কখ আপতিত রশ্মি, খগ প্রতিসৃত রশ্মি, খ আপতন বিন্দু (Point of incident) এবং বল দুই মাধ্যমের বিভাগতল-এর ছেদরেখা। যদি খ বিন্দু দিয়ে বল রেখার ওপর লম্ব পখপ টানা হয় তবে তাকে আপতন বিন্দুতে বিভাগ তলের ওপর অভিলম্ব বলা হয়। আপতিত রশ্মি কখ, অভিলম্ব খপ-এর সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ ∠কখপ, একে বলা হয় আপতন কোণ। এবং প্রতিসৃত রশ্মি খগ ওই অভিলম্ব-এর সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ ∠গখপ১ তাকে প্রতিসরণ কোণ বলে।

এবার শিক্ষার্থীদের জানা দরকার প্রতিসরণের সূত্র, প্রতিসরাঙ্কের সংজ্ঞা; এদের মান কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে পরম চরম প্রতিসরাঙ্ক বলতেই বা কী বোঝায়।

প্রতিসরণের সূত্র (Laws of refraction) এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ যে দু'টি সূত্রানুযায়ী হয়ে থাকে তাদেরই বলা হয় প্রতিসরণের সূত্র :

(১) আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদ তল-এর ওপর অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিসৃত রশ্মি সব সময়ে একই সমতলে থাকে এবং আপাতিত রশ্মি ও অভিলম্বের বিপরীত দিকে থাকে।

(২) নির্দিষ্ট মাধ্যম, মাধ্যমযুগল এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরশ্মির প্রতিসরণের সময় আপতন কোণের সাইন-এর অনুবাদ সব সময়ে ধ্রুবক হবে। এই ধ্রুবককে 'মিউ' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একেই প্রথম মাধ্যমের তুলনায় দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বলে। বিভিন্ন মাধ্যম-যুগলের ক্ষেত্রে এবং আলোকের বিভিন্ন বর্ণের ক্ষেত্রে এই ধ্রুবকের মান নানারকম হয়ে থাকে। তার মানে প্রতিসরণের মান মাধ্যমযুগল-এর প্রকৃতি ও আলোকের বর্ণের ওপর নির্ভর করে।

ডঃ এডওয়ার্ড স্নেল প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে একে 'স্নেল সূত্র'ও বলা হয়। এই সূত্রানুযায়ী আপাতন কোণ ই এবং প্রতিসরণ কোণ র হলে :

$$\frac{\text{Sin ই}}{\text{Sin র}}=\mu$$ (উচ্চারণ মিউ)—ধ্রুবক

আপেক্ষিক ও চরম প্রতিসারঙ্ক (Relative and absolute refractive index)

সংজ্ঞা : আমরা পড়েছি : কোনো আলোকরশ্মি যখন 'ক' মাধ্যম থেকে এসে 'খ' মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় তখন আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইন-এর অনুপাতকে 'ক' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'খ' মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়। তার মানে :

$$\text{ক}\ \mu\ \text{খ}=\frac{\text{Sin ই}}{\text{Sin র}}$$ [ই—আপতন কোণ ; র—প্রতিসরণ কোণ]

আলোর গতিপথ প্রত্যাবর্তনশীল (Reversible), সুতরাং কোণের রশ্মি যদি 'খ' মাধ্যম থেকে এসে বিভাগতলে 'র' কোণে আপতিত হয় তবে 'ক' মাধ্যমে প্রতিসৃত হবার সময় প্রতিসরণ কোণ 'ই' হবে। এই অবস্থায় $\text{খ}\ \mu\ \text{ক}=\frac{\text{Sin র}}{\text{Sin ই}}$

সুতরাং $_ক\mu_খ \times {}_খ\mu_ক = \frac{Sin ই}{Sin র} \times \frac{Sin র}{Sin ই} = ১$; অথবা $ক \mu খ = \frac{১}{_খ\mu_ক}$

সংজ্ঞা : কোনো আলোকরশ্মি যখন শূন্য (Vaccum) থেকে অন্য কোনো মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়, তখনকার প্রতিসরাঙ্ককে ওই মাধ্যমের চরম প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা হয়। লাল রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সব থেকে বেশি। কিন্তু বেগনী রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। নির্দিষ্ট এই দুই মাধ্যমের ক্ষেত্রে আপতন কোণ যাই হোক না কেন, আসলে প্রতিসরণ কোণ নির্ভর করে আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ওপর। একই ঘন-মাধ্যম বেশি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর গতিবেগ থেকে বেশি হয় এবং রশ্মিও অভিলম্বের দিকে কম বেঁকতে দেখা যায়। ফলে কী হয় বলতো ? প্রতিসরণ কোণ বেশি হয়। এ-কারণে একই আপতন কোণের জন্য লাল রঙের আলোর প্রতিসরণ কোণ সব থেকে বেশি এবং বেগনী সব থেকে কম হবে। জেনে রাখতে হবে, লাল থেকে বেগনী পর্যন্ত রঙগুলোর প্রতিসরণ কোণ ক্রমশ কমতে থাকে।

আবার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যদি বাড়ানো হয় তো দেখা যাবে প্রতিসরণ কোণও বাড়ছে। মনে রাখা দরকার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমলে প্রতিসরাঙ্কের মান বৃদ্ধি পায়।

প্রতিসরাঙ্কের সঙ্গে আলোর গতিবেগের সম্পর্ক

প্রতিসরাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য সম্পর্কে আগে কিছু বলেছি। আবার বলি, আলোর তরঙ্গতত্ত্ব (Wave theory of light) থেকে প্রমাণিত হতে পারে, যে কোনো পদার্থের প্রতিসরাঙ্ক মিউ (μ) হ'লে।

$$\mu = \frac{\text{শূন্যে আলোর গতিবেগ}}{\text{ওই পদার্থের আলোর গতিবেগ}}$$

এখন দুইটি মাধ্যম হিসেবে যদি 'ক' ও 'খ' নেওয়া হয় এবং 'ক' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'খ' মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক ক μ খ হয়, তা হ'লে

$$_ক\mu_খ = \frac{\text{'ক' মাধ্যমে আলোর গতিবেগ}}{\text{'খ' মাধ্যমে আলোর গতিবেগ}}$$

সমতল আলোর প্রতিসরণ দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন

লক্ষ্যবস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি সমতলে প্রতিসৃত হবার পর যখন বক্রভাবে

দৃষ্টিতে এসে পৌঁছোয়, তখন মনে হতেই পারে এই প্রতিসৃত রশ্মিগুলো অন্ত কোনো বিন্দু থেকে নিশ্চয়ই আসছে। এবার তাই বিন্দুটিকেই প্রতিবিম্ব বলা হবে। কারণ লক্ষ্যবস্তু ঘন মাধ্যমে থাকলে এবং চোখ তথা দৃষ্টি যদি লঘু মাধ্যমে রাখা হয়, তবে মনে হবে, লক্ষ্যবস্তু যেন খানিক ওপরে ওঠে আসছে। এবং লক্ষ্যবস্তু লঘু মাধ্যমে রাখা হ'লে মনে হবে ওই বস্তু যেন কিছুটা দূরে সরে গেছে। এখানে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, দর্শক কিন্তু ওপর থেকে সোজাসুজি নিচের দিকে তাকাবে। তার মানে লক্ষ্যবস্তু থেকে নির্গত রশ্মিগুলো খুব তির্যকভাবে বিভাগ তল-এ আপতিত হলে, সেগুলো বিবেচনার আওতায় আসবে না। কারণ প্রতিসরণের পর ওই রশ্মিগুলো বক্রভাবে দূরত্ব রচনা করবে এবং দৃষ্টিতেও ধরা দেবে না।

(ক) লক্ষ্যবস্তু ঘন মাধ্যমে এবং চোখ লঘু মাধ্যমে :

'ক' এক মাধ্যম। এই মাধ্যমে 'প' একটি বস্তু। 'প' থেকে একটি রশ্মি পখ অভিলম্বভাবে প্রতিসরণ তল কখ-এর ওপর আপতিত হলো (A১৫ চিত্র দেখো) সুতরাং ওই রশ্মি খ-১ মাধ্যমে সোজাসুজি খগ পথে চালিত হবে। আর একটি রশ্মি পক অল্প তির্যকভাবে ক বিন্দুতে আপতিত হয়ে কঘ পথে প্রতিসৃত হলো। প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব কন দূরবর্তী হলো এবার। এই দুই প্রতিসৃত রশ্মি খগ ও কঘ পেছনে বর্ধিত করলে প ১ বিন্দুতে ছেদ করবে। সুতরাং প্রতিসৃত রশ্মিদ্বয় চোখে পৌঁছলে মনে হবে প বিন্দু প-১ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। কাজে-কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে প১ বিন্দু হচ্ছে প বিন্দুর প্রতিবিম্ব। এখানে প্রমাণিত সত্য হলো : প্রতিবিম্ব প্রতিসরণ তল-এর দিকে উঠে এসছে।

(খ) লক্ষ্যবস্তু লঘু মাধ্যমে ও চোখ ঘন মাধ্যমে :

খ-১ লঘু মাধ্যমে প একটি বস্তু। প থেকে দু'টি রশ্মি পখ ও পক—প্রতিসরণতল কখ দ্বারা প্রতিসৃত হয়ে ঘন মাধ্যম ক-১-এ প্রবেশ করেছে। এবং যখন তা চোখে পৌঁছোয় তখন মনে হয় রশ্মিদ্বয় প-১ বিন্দু থেকে নির্গত হচ্ছে। প-১ বিন্দু প বিন্দুর প্রতিবিম্ব। তার মানে এখানে প্রতিবিম্ব প্রতিসরণতল থেকে দূরে সরে গেছে (চিত্র A১৬)।

এখানে $\frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{\text{Sin ই}}{\text{Sin র}} = \frac{\text{Sin পকন}}{\text{Sin ঘকন}}$

কিন্তু ∠ পকন-১ = ∠কপখ এবং ∠ঘকন = ∠প-১ কন-১ = ∠কপ-১খ

$$\text{সুতরাং}\ \frac{\mu_2}{\mu_1}=\frac{\text{Sin কগখ}}{\text{Sin কগ-১খ}}=\frac{\text{কখ}}{\text{কগ}}\Bigg/\frac{\text{কখ}}{\text{কগ-১}}=\frac{\text{কগ-১}}{\text{কগ}}$$

কিন্তু ক বিন্দু খ বিন্দুর খুব কাছে হওয়ায় কগ-১=খগ-১ এবং কগ=খগ,

$$\text{কাজেই}\ \frac{\mu_2}{\mu_1}=\frac{\text{খগ-১}}{\text{খগ}}=\frac{\text{লক্ষ্যবস্তুর আপাত উচ্চতা}}{\text{লক্ষ্যবস্তুর প্রকৃত উচ্চতা}}$$

এখন আগের মতো $\mu_1=1$ এবং $\mu_2=\mu$ হ'লে, $\mu=\frac{\text{খগ-১}}{\text{খগ}}$

$$=\frac{\text{লক্ষ্য বস্তুর আপাত উচ্চতা}}{\text{লক্ষ্য বস্তুর প্রকৃত উচ্চতা}}$$

আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন (Total internal reflection)

লঘু মাধ্যম থেকে আলোকরশ্মি যখন ঘন মাধ্যমে যায়, তখন আপতন কোণ যাই হোক না কেন, সব সময় রশ্মির কিছু অংশ দুই মাধ্যমের বিভেদ-তল থেকে প্রতিফলিত হয় এবং বেশিরভাগ অংশ ঘন-মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় (চিত্র A১৭ দেখো)। আলোকরশ্মি প্রথমে বায়ু থেকে কাচে এবং পরে কাচ থেকে বায়ুতে প্রবেশ করেছে। দেখো, উভয়ক্ষেত্রেই কিন্তু রশ্মির প্রতিফলন ও প্রতিসরণ হয়েছে। কিন্তু আলোকরশ্মি ঘন-মাধ্যম থেকে লঘু-মাধ্যমে যাওয়ার সময় সর্বদা এরূপ ঘটনা ঘটে না।

সংজ্ঞা : ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণের সময়ে আপতন-কোণ দুই মাধ্যমের সংকট-কোণ থেকে বেশি হ'লে আলোকরশ্মি লঘুতর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘনতর মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে।

তা হ'লে অজানা থাকলো কী? সংকট-কোণ তো। এ-সম্পর্কে আগে বলার অবকাশই আসেনি। পাঠ্যজীবনে এ-সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের কথা আজও স্মরণ করতে পারি: What is critical angle? On which factors does its value depend? বিষয়টি জানাই ছিলো। বলে বলতে পারা যাচ্ছে: ঘনতর মাধ্যমে থেকে লঘুতর মাধ্যমে আলোকরশ্মির প্রতিসরণের যে নির্দিষ্ট আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান ৯০ ডিগ্রি হয় অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভেদ-তল ঘেঁষে চলে যায়—তাকেই ওই মাধ্যমের জন্য সংকট-কোণ বলে। যথা কাচ ও বায়ুর ক্ষেত্রে সংকট-কোণ ৪২° বলতে বোঝা যায় যে

কাচ থেকে বায়ুতে আলোর প্রতিসরণের সময় ৪২ ডিগ্রি, আপতন কোণের জন্ত প্রতিসরণ কোণের ডিগ্রি দাঁড়াবে ৯০°। এই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে সংকট কোণের মান মাধ্যম যুগলের প্রকৃতি এবং আলোর রঙের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের জন্ত সাধারণ প্রতিফলন (Regular reflection)-এর সঙ্গে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের পার্থক্য কোথায় কোথায় তার বিশদ দেওয়া হলো :

সাধারণ প্রতিফলন	আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন
১। প্রতিফলক দরকার।	১। প্রতিফলকের দরকারই নেই। দুই মাধ্যমের বিভেদ-তলই এখানে প্রতিফলকের কাজ করে থাকে।
২। যে কোনো আপতন কোণের জন্ত আলোকরশ্মির প্রতিফলন সম্ভব।	২। দুই মাধমের সংকট কোণ অপেক্ষা বেশি কোণে আপতিত হ'লে আলোক-রশ্মির প্রতিফলন সম্ভব।
৩। আপতিত রশ্মির পুরো অংশের প্রতিফলন না হয়ে কিছু অংশের শোষণ ঘটে থাকে। ফলে গঠিত প্রতি-বিম্বের উজ্জ্বলতা হ্রাস পেয়ে থাকে।	৩। আপতিত রশ্মির সম্পূর্ণ অংশের প্রতিফলন ঘটে। ফলে গঠিত প্রতি-বিম্বের ঔজ্জ্বল্য থাকে সমান।

৩.

প্রিজম, লেন্স ও বর্ণালী : প্রিজম কী ? প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণ, চ্যুতিকোণ, প্রিজম দ্বারা প্রতিবিম্ব রচনা, প্রসঙ্গ : লেন্স, তার কার্যপ্রণালী ও ব্যবহার ; উত্তল লেন্স ও তার রাশি, প্রধান ফোকাস, ফোকাস-দূরত্ব, ফোকাস-তল, উন্মেষ, লেন্সের সাহায্যে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন ; যন্ত্র-প্রতিবিম্বের প্রকৃতি-প্রতিবিম্বের আকার ; লেন্সের ক্ষমতা, আলোকের বিচ্ছুরণ, সাদা আলোর যৌগিক প্রকৃতি ; বস্তুর বর্ণবৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা, আলোর বিস্তার ও গতিবেগ ।

শুধু অধ্যয়ন বা হাতেকলমে শেখা কাজকে কি আবিষ্কার বলা যায় ? যায় না। সৃষ্টি তো নয়ই। যেহেতু শিল্পসৃষ্টির শেষ বলে কিছু নেই। মঞ্চালোকবিজ্ঞানও শিল্পসৃষ্টি। নাটকের বিষয়বস্তু, ঘটনা, নাট্যক্ষণ, প্রতীকের মাধ্যমে কিছু বলা—প্রয়োজনা অনুযায়ী এ-নিয়ে নিয়ত পরীক্ষানিরীক্ষা না করলে উদ্ভাবনী শক্তির, কল্পনার জগৎ কিছুতেই বাড়তে পারে না। আর তা না বাড়লে সব নাট্যের সঙ্গে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাজ করাও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, মঞ্চের ওইটুকু পরিসরের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে একেবারে আলোকবিজ্ঞানের গোড়া থেকে পাঠ নিতে হবে কেন ? উত্তর : যে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ জানে না তার পক্ষে কি লেখাপড়া করা সম্ভব ? যার পায়ের তলায় মাটি নেই সে শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কি ? সুতরাং মঞ্চে যিনি আলোসম্পাতের কাজ করে, সে যদি আলোটা কী, কেন ইত্যাদি সম্পর্কে অনওয়াকিবহাল থাকে, সে মঞ্চে আলোর কাজ করবে কী করে ? বড়জোর সে একজন অনুগামী হতে পারবে মাত্র—যে গুরুর কাছে মোটামুটি মঞ্চে আলোক-সম্পাতের যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখে। সে আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষিত নয় বলে তার পক্ষে স্রষ্টা হওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁরা বিখ্যাত আলোকবিজ্ঞানী, নিত্য নতুন সৃষ্টির অদম্য প্রেরণা যার মধ্যে—তাকে আগে জানতে হবে আলোকবিজ্ঞান আসলে কী ও কেন। তারপর মঞ্চের সীমার মধ্যে কাজ করে দক্ষ সৃষ্টিশীল মঞ্চালোকবিজ্ঞানী হতে পারবে।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে নিত্য নতুন আবিষ্কারের নেশায় কাজ করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

নানা জটিল সমস্যা আসছে—তাঁরা তার সমাধানসূত্র সন্ধানে লেগে পড়ছেন। আলোকের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি মঞ্চালোকবিজ্ঞানেরও নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি, বস্তু আবিষ্কৃত হচ্ছে। যে-ব্যক্তি আলো বস্তুটা কী—সে বিষয়ে অজ্ঞ তার পক্ষে এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক দু'টি পরিচ্ছেদে আলোকবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি, সূত্র এবং সংজ্ঞার বিশদ দেওয়া হয়েছে। এবার আসছি প্রিজ্‌ম সম্পর্কিত আলোচনায়। আলোক-বিজ্ঞানে তো বটেই, মঞ্চালোকবিজ্ঞানেও এর প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়। যদিও আগেই অর্থাৎ এখনই আমি মঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করে তাতে অনুপ্রবেশে সম্মত নই। এই পরিচ্ছেদে আমি প্রিজ্‌ম্‌, লেনস ও বর্ণালী প্রসঙ্গটির বিশদ আলোচনা করছি। আগের পরিচ্ছেদগুলির মতন একজন শিক্ষার্থী মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর কাছে বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী শ্রী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের এই আবিষ্কার সমস্ত পৃথিবীকে তোলপাড় করে তুলেছিলো। শ্রীচন্দ্রশেখর ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পান। তাঁর জন্ম ত্রিচিনা-পল্লীতে। ১৯২৮ সালে তাঁর এই আবিষ্কারকে আখ্যা দেওয়া হয় 'রমন এফেক্ট'।

(১) প্রিজম কী? প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণ

যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রিজম কাকে বলে এবং সে বস্তুটি দেখতে কেমন? তা হ'লে এই প্রশ্নের উত্তর হবে: পরস্পরের সঙ্গে আনত তিনটি সমতল পৃষ্ঠদ্বারা সীমাবদ্ধ ত্রিভুজাকৃতি, স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যকেই প্রিজ্‌ম্‌ বলে (চিত্র A ১৮ দ্রষ্টব্য)

(ক) প্রিজম্‌-এর দু'টি সমতল-পৃষ্ঠ যে সরলরেখায় মিলিত হয়, তাকে প্রিজম্‌-এর 'প্রতিসারক-ধার' বা কেবল 'ধার' বলা হয়ে থাকে। A ১৮ চিত্রে পঘ হলো প্রিজম-এর ধার।

(খ) উপরোক্ত ধার-এর সঙ্গে উলম্ব ছেদকে প্রধান ছেদ বলা হয়। কখগ (চিত্র A ১৮) একটি প্রধান ছেদ।

(গ) প্রিজম-এর দুই সমতল পৃষ্ঠ কখ ও কগ যে-কোণে পরস্পর আনত থাকে, তাকে বলা হয় প্রতিসারক কোণ। এখানে ∠ক প্রতিসারক কোণ।

(ঘ) কখ ও কগ যে তল-এ রয়েছে, সেই তলকে প্রিজম-এর প্রতিসারক-পৃষ্ঠ বলা হয়। চিত্র A ১৮-এ বলকপ ও ববপঘ কিন্তু প্রতিসারক পৃষ্ঠ।

(ঙ) খগ প্রিজম-এর ভূমি। এবং প্রতিসারক কোণের বিপরীত-পৃষ্ঠ।

প্রিজম-এর আর একটি ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি এখানে সংযোজন করছি:

প্রিজম: একটি কাচের ত্রিভুজাকৃতি ফলক—যার তলগুলি পরস্পরের সঙ্গে আনত (inclined) এবং যার প্রান্তরেখাগুলি (edges) সব পরস্পর সমান্তরাল। প্রিজমের মোট পাঁচটি তল (surface)। তিনটি আয়তাকার এবং দুইটি ত্রিভুজাকার। অন্য পৃষ্ঠায় চিত্রে একটি প্রিজমের ছবি দেখানো হয়েছে। খক প্রিজমের একটি প্রান্তরেখা। কখগ প্রিজমের একটি ছেদ (Section)। একে প্রিজমের প্রধান ছেদ (Principal Section) বলা হয়। এটি প্রিজমের তিনটি প্রান্তরেখার সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে। আমরা যখন প্রিজমের দ্বারা আলোকের প্রতিসরণ আলোচনা করবো তখন সর্বদা মনে করবো যে, রশ্মি প্রিজমের প্রধান ছেদের তলে (Plane) অবস্থান করছে। খকগ কোণকে প্রিজমের প্রতিসারক কোণ ও খগ কে ভূমি বলা হয়। কখ অথবা কগ যে-তলে অবস্থিত তাদের প্রতিসারক পৃষ্ঠ (refracting surface) বলা হয়। (চিত্র A ১৯)।

চ্যুতিকোণ (Angle of deviation)

মনে করে নিই (চিত্র A২০) কখগ প্রিজম-এর এক প্রধানতম ছেদ। পস রশ্মি কখ তল-এ স বিন্দুতে আপতিত হয়েছে। এবার কিভাবে আলোকরশ্মি প্রতিসৃত হবে? উত্তর: কাচ মাধ্যমে প্রবেশ করলেই। সহ সেই পরিসৃত রশ্মি যা কখ তল-এর ওপর আঁকা অভিলম্বের দিকে সরে যাবে। কগ তল-এ আলোকরশ্মি হ বিন্দুতে আপতিত হবার পর আবার বায়ু মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে। এর ফলটা তা হ'লে কা হতে পারে? উত্তর: ফলে রশ্মি আবার প্রতিসৃত হবে এবং কগ তলে অঙ্কিত অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে হট সরল রেখায় সীমা অতিক্রম করে বেরিয়ে যাবে। তার মানে পসহট হয়ে দাঁড়ালো আলোকরশ্মির সমগ্র পথ। তা হ'লে এটা প্রমাণিত হলো যে, প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে চলে যাওয়ার ফলে রশ্মি কিন্তু প্রিজম-এর ভূমির (খগ) দিকে বেঁকে যেতে বাধ্য। রশ্মির এই যে পথচ্যুতি তাই চ্যুতি (deviation)। আপতিত রশ্মি পস-এর অভিমুখ ও নির্গম রশ্মি হট-এর অভিমুখ পরস্পরের সঙ্গে যে-কোণ উৎপন্ন করে তাকে চ্যুতিকোণ বলা হয়ে থাকে। পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের তুলনায় প্রিজম-এর প্রতিসরাঙ্ক কম হ'লে রশ্মির চ্যুতি উল্টো হয় অর্থাৎ ভূমির দিকে না গিয়ে প্রিজম-এর শীর্ষের দিকে বেঁকে যায়।

প্রিজম দ্বারা প্রতিবিম্ব রচনা:

লক্ষ্যবস্তু থেকে বেরুনো আলোকরশ্মি কোনো মাধ্যম দ্বারা প্রতিসৃত হলে, সব

যা অসদ্ প্রতিবিম্ব রচিত হয়ে থাকে। যেহেতু প্রিজম এক প্রতিসারক-মাধ্যম (refracting medium) সেই জন্য প্রিজম্ লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব রচনা করতে পারে।

পরীক্ষা: মনে করা যাক কোনো এক প্রদীপের শিখার যে কোনো বিন্দু প থেকে একগুচ্ছ অপসারী আলোকরশ্মি কখগ প্রিজম-এর ওপর পড়লো (চিত্র A ২ দ্রষ্টব্য)। প্রিজম-এর ওই রশ্মিগুলোর মধ্যরশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণে স্থাপিত। এখ কি মনে হবে বলে মনে হয়? চিত্রটি লক্ষ্য করো। দেখো রশ্মিগুলো প্রতিসৃত হবা পর চোখের বলয়ে এমনভাবে গিয়ে পৌঁছচ্ছে যে, মনে হতেই পারে, যেন ওরা প-১ থেকে অপসৃত হচ্ছে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে প-১ বিন্দু আসলে প বিন্দুর অসদবিম্ব কেন এমন হয়? কারণ প্রিজমটি রশ্মিগুচ্ছের মধ্যরশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণে স্থাপি হওয়ায় প্রতিসৃত হবার পরও ওই রশ্মি-সমষ্টির পারস্পরিক ব্যবধান কিন্তু আগে মতোই থেকে যাবে। তার মানে প্রিজমকে ওইভাবে রাখা হ'লে লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবি স্পষ্ট দেখা যাবেই।

(২) প্রসঙ্গ লেন্স এবং তার কার্যপ্রণালী ও ব্যবহার

আগে সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করা যাক। একবার বলা হয়েছে: দু'টি গোলীয় অথবা একটি গোলীয় ও আর একটি সমতল দ্বারা সীমাবদ্ধ স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে 'লেন্স' বলে। আবার অন্যত্র আমরা পড়েছি: কোনো স্বচ্ছ প্রতিসারক (refracting) মাধ্যমকে যদি দু'টি গোলীয় (Spherical) অথবা একটি গোলীয় ও একটি সমতল-তল মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা যায়, তবে সেই মাধ্যমকেই বলা হয় 'লেন্স'

বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটু পেছনে যেতে পারি। অর্থা রশ্মিগুচ্ছকে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা যে লেন্সের আছে, তা নাকি বহুদি পূর্ব থেকেই জানা ছিলো। আমরা জানি, বহু শতবর্ষ আগে আতস কাচ (Burning Glass) আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৫৭ সালে লেন্সের এই ধর্মকে অবলম্বন করে কাচে গোলক নির্মিত হয়েছিলো। এই গোলক দ্বারা সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে ঘণ্টা ও মিনিট চিহ্নিত একখণ্ড কাগজ পুড়িয়ে সময় নির্দেশ করার ব্যবস্থা নাকি হয়েছিলো এখন, অর্থাৎ বর্তমানকালে চশমা, ক্যামেরা, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের মতন অনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে লেন্সের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

আবার লেন্স-এর বিশদ আলোচনায় আসা যাক:

গোলীয় লেন্স দু'রকমের হয়ে থাকে: (ক) উত্তল (convex) ও অবতল (concave)। এদেরই আবার আলাদা দু'টি নাম যথাক্রমে (ক) অভিসারী

(converging) ও অবসারী (Diverging)। যে-লেন্সের মধ্যস্থল মোটা এবং প্রান্তের দিক ক্রমশ সরু তাকে উত্তল লেন্স বলে। উত্তল লেন্স মবলগে তিন রকমের বলে ধরে নেওয়া হয়েছে :

(ক) যার দু'টি তলই গোলীয় তা উত্তল লেন্স; (খ) যার একটি তল গোলীয় এবং অন্যটি সমতল তা সমোত্তল লেন্স (Plane convex) ; (গ) যার একটি তল উত্তল এবং অন্যতল গোলীয় অবতল তাকে বলা হয়েছে অবলোত্তল লেন্স (Concave convex lens)। (চিত্র A ২২)।

যে লেন্সের মধ্যাংশ সরু অথচ প্রান্তের দিক ক্রমশ মোটা তা অবতল লেন্স। এরও আছে তিনটি রূপ : (ঘ) অবতল ; (ঙ) সমতল ; (চ) উত্তোলবতল।

এ-ছাড়াও লেন্সের দুই তল-এর আকৃতির ওপর নির্ভর করে নানা রকম লেন্স তৈরি করা যেতে পারে। যেমন : উভোত্তল লেন্স (Double or bi-convex)—যে লেন্সের উভয় তল উত্তল তাকেই উভোত্তল লেন্স বলা হয় ; সমতলোত্তল (Plano convex)—যে লেন্সের একটি তল সমতল ও অন্যটি উত্তল তাকে সমোত্তলোত্তল লেন্স বলে ; উভাবতল (Double or bi-concave)—এর দু'তলই অবতল ; সমতলাবতল (plano-concave) এর একদিক সমতল অন্যদিক অবতল ; উত্তলাবতল (convexo-concave)—যে অবতল লেন্সের একদিক উত্তল অথচ অন্যদিক অবতল। (চিত্র A ২৩, A ২৪)।

এই ব্যাখ্যার মধ্যে বাদ পড়লো কোনটা ? বলা হয়নি যা, তা হলো উত্তল লেন্সকে কেন অভিসারী, আর অবতল লেন্সকে কেন অপসারী বলা হয়, তার বিশ্লেষণ।

আমরা দেখেছি আলোকরশ্মি কাচের প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে প্রিজম্-এর ভূমির দিকে তা বেঁকে যায়। এখন একটি উত্তল লেন্স চিত্র A ২৫ (ক) দ্রষ্টব্য-কে যেমনটি দেখানো হয়েছে তেমনি ছোট ছোট প্রিজম-এর সমষ্টি বলে মনে করা যেতে পারে। এই প্রিজমগুলোর ভূমি লেন্সের কেন্দ্রের দিকে অভিমুখী। জেনে রেখো, আলোকরশ্মি কাচের প্রিজ্‌ম্-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'লে তা প্রিজম-এর ভূমির দিকে বেঁকে যায়। সুতরাং যদি লেন্সের ওপর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হয়, তবে ছোট ছোট প্রিজম-এর দ্বারা বিচ্যুত হয়ে রশ্মিগুলো একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হবে। তার মানে রশ্মিগুলো অভিসারী হবে। এ কারণেই উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্স বলা হয়।

ওই একইভাবে অবতল লেন্সকে ছোট ছোট প্রিজম-এ ভাগ করলে প্রিজম-গুলোর ভূমি লেন্সের প্রান্তের অভিমুখী হবে। কাজেই এক্ষেত্রে রশ্মিগুলোর চ্যুতি বিপরীত হতে বাধ্য (চিত্র A ২৫ (খ) দ্রষ্টব্য)। এ-অঙ্গে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ

লেন্সদ্বারা প্রতিসৃত হবার পর মনে হতেই পারে, যেন একটি বিন্দু থেকে তা অপসৃত হচ্ছে। তার মানে তা অপসারী রশ্মিগুচ্ছ-এ পরিণত হচ্ছে। এই কারণেই অবতল লেন্সকে অপসারী লেন্স বলা হবে।

উত্তল লেন্স ও তার রাশি ঃ

উত্তল লেন্সের ৫টি রাশির কথা আমাদের জানা : (অ) প্রধান অক্ষ (Principal axis); (আ) আলোক-কেন্দ্র (Optical centre); (ই) প্রধান ফোকাস (Principal focus); (ঈ) ফোকাস দূরত্ব (Focal length); (উ) ফোকাস তল (Focal plano)।

(অ) **প্রধান অক্ষ ঃ** লেন্সের দু'টি গোলীয় তল-এর বক্রতা-কেন্দ্র সংযুক্ত করলে যে-সরলরেখার উদ্ভব হয় তাকেই প্রধান অক্ষ বলে। চিত্র A ২৬-এ দেখো গ-১ এবং গ-২ দুই তল-এর দুই বক্রতা কেন্দ্র। তার মানে গ-১র ম গ-২ রেখা ওই লেন্সের প্রধান অক্ষ।

(আ) **আলোক-কেন্দ্র :** কোনো লেন্সের যে-কোনো তল-এ যদি কোনো আলোকরশ্মি এমনভাবে আপতিত হয় যে, ওই লেন্সের ভেতর দিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় তল থেকে বহির্গত হওয়ার সময় তা আপতিত রশ্মির সমান্তরালভাবে নির্গত হয় তবে লেন্সের মধ্যেকার ওই রশ্মির গতিপথ প্রধান অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুকেই লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলা হয়।

প্রমাণ : স ক একটি আলোকরশ্মি বা লমন-তলে ক বিন্দুতে আপতিত হয়ে লেন্সের মধ্যে কখ পথে এগিয়ে গেলে এবং খপ পথে দ্বিতীয় তল থেকে সক অভিমুখে সমান্তরালভাবে নির্গত হলো। এ-ক্ষেত্রে কখ এবং প্রধান অক্ষ গ-১ গ-২—এই রেখা দু'টির ছেদবিন্দু য হবে লেন্সের আলোক কেন্দ্র।

(ই **প্রধান ফোকাস :** উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনো এক বর্ণের আলোকরশ্মিগুচ্ছ লেন্স থেকে প্রতিসৃত হয়ে নির্গত হবার পর প্রধান অক্ষের ওপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে উত্তল লেন্সের ফোকাস বলা হয়।

এখানে বলে রাখা ভালো, লেন্সের দু'টি মুখ্য ফোকাস থাকে। আগে যে ফোকাসের কথা বলা হয়েছে তাকে বলা হয় : দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস। তা হ'লে প্রথম মুখ্য ফোকাস কাকে বলবো ? উত্তরের জন্য চিত্র A ২৭ লক্ষ্য করো :

মনে করা যেতে পারে উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের ওপর ক-১ এমন একটি বিন্দু যা থেকে একগুচ্ছ রশ্মি অপসৃত হয়ে লেন্সের ওপর আপতিত হলো এবং প্রতিসরণের

রূপ রশ্মিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে নির্গত হয়েছে (চিত্র A ২৮(ক) । এ ক্ষেত্রে ফ-১ বিন্দুকে মুখ্য ফোকাস বলা হয় ।

ঠিক ঐ-রকমই যদি একগুচ্ছ অভিসারী রশ্মিকে এমনভাবে অবতল লেন্সের দিকে পাঠানো হয় যে, লেন্সের অবর্তমানে তারা লেন্সের প্রধান অক্ষভুক্ত বিন্দু ফ-১-এ মিলিত হতো কিন্তু লেন্সদ্বারা প্রতিফলনের ফলে তারা প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে নির্গত হওয়ায় ফ-১ বিন্দুকে প্রথম মুখ্য ফোকাস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ।

(ঈ) ফোকাস-দূরত্ব :

লেন্সের আলোক-কেন্দ্র থেকে প্রধান অক্ষ বরাবর ফোকাস বিন্দু (প্রথম অথবা দ্বিতীয়) পর্যন্ত দূরত্বকে ফোকাস-দূরত্ব বলে। চিত্র A ২৮ লক্ষ্য করো, লেন্সের আলোককেন্দ্র ব থেকে ফ-১-কে ফোকাস দূরত্ব বলা হয়ে থাকে ।

(উ) ফোকাস-তল :

লেন্সের মুখ্য ফোকাস-এর ভেতর দিয়ে এবং প্রধান অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে একটি তল কল্পনা করলে তাকেই ফোকাস-তল বলা হয় ।

+ আলোকবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সব সময় মনে রাখতে হবে, উত্তল বা অবতল— যে কোনো লেন্সের মুখ্য ফোকাস কিন্তু স্থির বিন্দু—কিন্তু গৌণ ফোকাস কখনও স্থির বিন্দু নয় ।

* উন্মেষ (Aperture) :

লেন্সের আকার কি ? গোল । সুতরাং সাধারণ লেন্সের ব্যাসকে তার উন্মেষের পরিমাপ বলে ধরা হয়ে থাকে ।

লেন্সের সাহায্যে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন (Formation of image of an object by lense)

কোনো লক্ষ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে আসা আলোকরশ্মি যদি প্রতিসৃত হয়, তবে, ওই প্রতিসৃত রশ্মি ওই বস্তুর প্রতিবিম্ব রচনা করে। এবার প্রতিসৃত রশ্মিগুলো যদি কোনো বিন্দুতে মিলিত হয়, তা হ'লে বিন্দুটিকে বলা হবে বস্তুবিন্দুর সদ্‌ প্রতিবিম্ব । আবার যদি ওই বিন্দু থেকেই রশ্মিগুলো অপসৃত হয় তাকে অসদ্‌ প্রতিবিম্ব বলা হবে ওই বস্তুবিন্দুর। মনে রাখতে হবে লেন্স আসলে এক প্রতিসারক (Refracting)-মাধ্যম ।

দণ্ডের ওপর জ্বালানো একটি মোমবাতির শিখা আর একটি দণ্ডের ওপর রাখা কাগজের পর্দা, এই দুইয়ের মাঝখানে একটি উত্তল লেন্স। এবার লেন্সকে একটু আগুপিছু করালে কাগজের ওপর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়বে।

এবার আসা যাক উত্তল লেন্স কাজে লাগানো হয়েছে এমন কয়েকটি উদাহরণে :

যন্ত্র	প্রতিবিম্বের প্রকৃতি	প্রতিবিম্বের আকার
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য	সদ, অবশীর্ষ	বস্তু অপেক্ষা ছোট
সিনেমার প্রজেক্টর	সদ, অবশীর্ষ	বস্তু অপেক্ষা বড়
ক্যামেরা	সদ, অবশীর্ষ	বস্তু অপেক্ষা ছোট
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য	সদ, অবশীর্ষ	বস্তু অপেক্ষা বড়
বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র	অসীমে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়	বস্তু অপেক্ষা অতিশয় বড়
বিবর্ধক কাচ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিনেত্র	অসদ, সমশীর্ষ	বস্তু অপেক্ষা অনেক বড়

লেন্সের গুণাগুণ প্রসঙ্গে এলে দেখা যাবে, লেন্সের অক্ষের মধ্যে কোনো বিস্তৃত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে তা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা সম্ভব। ইংরেজিতে বললে ব্যাপারটা আরও সহজ মনে হবে : Determination of the position of image by geometrical construction. এবার ব্যাখ্যায় আসা যাক :

(ক) উত্তল লেন্সের প্রথম মুখ্য ফোকাস-এর মধ্য দিয়ে যদি কোনো রশ্মি অগ্রসর হয় অথবা অবতল লেন্সের প্রথম মুখ্য ফোকাস-এর দিকে এগিয়ে যায় তা হ'লে লেন্স দ্বারা প্রতিসৃত হবার পর তা লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে চলবে ;

(খ) লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে এগিয়ে গিয়ে কোনো রশ্মি যদি লেন্সের ওপর আপতিত হয় তা হ'লে প্রতিসরণের পরে উত্তল লেন্সের রশ্মি দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস-এর মধ্য দিয়ে যাবে এবং অবতল লেন্সের বেলাতে রশ্মি দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস থেকে অপসৃত হবে এরকম মনে হবে ;

(গ) কোনো রশ্মি লেন্সের আলোক কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে কিন্তু রশ্মির কোনো বিচ্যুতি হবে না—সে সরাসরি একই পথে চলতে থাকবে।

লেন্সের ক্ষমতা :

নক্ষলোকেবিজ্ঞানীকে লেন্সের ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজ্ঞাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

সংজ্ঞা : উত্তল ও অবতল এই লেন্সের ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলা যায়—(ক) উত্তল

লেন্সের ক্ষমতা অর্থে বোঝানো হচ্ছে যে, ওই লেন্স সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে তার কতো কাছে একত্রিত করতে পারে; (খ) অবতল লেন্সের বেলায় কিন্তু বুঝতে হবে যে, ওই লেন্স সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে কতোখানি অপসৃত করে দিতে পারে।

(৩) আলোকের বিচ্ছুরণ (Dispersion of light)

স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৬৬ সালে আলোকের বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। কী ভাবে করেন?

উত্তর: তিনি দেখতে পান যে, সূর্যরশ্মি (সাদা আলোক) কাচের প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে গেলে তা বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। আলোকের এই বিশ্লিষ্ট হবার ঘটনাকেই বলা হয় আলোকের বিচ্ছুরণ।

বিশদ পরীক্ষা:

খুব ছোট এক ছিদ্রপথে আলোকরশ্মিকে প্রিজম-এর কোনো এক প্রতিসারক-পৃষ্ঠে ফেলা হোক। এবার প্রিজম-এর ভেতর দিয়ে প্রতিসরণের পর বেরিয়ে আসা রশ্মিগুলোকে পর্দায় ফেললে দেখা যাবে বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট এক আলোর পটি। এবার ওই বর্ণাঢ্য পটি পরীক্ষা করলে কী দেখতে পাবো আমরা? দেখতে পাবো সাতটি রঙ। ওপরের প্রান্তটি হবে লাল, নীচে বেগনী—মাঝে আরও পাঁচটি রঙ থাকবে। এই সপ্ত রঙের সংক্ষিপ্ত ইংরেজি নাম VIBGYOR. বাংলায় এই সূত্রানুযায়ী নাম করা যেতে পারে 'বেনীআসহকলা'। অর্থাৎ বেগনী (Violet), নীল (Indigo), আকাশী (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow) ও লাল (Red)। প্রত্যেক রঙের আদ্য অক্ষর নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত নাম।

এবার প্রশ্ন হতে পারে, এই বর্ণবিশিষ্ট পটিকে কী বলা হবে? উত্তর: বর্ণালী (Specturm)। এতেও কি রহস্যটা পরিষ্কার হলো? হয়তো সকলের কাছে নাও হতে পারে। এ-কারণে বিশ্লেষণ করা যাক: আলোকের কোন ধর্মের পার্থক্যের জন্য বর্ণালীতে বিভিন্ন রঙ দেখা যায় এবং কেন বর্ণালীর ওপরে লাল আলো থাকে আর কেনইবা একেবারে নীচে থাকে বেগনী রঙ? জেনে রাখো, প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ হ'লে তা সব সময়ই প্রিজম-এর ভূমির দিকে বেঁকে যায়। এর ফলে রশ্মির কিছু পরিমাণ চ্যুতি ঘটবেই। বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির চ্যুতি-কোণের পরিমাণও বিভিন্ন হয়ে থাকে। সে জন্য এরা বিভিন্ন কোণে প্রিজম থেকে নির্গত হয়। একই আপতন কোণের জন্য বেগনী রঙের আলোর চ্যুতি ঘটে সব থেকে বেশি আর লাল রঙের আলোকের চ্যুতি হয় সবচেয়ে কম। ঠিক এই কারণেই বর্ণালীর

সর্বাপেক্ষা ওপরে লাল এবং সব থেকে নীচে দেখা যায় বেগনী রঙ। হলুদ রঙের রশ্মিচ্যুতি লাল ও বেগনী রঙের চ্যুতির মাঝামাঝি থাকে বলে একে মধ্যবর্তী রঙ বলা হয়। এখানে আবার বলি, চ্যুতি অর্থে deviation বুঝতে হবে।

বর্ণালী কিন্তু দু'রকমের হয়ে থাকে। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। এখন শুদ্ধ বর্ণালী বলতে কি বুঝবো, অশুদ্ধ বর্ণালী বলতেই বা কী? (ক) যে-বর্ণালীতে বিভিন্ন রঙ পৃথক ও স্পষ্টভাবে দেখা যায় পরন্তু এই রঙগুলো ক্রমিক পদ্ধতিতে নিজের নিজের জায়গা অধিকার করে তাকেই **শুদ্ধ বর্ণালী** বলা হয়; (খ) যে বর্ণালীতে রঙগুলো পৃথক ও স্পষ্টভাবে দেখা যায় না এবং তারা নিজের নিজের জায়গা দখল করতে পারে না তাকে **অশুদ্ধ বর্ণালী** বলে।

এখানে রামধনু প্রসঙ্গে কিছু বলে নেওয়া যাক। আসলে জলকণাগুলো শূন্যে প্রিজম্-এর কাজ করে। রামধনুর বৃত্তের বাইরের দিকে লাল ও ভেতরের দিকে বেগনী এবং অন্যান্য রঙগুলো এই দুইয়ের মাঝখানে থাকে। একে বলা হয় প্রাথমিক রামধনু। আবার কদাচিৎ প্রাথমিক রামধনুর ওপর আর একটি অস্পষ্ট, ঝাপসা রামধনু আমরা দেখতে পাই। একে বলে গৌণ রামধনু। গৌণ রামধনুতে প্রাথমিক রামধনুর উল্টো বর্ণসজ্জা দেখা যায়।

শাদা আলোর যৌগিক প্রকৃতি :

একটি প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে শাদা আলো পাঠালে তা সাতটি বর্ণে বিশ্লিষ্ট হবে। এবার যদি আর একটি একই ধরনের প্রিজম প্রথম প্রিজম্-এর পাশে উল্টো করে বসানো হয়, তবে ওই বর্ণগুলি মিলিতভাবে উৎপন্ন করবে শাদা আলো। এর দ্বারাই শাদা আলোর যৌগিক প্রকৃতি প্রমাণিত হয়।

বস্তুর বর্ণ-বৈষম্য :

হলুদ ফুলকে দিনের বেলায় সূর্যালোকে দেখলে হলুদ এবং অন্ধকারে কালো দেখায় কেন—এরকম প্রশ্ন মনে উদয় হ'লে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। আসলে কোনো বস্তু অস্বচ্ছ হ'লে তা যে-বর্ণকে প্রতিফলিত করতে পারে বস্তুটি সেই রঙে রঙীন হয়ে থাকে। যেমন ধরো লাল ফুল সূর্যালোকে (শাদা আলোকে) শুধুমাত্র লাল রঙকে প্রতিফলিত করে এবং বাকি রঙকে শোষণ করে। সে জন্যই ওই ফুলকে লাল দেখা যায়।

আবার কোনো রঙ স্বচ্ছ হ'লে তা যে-রঙকে নিজের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করে বস্তুটি সেই রঙে রঙীন হয়। যেমন লাল রঙের কাচখণ্ডের একপাশে শাদা আলো

(সূর্যালোক) পড়লে তা শুধু লালকেই নিজের মধ্যে দিয়ে প্রেরণ করে এবং বাকি রঙগুলো শোষণ করে নেয়। ফলে কাচটিকে লাল দেখা যায়।

হলুদ ফুলকে শাদা আলোর সামনে ধরলে তা হলুদ রঙকে শোষণ করে এবং সে জন্যই এই ফুলকে হলুদ দেখায়। অন্ধকারে ওই ফুলের ওপর শাদা আলো না পড়ায় তা হলুদ রঙ প্রতিফলিত করতে পারে না। সে জন্যই ওই অন্ধকারে ফুলকে কালো দেখায়।

লাল একখণ্ড কাপড়কে সবুজ আলোয় দেখলে কালো দেখাবে। কেন? কারণ সবুজ আলো লাল বস্ত্রখণ্ডের ওপর পড়লে কাপড় ওই বর্ণকে শোষণ করে। আসলে লাল আপতিত না হওয়ায় কোনো রঙ প্রতিফলিত না করার জন্যই বস্ত্রখণ্ডকে কালো দেখাবে।

প্রতিবন্ধকতা :

দু'টি আলোক-তরঙ্গ যখন একই সঙ্গে যুগপৎ কোনো জায়গায় এমনভাবে পতিত হয় যে, একটি তরঙ্গের শীর্ষবিন্দু অন্য তরঙ্গের শীর্ষবিন্দুতে আপতিত হয়েছে, তখন দু'টি তরঙ্গ একই কলায় (phase) পরস্পর অবস্থান করে। তরঙ্গগুলো যুক্ত হতে থাকে এবং যার বিস্তৃতি দু'টি তরঙ্গের বিস্তৃতির সমান হয়। কিন্তু যদি একটি তরঙ্গের শীর্ষবিন্দু অপর তরঙ্গের নিম্নতম বিন্দুতে মিলিত হয় তখন তরঙ্গ দু'টির অবস্থা কিন্তু একই কলায় নেই (out of phase)। দু'টি সমান আলোকতরঙ্গ যখন একই কলায় অবস্থিত থাকে না, তখন একে অপরকে বাতিল করতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং জন্ম দেয় পরিপূর্ণ আলোর।

১৮০১ সালে টমাস ইয়ং দেখান, কেমন করে এই প্রতিবন্ধকতা ঘটে থাকে। উৎস থেকে আলোকে তিনি অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্যেকার কাছাকাছি থাকা দু'টি ছোট ফালির ভেতর দিয়ে যেতে দেন এবং ওই আলো পতিত হয় এক পর্দায়। ওই উভয় ফালি থেকে সমদূরত্বের এক পর্দাস্থ বিন্দুতে সাধারণত আলো একই কলাভুক্ত থাকে। উজ্জ্বল আলোর একটি পটি তখন এখানে ওখানে দৃশ্যমান হয়—যাকে বলা হয় ঝালর (Fringe), কিন্তু ওই পটির যে-কোনো পাশের তরঙ্গগুলো একই কলায় থাকতে পারে না, কারণ ওই বিন্দুগুলো থেকে দু'টি ফালির দূরত্ব সমান হয় না। এই বিন্দুগুলোতেই আলোকতরঙ্গ বাধা পায় এবং তখন অন্ধকারের একটি ঝালর দেখা দেয়।

পর্দার অন্য বিন্দুরও অন্ধকার এবং উজ্জ্বল ঝালর থাকে—যা নির্ভর করে ফালি থেকে বিন্দুর দূরত্বের ওপর। উজ্জ্বল আলোর ঝালর তখনই তৈরি হতে পারে

যখন বিন্দু থেকে দু'টি ফালির দূরত্বের পার্থক্য হয় অর্ধ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান। কারণ আলো তখন একই কলায় অবস্থান করে না।

আলোকের বিস্তার ও গতিবেগ (Propagation and velocity)

ফ্রান্সের জাঁ বার্নার্ড লিওন ফুকল্ট (১৮১৯-১৮৬৮) 'আলোকের তরঙ্গবাদ' এই পুরনো চিন্তালব্ধ সত্যকে পরীক্ষামূলক প্রামাণিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

জেনে রাখতে হবে, শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ ৩×১০^{১০}সেমি/সেকেণ্ড অথবা বলা হয় এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল/সেকেণ্ড। এই গতিবেগ কিন্তু যে-কোনো জড় মাধ্যমে আলোর গতিবেগ থেকে বেশি।

আলাদা আলাদা মাধ্যমে আলোর গতিবেগও কিন্তু আলাদা আলাদা হয়। ঘনতর মাধ্যমে গতিবেগ কম, আবার লঘু মাধ্যমে কিছু বেশি। এ-জন্যেই বায়ুর তুলনায় জলে আলোকের গতিবেগ কম হয়ে থাকে।

প্রশ্ন হতে পারে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মান কতো? উত্তর: নানা বর্ণের রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মান ভিন্ন ভিন্ন রকমের। ধরো লাল রঙ-এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মান ৬৫০০০ A°, হলুদ—৫৮৯৩ A°, বেগুনী—৩৯০০০ A°।

আমরা জানি, আলো আসলে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তরঙ্গের আকারে গমন করে। কিন্তু তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মান অত্যন্ত ছোট বলে মনে হয় যখন আলো সরলরেখায় যাচ্ছে। এই কারণেই এমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, আলো সরলরেখায় গমনাগমন করে থাকে।

একটি প্রমাণ দেওয়া যাক: আলোক উৎসের ঠিক সামনে অস্বচ্ছ কোনো বস্তুকে ধরলে তার ছায়া বস্তুর পেছনের পর্দায় পড়ে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আলো সরল রেখায়ই চলাচল করে থাকে।

এই পর্যায়ের শেষ প্রশ্ন ও উত্তর: শব্দের তরঙ্গ এবং আলোক তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কী এবং কেমন? এর উত্তর দিতে হলে বলতে হয়: (ক) শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে খুব বড় হয়ে থাকে; (খ) শব্দ তরঙ্গ তির্যক তরঙ্গের আকারে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করে। অথচ আলোক-তরঙ্গ কিন্তু তির্যক প্রকৃতিরই হয়ে থাকে; (গ) শব্দের তরঙ্গ শূন্য জায়গার মধ্য দিয়ে গমনাগমন করতে পারে না কিন্তু আলোক-তরঙ্গ শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে; (ঘ) শব্দের গতিবেগের তুলনায়, আমরা জানি, আলোকের গতিবেগ অনেক বেশি। জেনে রাখো, বায়ু-মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ ৩৩২ মিটার/সেকেণ্ড। আলোর গতিবেগ হলো ৩×১০^{১০}সেমি/সেকেণ্ড।

৪.

তড়িৎ বিশ্লেষণ: পরিবাহী ও অপরিবাহী তড়িৎ, ইলেকট্রণ তড়িৎ, আয়ন তড়িৎ, তড়িৎ বিশ্লেষ্য, তড়িৎ অবিশ্লেষ্য, অ্যানোড, ক্যাথোড, ক্যাটায়ণ, অ্যানায়ণ, কুলম্ব; তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ: তড়িৎ চৌম্বক রশ্মি, তরঙ্গ, অণুতরঙ্গ, তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালী, দৃশ্যমান আলো, দৃশ্যমান বর্ণালী, বর্ণালী বিশ্লেষণ, বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র···

এবার ফ্যারাডে সূত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। ফ্যারাডে মানে মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭)। জন্মেছিলেন ইংলণ্ডে। ১৮৩১ সালে আবিষ্কার করেন কতো পরিমাণ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য কী পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)-এর এই সূত্রকেই 'ফ্যারাডে সূত্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এ নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা সম্ভব। কিন্তু মঙ্কালোকবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের যেটুকু সার অংশ বিশেষ প্রয়োজন তাই নিয়েই এখানে আলোচনা করা হলো:

আগে জানা দরকার তড়িৎ অপরিবাহী এবং তড়িৎপ্রবাহী বলতে কী বলা হচ্ছে। উদাহরণসহ এর বিশ্লেষণ হবে: সকল পদার্থের মধ্য দিয়েই তড়িৎ-প্রবাহ চলাচল করতে পারে না। তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না যে-সব পদার্থ তাদের বলা হয় **তড়িৎ-অপরিবাহী** (Non-Conductor)। যথা—গ্যাস, গালা, কাঠ। আবার তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে যে-সব পদার্থ তাকে বলতে হবে **তড়িৎ পরিবাহী** (Conductor) যেমন—লোহা, তামা ইত্যাদি।

এবার শোনো, তড়িৎ পরিবহণের ক্ষমতা রাখে এমন পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (ক). পরিবহণকালে পদার্থগুলোর কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। এখানে তড়িৎ-এর কথা বলা হচ্ছে।

(খ) তড়িৎ পরিবহণকালে পদার্থগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তার মানে ধাতব পদার্থ, গ্যাস, কার্বন পরিবাহী। কেন? কারণ এদের ভেতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে দিলে এদের কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। তামা বা এ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রেও তাই। এদের এক্ষেত্রে ধরা হয় প্রথম শ্রেণীর পদার্থ। সার কথাটা হলো, ধাতব পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রণ তড়িৎ পরিবহণ করে। ওদিকে দেখো, এ্যাসিড, ক্ষার, লবণ জাতীয় জলীয়-পদার্থের

ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে দেখা যাবে, পদার্থগুলো নতুন পদার্থ উৎপন্ন করেছে। তার মানে এখানে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটছে। এদের ফেলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এ-সব পদার্থের মধ্য দিয়ে **আয়ন** তড়িৎ পরিবহণ করে। তার মানে তড়িৎ সম্পর্কিত সংজ্ঞাগুলো মন দিয়ে পড়ো। ক : **তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Electrolyte) :** যে-সব পদার্থ তরল অবস্থায় (দ্রবীভূত বা বিগলিত) তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম ও বিয়োজনকালে নতুন পদার্থে পরিবর্তিত হয় তাদেরই বলা হয় তড়িৎ বিশ্লেষ্য। যথা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সালফিউরিক এ্যাসিড, কস্টিক সোডা, দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি।

খ : **তড়িৎ অবিশ্লেষ্য (Non-electrolyte) :** তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম নয় বা তড়িৎ পরিবহণ করতে সক্ষম হলেও নিজেরা বিয়োজিত হয় না—তাদের বলা হয় তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য। পদার্থগুলোর নাম : অ্যালকোহল; তার্পিন, কেরোসিন তেল; বিশুদ্ধ জল, জলে গোলা চিনি; পারদ ইত্যাদি। গ : **তড়িৎদ্বার (Electrode) : অ্যানোড ও ক্যাথোড**—তড়িৎ-বিশ্লেষ্য তরলের মধ্যে যে দু'টি পরিবাহীর সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হয় তাদেরই তড়িৎদ্বার বলে। যে বিশ্লেষ্য তরলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হবে তাকে একটি পাত্রে রাখা হোক। এবার এই পাত্রের দুই দিকে দু'টি ধাতব [তামা, প্লাটিনাম। অথবা তড়িৎ পরিবাহী গ্যাস কার্বন-পাত ওই তরলে ডুবিয়ে রাখা হলো। যেমন ব্যাটারীর ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (−)] মেরু ওই দু'টি পাতের সঙ্গে যুক্ত করলে তরলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটতে পারে। ওই পাত দু'টিকেই কিন্তু তড়িৎদ্বার বলে চিহ্নিত করা হবে। যে পরিবাহী-পাত ব্যাটারীর ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ যে তড়িৎ যে তড়িৎদ্বারে দ্রবণে প্রবেশ করে, তাকে **অ্যানোড** (Anode) বলা হয়। আবার ব্যাটারীর ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যে যে পরিবাহী-পাত যুক্ত থাকে, তার মানে যে-তড়িৎদ্বারের মধ্য দিয়ে দ্রবণ থেকে তড়িৎ বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় **ক্যাথোড** (Cathod); ঘ : **আয়ন, ক্যাটায়ন, অ্যানায়ন :** আমরা পড়েছি : তড়িৎযুক্ত কোনো মৌল-এর পরমাণু বা যৌগমূলককে **আয়ন** (Ion) বলা হয়েছে। নানা তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের জলীয় দ্রবণে উভমুখী তড়িৎ বিয়োজনের ফলে বিপরীত তড়িৎযুক্ত আয়নকে **ক্যাটায়ন** (Cation) আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত আয়নকে বলা হয়েছে **অ্যানায়ন** (Anion)। তড়িৎ বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ যদি পাঠানো হয় তা হ'লে ক্যাটায়নগুলো 'ক্যাথোড' এবং অ্যানায়নগুলো 'অ্যানোড' মুক্ত হয়ে থাকে। পরমাণু ও যৌগমূলকের আপন আপন যোগ্যতা মতো, আয়ন

অবস্থায় তার ততো একক তড়িৎ বহন করতে পারে। পরমাণু আয়নে পরিণত হলে উভয় অবস্থাতেই তাদের ওজন একই থেকে যায়। মৌলিক পদার্থের পরমাণু আর আয়নের ধর্ম আলাদা আলাদা হয়। ৬: কুলম্ব (columb): তড়িতের পরিমাণের একক হলো কুলম্ব। এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহ এক সেকেণ্ড সময় ধরে চালনা করলে যে-তড়িৎ প্রবাহিত হয় তাকে কুলম্ব বলে। এই পরিমাণ তড়িৎ সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে পাঠালে তড়িৎদ্বারে তা •'•• ১১১৮ গ্রাম সিলভার উৎপন্ন করবে।

তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (Electromagnetic wave)

মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে তড়িৎ-চৌম্বক-তরঙ্গ বিষয়ক কিছু জ্ঞানগম্যি রাখতে হবে কারণ আলোর কাজ করতে গেলে এক সময় এই সূত্রটি কাজে লাগবে এবং আলোক-শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি উদ্ভাবনী শক্তিতে আনবে নতুন প্রাণ। জেনে রাখতে হবে, আলোর ফোটনগুলো একটা তড়িৎ ক্ষেত্র এবং এক চৌম্বক ক্ষেত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এ-কারণেই আলোকে তড়িৎ-চৌম্বক-বিচ্ছুরিত-রশ্মি (Electromagnetic radiation) বা তড়িৎ-চৌম্বক-তরঙ্গ (Electromagnative wave) বলে। বলা হয়েছে, তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্র সব সময়েই পরস্পরের সমকোণে থাকে এবং তরঙ্গের গতি যেদিকে সেদিকেই থাকে অবস্থিত। আরও বলা হয়েছে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে কোনো বিন্দুতে এই দুই ক্ষেত্রের বিস্তৃতি সমানুপাতিক। উদাহরণ: তড়িৎক্ষেত্র যখনই তার সর্বোচ্চ তরঙ্গ বিস্তৃতিতে পৌঁছে যায়, চৌম্বক ক্ষেত্রও তখনই তার সর্বোচ্চ তরঙ্গ বিস্তৃতিতেই পৌঁছে যাবেই। এই দুই ক্ষেত্রের বিস্তৃতিই আলোর তীব্রতা তথা ঔজ্জ্বল্য (intensity/brightness) নির্ধারণ করে থাকে। ক্ষেত্রের বিস্তৃতি যতো বেশি হবে, আলোর ঔজ্জ্বল্যও ততোই বাড়বে।

অনেক ধরনের তরঙ্গ প্রবাহের জন্য বস্তুকে পূর্ণ হতে হয়। যেমন ধরো, জলাশয়ের ঢেউ জলের ওপরেই প্রবাহিত হয়, কিন্তু তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ শূন্যে বাধাহীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। সুতরাং সহজেই ভেবে নেওয়া সম্ভব যে, শূন্যে আলো চলাচল করে কণাসমূহের প্রবাহের মতো এবং তা তরঙ্গসমূহের চাইতেও দ্রুত গতিসম্পন্ন।

আলো ছাড়াও অনেক রকমের তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ রয়েছে। আলোর সঙ্গে এই অন্যান্য তড়িৎ চৌম্বক-এর পার্থক্য নিহিত থাকে তাদের কম্পাঙ্কে ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। কিছু তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, যেমন অনুতরঙ্গ (Microwaves), বেতার তরঙ্গ (Radio waves)—এরা আলোর চাইতে অল্প কম্পাঙ্কের এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের

দিক থেকেও দীর্ঘ হয়ে থাকে। অন্যান্যদের মধ্যে গামা রশ্মি বা রঞ্জনরশ্মি পেয়ে থাকে সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক এবং খাটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তড়িৎ চৌম্বকের ক্রমিক তালিকা রচিত হয় তাদের কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী—যাকে বলা হয় **তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী** (Electromagnetic Spectrum), এই বর্ণালী তার একটি বা ফালি থেকে উভয় দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একেই বলা হয় **দৃশ্যমান আলো।** সমগ্র তড়িৎ-চৌম্বক বর্ণালী ছোট গামারশ্মি থেকে বিস্তার লাভ করে—যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $\frac{১}{২,৫০০,০০০,০০০,০০০}$ ইঞ্চি (০·০০০০০০০০০০১ মিলিমিটার)। দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ—যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মাপ কয়েক মাইল বা কিলোমিটার অথবা তার চেয়েও কম।

দৃশ্যমান বর্ণালী :

দৃশ্যমান বর্ণালী তৈরি হয়ে থাকে অনেকগুলো তড়িৎ-চৌম্বক দিয়ে যা চোখে দেখতে পাওয়া যায়। এই তরঙ্গ রঙিন পটির মতন দেখতে। কারণ বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হয়। লাল থেকে এই বর্ণের সারি কমলা, হলদে, সবুজ, নীল, ঘন নীল এবং বেগনী পর্যন্ত হয়ে থাকে। সূর্যালোকের মধ্যে লুকানো থাকে সবরকম দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে যখন সূর্যালোক অতিক্রম করে তখন আলোকদৈর্ঘ্য বিস্তৃত হয় এবং বর্ণালী রচনা করে। একে বলা হয় **অবিরত বর্ণালী** (Continuous Spectrum)। কারণ এর মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না বা কোন বর্ণই হারিয়ে যায়-না।

কিছু উৎস থেকে বিচ্ছুরিত বা উৎপাদিত আলোতে অবিরত বর্ণালীর সব ক-টি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নাও থাকতে পারে। উৎস থেকে বিনির্গত বর্ণালীতে কালো ফাঁক থেকেই যায়। যে কোনো উৎস থেকে বর্ণালী বিচার করলে উৎস সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হয়। ওই জানাকেই বলে **বর্ণালী বিশ্লেষণ** (Spectrum analysis). বিজ্ঞানীরা রঙকে **বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র** (Spectroscope) দিয়ে বিশ্লেষণ করেন। এর সাহায্যে আলো পাঠানো হয় সরু ফালি (Slit) দিয়ে। আর এতেই দেখতে পাওয়া যায় বর্ণালীর বিভিন্ন রঙ।

আলোর উৎস সম্পর্কিত সব খবরই দিতে পারে বর্ণালী বিশ্লেষণ। কারণ আসল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই সক্রিয়-অণু-ফোটন ত্যাগ করে। একটি ফোটন-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ফোটন থেকে উৎপন্ন এক ধরনের অণুর ওপর নির্ভর করে এবং

কীভাবে ইলেকট্রনের শক্তিতলে বিরাট পরিবর্তন আসে তাও ফোটন-এরই দান। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে উৎস থেকে আসা আলো সারিবদ্ধ বর্ণরেখা উৎপন্ন করে থাকে। এই যন্ত্রের মধ্যেকার সরু ফালি থেকে জন্ম নেয় সব বর্ণরেখা। প্রত্যেক উপাদানই রেখা পদ্ধতি উৎপন্ন করে—যা অন্যান্য উপাদান দিয়ে গঠিত রেখা পদ্ধতি থেকে আলাদা। এই সব রেখা পদ্ধতিই বিজ্ঞানীদের বলে দেয় 'আলোর উৎস-এর মধ্যে পরমাণু'—এ-কথার অর্থ। আরও বলে দেয়, কতো তাদের শক্তিতল।

গ্যাসজাত পরমাণুগুলো পরিষ্কার বর্ণরেখা বানায়। কিন্তু পরমাণুগুলো কঠিন ও তরল বস্তুর ক্ষেত্রে যেখানেই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ—সেখানেই রেখা অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য আকার নিতে বাধ্য। মাঝে মাঝে অণুও আলো নিঃসৃত করে। একটিমাত্র পরমাণুর চাইতে অণুর শক্তিতল (Energy level) অনেক বেশি এবং পরমাণুর তুলনায় এর তলগুলো অনেক বেশি ঘনিষ্ঠও। এর ফলে বর্ণালীবীক্ষণের পরিষ্কার আলোর রেখার তুলনায় অণুজাত আলো উৎপন্ন করে থাকে চওড়া বিস্তার আকারের আলো।

মঞ্চালোকবিজ্ঞান

৫.

মঞ্চালোকবিজ্ঞানের প্রথম ধাপ : মঞ্চালোক রচনা কি বিজ্ঞান? মঞ্চে আলোর আল্পনা অঙ্কন ও দ্যুতিদান, ডাইমেনশন, আলোক নির্দেশনা-জনিত চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা, মঞ্চ ও পরিবেশ, পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, তরলায়িতকরণ, রীতিপদ্ধতি।

মঞ্চের দীপ্তিচিত্রণকে একদা বলা হতো, এ কাজটি নাকি পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। ফ্রাঁসিস রীডও একসময় বলেছিলেন : 'একে ঠিক বিজ্ঞান বলে গণ্য করা হবে না কিন্তু এ-কথা সত্য, প্রদর্শনকলা সমৃদ্ধকরণের ব্যাপারে এই কারিগরী কলাকৌশলের প্রয়োজনীয়তাকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না।' এ-ধরনের মন্তব্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী থিয়েটারের জগতে কম ঝড় বয়ে যায়নি। যেখানে বিজ্ঞান নেই সেখানে কি শিল্পের অস্তিত্ব থাকে? একজন চিত্রকর ছবি আঁকেন নানা ধরনের তুলি, কলম, পেন্সিল এমন কি কাঠকয়লা পর্যন্ত দিয়ে। নানা বর্ণের রঙ হচ্ছে তার বাস্তব ও প্রতীকী চিন্তার অবদান। প্রয়োজন, পরিবেশ, সময় বুঝে তাঁর অঙ্কন। আঁকা হয়ে গেলে তা সৃষ্টি! ঠিক তেমনি লেখক, কবি, নাট্যকার তার গল্প, উপন্যাস; কাব্য; নাটক রচনা করেন কাগজ, কলম আর কালিতে—রঙটা কোথায়? তার মনে। আঁকা শেষ হওয়া এবং লেখা সমাপ্ত হবার আগে পর্যন্ত তা বিজ্ঞান। পরে কলা। এই সূত্র ধরেই অভিযোগকারীরা বলেছেন, মঞ্চালোকবিজ্ঞানীরা আসলে বিজ্ঞানী, পরে কলার স্রষ্টা। সুতরাং তাকে এ-কাজে নামতে হলে, জানতে হবে আলোকবিজ্ঞানের অ আ ক খ। নইলে তার উদ্ভাবনী শক্তি একটি বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাবে। কেবল ধরাবাঁধা পথ ধরে গুটিকয় আলোর যন্ত্রপাতি নিয়ে তার নাড়াচাড়াই হবে সার। সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করবে না, সৃষ্টির মর্যাদা পাবে না তার কাজ। উদ্ভাবনী চিন্তার প্রসারলাভও ঘটবে না। কেন? কারণ সেতো আসল আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে একবারেই অজ্ঞ। এই সূত্রে যাঁরা বলেছেন, মঞ্চালোকিতকরণ আসলে বিজ্ঞান নয়, আজ প্রমাণিত হয়েছে তাঁরাও আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে অনওয়াকিবহাল নিশ্চয়। না হ'লে এমন উক্তি করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। ফ্রেডরিখ বেন্থাম বলেছেন, '…The scene designer who does his own lighting is indeed a happy man, especially if to complete it he does the costumes as well. Why, them, do so few undertake

this work? The answer seems to be that they are scared of the disciplines imposed by electricity, optics and illumination, yet the specialist lighting designers are seldom themselves engineers, illuminating or electrical. Lighting in an art.

Whoever is designing the lighting, he or she is responsible to the producer alone. While the openions of the ballet mistress, the scene disigner, the member of the cast, the friend of the backer, the theatre owner, and perhaps even the architect, who may not like the way those ugly blue spotlights are disfiguring his new theatre, may have to be endured : They can and must be ignored." ডোনাল্ড ওয়েনস্লেজার, ইয়েল স্কুল অফ ড্রামার শিক্ষক ও খ্যাতনামা মঞ্চালোকবিজ্ঞানী তাঁর 'লেট দেয়ার বি লাইট' প্রবন্ধে লিখলেন, "সাহসের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে শিল্পীর, স্থপতির, কবির কল্পনাকে কাজে লাগানো হলো—যেমন করে তুলি বা ছেনির ব্যবহার হয়, তেমনি করেই মঞ্চালোকবিজ্ঞানী আলোর মাধ্যমে গতির সৃষ্টি করবে। আলোর আল্পনায় তৈরি হবে নতুন নতুন কারুকর্ম।…আর এরাই নব নব সাজে—রঙে ঢঙে মঞ্চকে তৈরি করবে মায়ার জগৎ, বাস্তবতীর্ণও।"

আসলে মঞ্চে আলোকচিত্রণের কাজটুকু ছিলো সীমাবদ্ধ। সাধারণভাবে মঞ্চালোকিতকরণের কাজটুকু দায়সারা ভাবে সেরে নেবার পর কেবলমাত্র বিখ্যাত অভিনয়শিল্পীদের অভিনয় চাতুর্যের সঙ্গে দর্শকদৃষ্টির একটা যোগাযোগ রচনা করাই ছিলো সেদিনের মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাজ। তখন অবশ্য আলোকবিজ্ঞানীকে বলা হতো আলোকসম্পাতকারী। কোথায়? না মঞ্চে। ব্যাস। তারপর দিনেদিনে বয়ে গেছে, যাচ্ছেও অনেক সময়ের স্রোত। সভ্যতা এগোচ্ছে। বিজ্ঞান নতুন নতুন অভাবিত আবিষ্কারে তামাম বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। থিয়েটার, Performing art এর নানা অঙ্গের বিস্ময়কর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে মঞ্চালোকবিজ্ঞানও নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে নাট্যকে করেছে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এখন আর প্রধান দু'একজন অভিনয়শিল্পীই মঞ্চালোক-চিত্রণের শেষ কথা নয়। আলোক-শিল্প সৃষ্টির গুরুদায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। এখন মঞ্চের প্রতিটি শিল্পীই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ-ছাড়া হাজারো রকমের দায়িত্ব চেপে গেছে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর ওপর।

তাহ'লে সার কথাটা কী? টোট্যাল প্রোডাকশনের অর্থাৎ সামগ্রিক প্রযোজনায়

মঞ্চালোকবিজ্ঞান / পর্ব ২

সরঞ্জামচিত্র

মঞ্চালোক রচনার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আধুনিক ল্যাম্প, ল্যানটার্ন, কনসোল, কী-বোর্ড প্রভৃতি
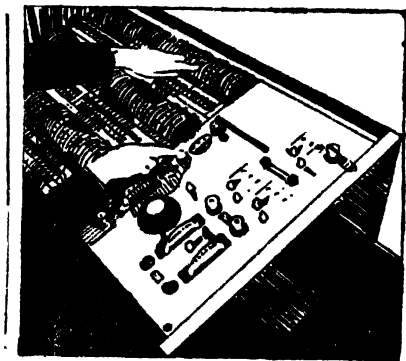
আসল আই ডি এম কনসোল
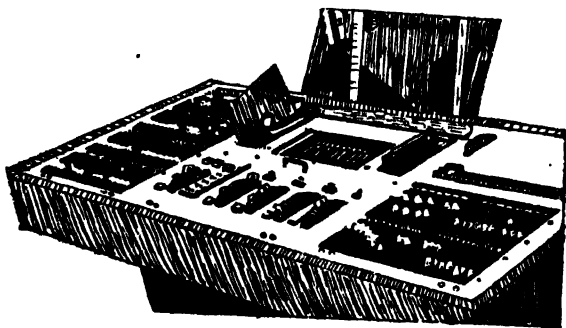
থর্ন কিউ মাষ্টার ২০০০
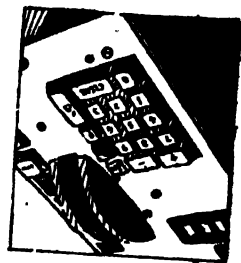
এম এম এস পদ্ধতি—কী-বোর্ড ও চ্যানেলের হুইল নির্বাচন
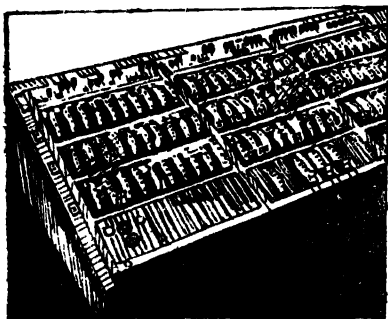
সাধারণ সুইচসহ ৩ প্রিসেট কন্ট্রোল
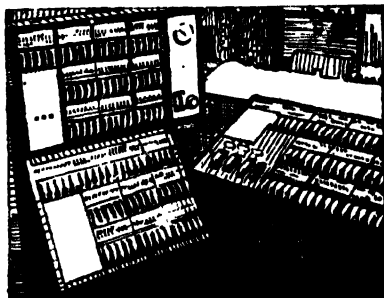
১০০ চ্যানেল 'থ্রিসেট' কন্ট্রোল স্বতন্ত্র সুইচসহ

ফ্লাড-লাইট
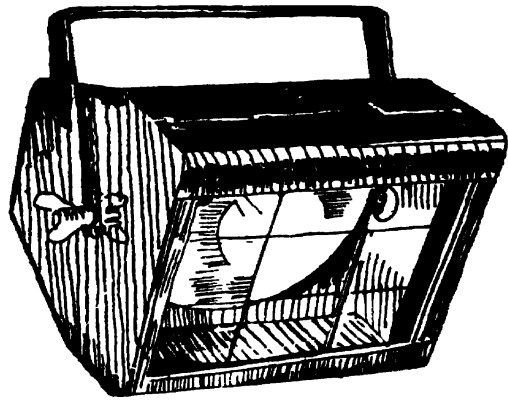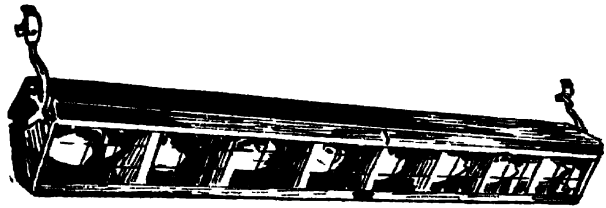
ব্যাটেন লাইট
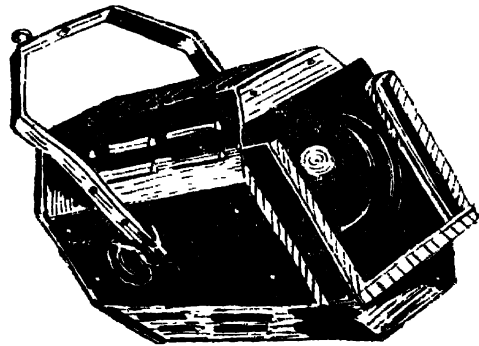
অতীতের সাধারণ ফোকাস-স্পট
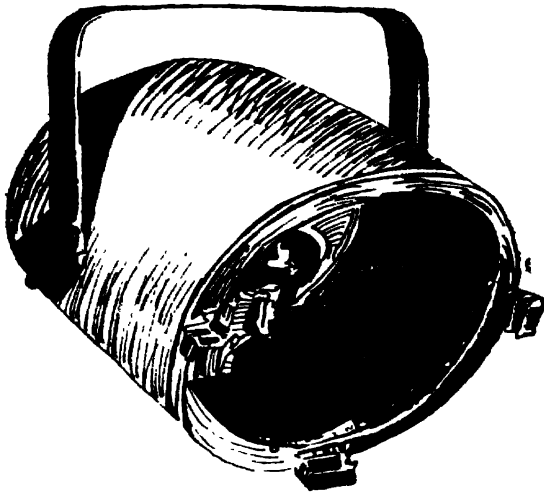
প্যাটার্ন ৭৫০ টাংস্টেন হ্যালোজেন বীমলাইট।
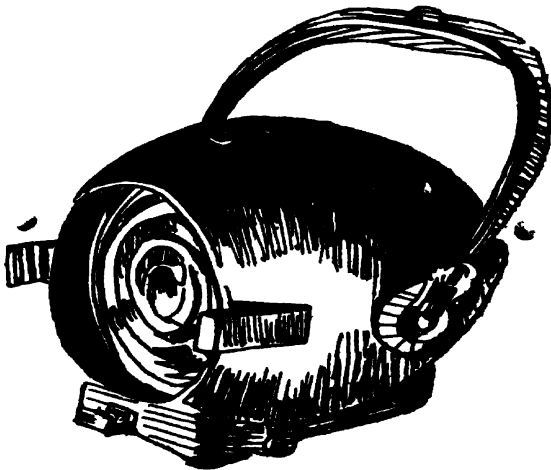
প্যাটার্ন ১২৩ ফ্রেসনেল স্পট

বার্নডুর লাগানো প্যাটার্ন ১২৩
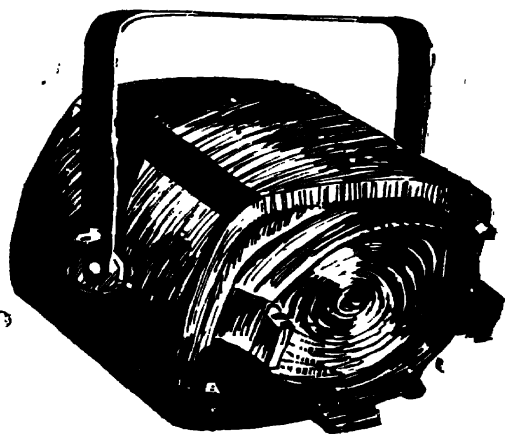
প্যাটার্ন ২২৩ ফ্রেস্‌নেল স্পট-লাইট
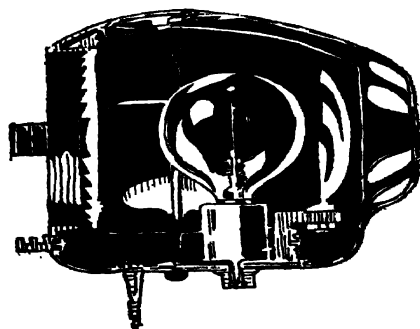
দ্বিখণ্ডিত প্যাটার্ন ১২৩ ফ্রেসনেল স্পট-লাইটের ভেতরের চিত্র
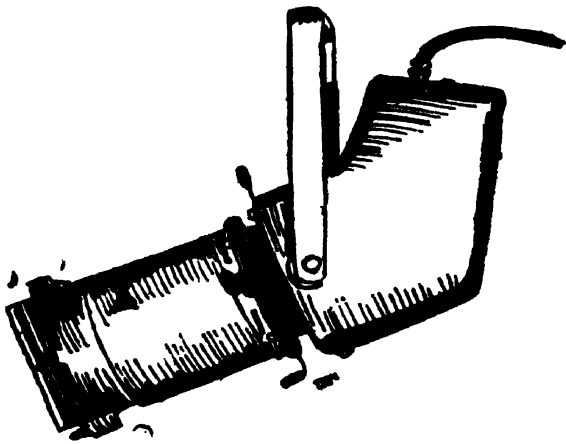
প্যাটার্ন ২৭৪ বাইফোকাল প্রোফাইল স্পট-লাইট
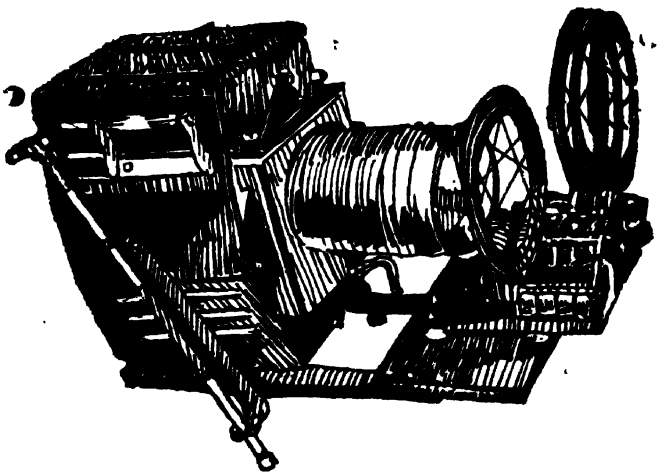
সিমাফোর টাইপ রিমোট কালার চেঞ্জারসহ মিরর স্পট-লাইট
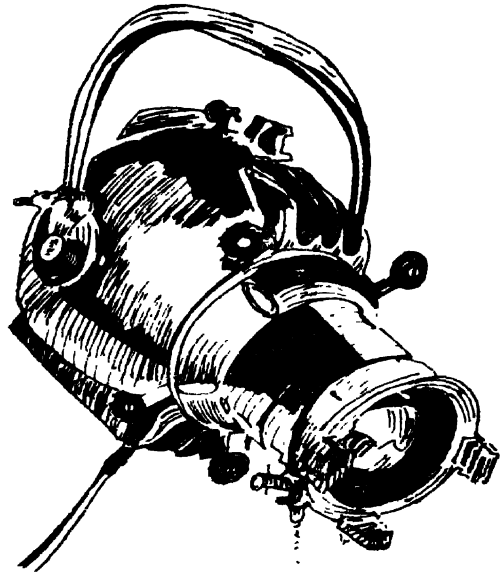
প্যাটার্ন ২৩ প্রোফাইল স্পট-লাইট
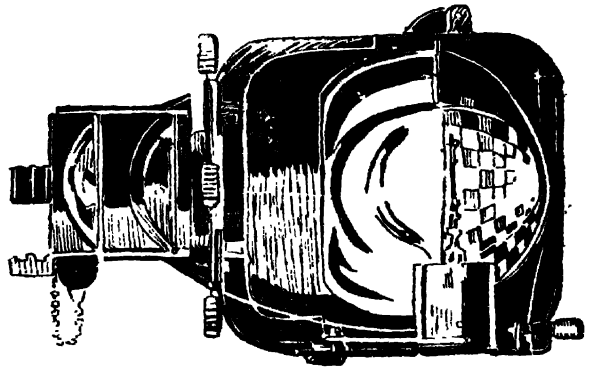
দ্বিখণ্ডিত প্যাটার্ন ২৩ প্রোফাইল স্পট-লাইটের ভেতরের চিত্র
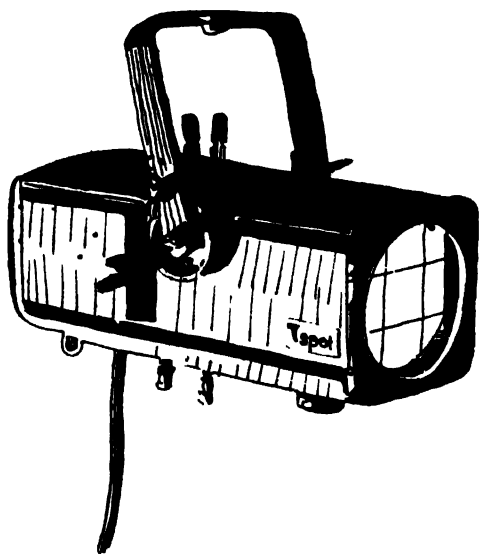
টি ৬৪ বাইফোকাল টাংস্টেন হ্যালোজেন প্রোফাইল স্পট

স্পিল রিংসহ প্যাজ্‌ন্ট্‌ ল্যানটার্ন

মুভিং এফেক্টসহ প্যাটার্ন ৩৫১

১০০০ ওয়াট সিসিটি সিলিউট স্পট
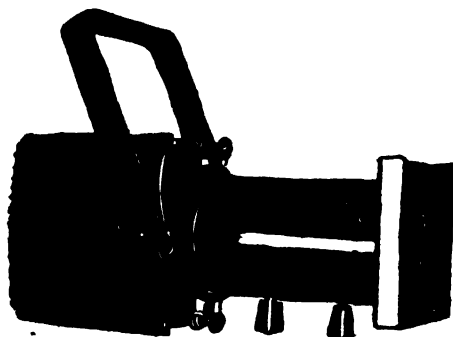
জুম লেন্সসহ সিলিউট টাংস্টেন প্রোফাইল-স্পট

সম্মুখ থেকে ফেলা আলো

ভারসাম্যমূলক আলোর কাজ

ওপর থেকে ফেলা আলো
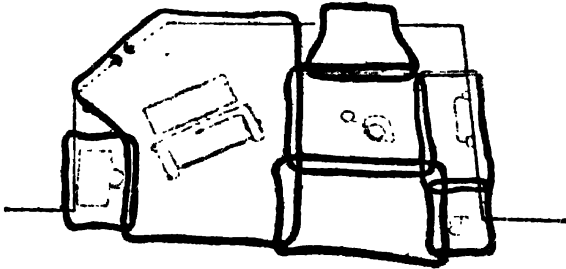
ফার্নিচার প্লটসহ প্রোডাকসন এরিয়া চিহ্নিতকরণ

প্রতিটি ক্ষণের সঙ্গে দর্শকদের দৃষ্টি, মানসতা, উপলব্ধির একটি অনুস্যূত বন্ধন রচনা করার দায়িত্ব মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর। এই যে বন্ধন রচনার ব্যাপারটা তা যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত, নাট্যের নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পথ ধরে কাজ করতে করতে প্রগাঢ় অনুভূতি ও উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে থাকবে দর্শকদের। আলোর কাজের বিন্দুতম দুর্বলতা, জড়তা, অস্পষ্টতা এবং ক্ষণিকের ভুল সমগ্র প্রয়োজনাকেই অসাফল্যের গহীন গহ্বরে ডুবিয়ে মারতে পারে। এই কাজে কেবল যন্ত্রপাতিগুলোই যে মুখ্যত কাজ করে তা নয়, আরও কিছু সাজসরঞ্জাম—যা আজকের অথবা মাত্র কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত, সে-গুলোরও সৃষ্টিশীল কাজের বিভিন্ন উপাদান। আসলে সমগ্র নাট্যকে বক্তব্যের শেষ সীমায়, উত্তরণে, শোভনতায় পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে মঞ্চালোক চিত্রণের প্রধান কাজ। উদ্দেশ্য বলছি না, কারণ তার ব্যাপ্তি অনেক বিশাল। এ-গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ-তক লেখা প্রত্যেকটি অধ্যায়ের, পরিচ্ছেদের লাইনের মধ্যে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করতে হবে—তা নইলে এ-গ্রন্থ প্রণয়নের কোনো প্রয়োজনই থাকে না।

আলোর আল্পনা রচনা ও দ্যুতিদান: অভিনয়শিল্পীদে[illegible] বিচলন, অবস্থান, সংলাপ আদান-প্রদানের পরিস্থিতি ও অর্থসহ চরিত্রদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী মঞ্চের আলোকে কাজ করে যেতে হবে। কোথায় এমফ্যাসিস পড়বে এবং সেই এমফ্যাসিস অনুযায়ী রঙের নির্বাচন ছাড়াও এই আলো সময়কে চিহ্নিত করবে, বলে দেবে পরিবেশ এবং সিচ্যুয়েশন; দ্যুতিময় করে তুলবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কারুকৃতি, অভিব্যক্তি ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, মঞ্চে ব্যবহৃত দৃশ্যপট, ফার্ণিচার-প্রপিং থেকে শুরু করে সবকিছুর মধ্যে একটা বিদ্যমান সম্পর্ক ও তা ব্যবহারের পেছনে যুক্তি রয়েছে। সব থেকে বেশি সম্পর্ক রয়েছে সংগীতের সঙ্গে আলোর; সংগীত হচ্ছে নাট্যশরীরের শিরায় শিরায় বয়ে যাওয়া রক্ত আর আলো হচ্ছে সেই অবয়বের চক্ষু তথা দৃষ্টিদান।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে: মঞ্চে ব্যবহৃত আলোর দ্যুতি তথা ঔজ্জ্বল্য কতোটা হবে? আসলে বিষয়টিকে যতোখানি গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাববে শিক্ষার্থীরা, ঠিক ততোখানি গুরুত্ব দেবার কোনো কারণ দেখি না—কারণ মঞ্চালোকবিজ্ঞানের সকল দিক, তার অন্ধিসন্ধি, রহস্য, ব্যবহারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই এ-গ্রন্থের প্রণয়ন। আসলে মঞ্চের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন আলোর পরিমাপটি কী হবে। মঞ্চ আসলে ক্ষেত্র। কিন্তু নাট্য? নাট্য একাধিক মুহূর্তের সংমিশ্রণ, অনেকগুলো নাট্যক্ষণের যোগফল। তার বিষয়বস্তু, পরিবেশন বৈশিষ্ট্য, বক্তব্য গতি, আধারিত—সব কিছুকে পরিবেশনযোগ্য করে তোলার জন্য একটি সুচিন্তিত

পরিকল্পনা। এর অনেকগুলো[illegible]। প্রত্যেকটি অঙ্ককে একটি মূল ছন্দ মেনে কাজ করে যেতে হয়। কাজেই নাট্য বিনা কী করে বলা সম্ভব মঞ্চে আলোর দ্যুতিমান কতোটা হবে?

একদা বলা হয়েছিলো, যদি কখনও আলোক-পরিমাপক যন্ত্র (Photometric mesuerment machine) আবিষ্কৃত হয়, তখনই হয়তো বেজে উঠবে ঐতিহ্যের মৃত্যুঘণ্টা। যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হবার পরও কিন্তু ঐতিহ্যের মৃত্যু হয় নি। আর পরিমাপ? মানে আলোর পরিমাপ? উপরোক্ত যন্ত্র আবিষ্কারের আগেও তো মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর হাতে অবশ্যই থাকতো বোধের পরিমাপক-যন্ত্র। কারণ পরিমিতিবোধ যদি না থাকে আলোকবিজ্ঞানীর, তবে শিল্পসৃষ্টিতে সহায়তা করা কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব হতো না।

মঞ্চগৃহের আকার, আসল মঞ্চের ওপেনিং, ডেপ্‌থ, উচ্চতাসম্পন্ন মঞ্চের মাপ কিন্তু মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব মঞ্চের মাপ সমান হয় না। কোথাও দেখা যাচ্ছে ওপেনিং রয়েছে ৩৫ ফুট কিন্তু ডেপথ ১৭ ফুটের ওপর পাওয়া যাচ্ছে না। আবার এমন মঞ্চেরও অভাব নেই ডেপথ-এর চাইতে ওপেনিং কম। আলোক-বিজ্ঞানীকে তখন হিসেবে চলতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে কীভাবে তিনি মঞ্চের মাপ অনুযায়ী তার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সাজাবেন বা বসাবেন। অনেক সময় এমন হয়ে থাকে খুব বড় মঞ্চে তিনি একটি নাট্যের কাজ করেছেন। এবার আমন্ত্রিত অভিনয়ের ক্ষেত্রে গিয়ে দেখলেন যে পরিকল্পনা-মাফিক যে বড়ো মঞ্চে তিনি কাজ করেছিলেন এ-মঞ্চটি তার চাইতে সকল দিক থেকে ছোট তো বটেই, তা ছাড়াও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে ওপেনিং-এর মাপ অনুযায়ী ডেপথ-এর অভাব। এই রকম এ্যাবনরমাল ক্ষেত্রে আলোর আল্পনা রচনাতে যাতে কোনো খুঁত না থাকে সেজন্য একবারে গোটা ব্যাপারটাকেই নতুন করে ভাবতে হবে। তখন আলোকবিজ্ঞানীর কাজ হবে নির্দেশক-এর সঙ্গে আলোচনায় বসা। মঞ্চের এই এ্যাবনরমালিটিকে আয়ত্তে আনা যেতে পারে মঞ্চস্থাপত্য রচনা বা দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনার হেরফের করে। আবহরচক-এর সঙ্গেও আলোচনার প্রয়োজন। কারণ তার যন্ত্রগুলি এই ছোট বিশ্রী ধরনের মঞ্চে সুর ধ্বনি ইত্যাদি কীভাবে ব্যবহার করবে।

সমস্যা আরও থাকে। সেটা হচ্ছে অডিটোরিয়াম সংক্রান্ত। মঞ্চের তুলনায় অডিটোরিয়াম হতে পারে অভাবিত দীর্ঘ মাপের। তাতে প্রস্থের চাইতে দৈর্ঘ্য অস্বাভাবিক বড়ও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, বিরাট ওপেনিং সম্পন্ন প্রসেনিয়াম মঞ্চের সম্মুখে যে অডিটোরিয়াম—সেখানে দর্শক আসন-সংখ্যা

মাত্রাতিরিক্ত কম। প্রেক্ষাগৃহের দৈর্ঘ্যের চাইতে প্রস্থ বড়ো। কলাত সমস্যা দেখা দিতে বাধা। সুতরাং পরিস্থিতি পরিবেশানুগ মঞ্চালোক ব্যবহারের নতুন চিন্তায় মঞ্চালোকবিজ্ঞানী অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু আসলে বিভ্রান্ত হবার কোনো কারণই নেই—সামগ্রিক প্রযোজনার নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি খসড়া পেলেই তার পক্ষে অনায়াসে সবগুলো কাজ দ্রুত করা সম্ভব। আসল সত্যটা হলো: দর্শকদের জন্যই নাট্য। সুতরাং প্রত্যেকটি দর্শক কোনোরকম বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে প্রযোজনার অব্যাহত ধারাটি দেখতে চান। এবং সেটা পরিবেশন করাই প্রয়োগের প্রধান লক্ষ্য।

আরও নানা ধরনের সমস্যা থাকে। দর্শকদের গ্রহণ ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি সমান—এমন কথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারেন না। সুতরাং এ-সব ভেবে চলমান দৃশ্যগুলির আলোর ঔজ্জ্বল্য কী ভাবে ব্যবহার করা উচিত সেটা কিন্তু নির্ভর করবে মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর ওপর। আমরা জানি, মানুষের চোখের 'মণি' বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তার চারদিকে থাকে একটি রঙিন ঘের। ইংরেজীতে একে বলা হয়েছে Iris। বাংলায় 'কণীনিকা।' এই কণীনিকার সাহায্যেই দর্শক আলোকরশ্মির সঙ্গে নিজের দৃষ্টিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। দৃষ্টির যে সংবেদনশীলতা, তাও কিন্তু থাকে এখানেই। এ সম্পর্কিত বিশদ: "At the very front of the eye, the middle layer becomes the Irisis, a thin curtains of tissue in front of the lens. Light passes through the *pupil*, a round hole in the iris. The pupil looks like a black circle. Two sets of muscles in the 'iris' change the size of the pupil. This controls the amount of light that enters the eye. When examining the inside of the eye, doctors sometimes use drugs to dilate, or enlarge the pupil. The amount and location of pigment in the iris determine whether the eye looks blue, green, gray or brown ·." কিন্তু একটা বাধা থেকেই যায় যে, এক পরিমাণ আলো থেকে আচমকা অন্য এক পরিমাণের আলোতে দৃষ্টিকে খাপ খাইয়ে নিতে দর্শকদের একটু সময় নেয়। এই সময়টা হয়তো সংক্ষিপ্ত তবু সময় তো? নাট্য শুরু হবার আগে তাই প্রেক্ষাগৃহে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো থাকে, যা দৃষ্টিকে শান্ত রাখে। তারপর অডিটোরিয়াম অন্ধকার। যবনিকার ধীর উত্তোলন বা সরে যাওয়া। এবার অন্ধকার মঞ্চে আলোকরশ্মির কাজ। আলোকবিজ্ঞানীকে ভাবতে হবে, দর্শকের এই দৃষ্টিশক্তির

ক্ষমতার পর্যায়গুলোও। আর যেখানে যবনিকার বালাই নেই, সেখানে সবকিছুই স্বচ্ছন্দ হতে পারে। এই স্বাচ্ছন্দ্যতা আনার বিষয়টির কথাও কিন্তু ভাবতে হবে আলোকবিজ্ঞানীকেই—কারণ সব নির্দেশক দৃষ্টিবিজ্ঞান সম্পর্কে সমান ওয়াকিবহাল হবেন, এটা ভাবাই কঠিন। এবং অন্যায়ও বোধ হয়।

কোন দৃশ্যে আলোর পরিমাণ ও পরিমাপ কেমন হওয়া উচিত তা নির্ভর করে আগের দৃশ্যের আলোক দ্যুতি ব্যবহারের ক্রম অনুসারে। ধরো, আগের দৃশ্যটি অনুজ্জ্বল আলোর কাজের আল্পনায় সমৃদ্ধ। সময়টা যদি রাত্রি হয়, আস্তে আস্তে অনুজ্জ্বলতার ঘনত্ব বাড়ানো যেতে পারে। তারপর নিভে গেলো আলো। আর নিমেষের মধ্যে যদি গ্রীষ্মের নির্মেঘ আকাশের প্রখর সূর্যালোকে আসতে হয়—তবে দর্শকদৃষ্টির ওপর অত্যাচার করা হবে। সকাল, দুপুর, গোধূলি, সন্ধ্যার পর রাত্রি যেমন নিয়মের পথ ধরে আসে একের পর এক, পর্যায়ক্রমে, তেমনি রাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত যে-সময় তারও তো পর্যায় রয়েছে। মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে কখনও ভুলে গেলে চলবে না এই সত্যটি। ভুললে দর্শক-দৃষ্টি ও নাট্যদৃশ্যের মধ্যে যোগসূত্রতা হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। দর্শক তখন তন্ময়তার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ এমন মারাত্মক যে টোট্যাল থিয়েটাকে তা অগাধ জলে ডুবিয়ে মারতে পারে। সুতরাং ভারসাম্য রক্ষার কথাটা আগাগোড়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—সেটা যেমন প্রযোজনার ক্ষেত্রে, তেমনি দর্শকদের কাছেও। মহলার সময়ে এটা ঠিক করে না নিলে কিন্তু বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

ওপরে যেটুকু বলেছি তা কিন্তু মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাছে প্রথম পাঠের মতন। এরপর পর্যায়ক্রমে এ-গ্রন্থের বিষয় ও পরিচ্ছেদগুলো এগোবে। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর চোখ, মন উপলব্ধির দুয়ার খুলে যাবে।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ : আয়তন, (Dimension)

প্রথাগত তথা কেবল সম্মুখভাগ সমন্বিত মঞ্চে (প্রসেনিয়াম)—যেখানে দর্শক সম্মুখস্থ ছবির ফ্রেমের মতন মঞ্চের দিকে মুখ করে বসে নাট্য উপভোগ করেন, সেখানে নাটকের পাত্রপাত্রীরা মিলে যে-চিত্র আঁকেন, বা আঁকানো হয়ে থাকে, তাতে বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় দু'টি : এক : উচ্চতা, দুই : প্রস্থ। তৃতীয় দিকটির গভীরতা থাকলেও তা তেমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না সর্বত্র। অডিটোরিয়াম যতোই বৃহৎ হোক, দর্শক যতো পেছনেই বসুক—এ-ধরনের প্রচলিত গভীরতাবিহীন নাট্যচিত্রই দর্শকদের সামনে পরিবেশিত হয়ে আসছে। বোধ হয় এ-কারণেই বিকল্প ও অধিকতর

মাত্রাসম্পন্ন থিয়েটার প্রোডাকসনের দাবির প্রবণতা ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠেছিলো। তাই অন্যচিন্তা, ভিন্ন তরঙ্গের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠতেও দেখা গিয়েছে। এবং এরই ফল স্বরূপ এরিনা। ডাইমেনশনের হুবহু বাংলা পরিভাষা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। করা যায়ও না। এ-জন্য এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃতি হিসেবে দেওয়া হলো:…"Dimensional analysis is often the basis of scientific or mathematical models or situation. If models results are to be translable in terms of the system being modelled then the model must be dimensionally faithful to the original." থিয়েটার, ওপেন-এয়ার থিয়েটার, ওয়ানওয়াল থিয়েটার, থিয়েটার ইন দি রাউণ্ডের প্রবর্তন এবং অতি সহজেই প্রসেনিয়াম ছাড়িয়ে তার জনপ্রিয়তা আজ আকাশমার্গী।

নাট্য-নির্দেশক, মঞ্চস্থাপত্য পরিকল্পক, আবহভাগ পরিচালক এবং অভিনয়শিল্পীরা তাই থার্ড ডাইমেনশনের কথা ভেবে মঞ্চে নানারকম কৌশলাদি যুক্ত করার কথা ভাবেন, এবং এই সমবেত প্রয়াসে তা যে অচ্ছুৎ হয়ে থাকে তাও বলা যাবে না। নির্দেশকের পরামর্শ নিয়ে নাট্যের দৃশ্যগুলির আকর্ষকতা বাড়াবার জন্য বিভিন্ন কলা এবং কৌশল যুক্ত হলো, দৃশ্যকে সুশোভিত করা হলো গভীর চিন্তার ফসল হিসেবে। এলো বুদ্ধিদীপ্ত কিছু মুহূর্ত—নির্দেশক তখন ভাবলেন কম্পোজিশান, পিকচারাইজেশনের কথাও। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সেখানেও কোনো ফাঁক নেই। কিন্তু মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর আলোর আল্পনা এতো সব করার পরেও, ইচ্ছে করলেই সবকিছু জলে ডুবিয়ে মারতে পারে। ইচ্ছে করে আলোকরশ্মির প্রয়োগের একটু হেরফের করলেই গোটা নাট্যপ্রয়াস তথা প্রযোজনার নাভিশ্বাস উঠতে পারে। তার মানে নাট্য এমন একটি শিল্প যার প্রত্যেকটি অঙ্গের ক্ষেত্রেই সমানভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যেতে হবে—যাতে সৌন্দর্যের গতিটা ঘড়ির কাঁটার মতন এগোয়।

মঞ্চে যদি ফ্ল্যাট-লাইট অর্থাৎ সাদাসিধে আলো ব্যবহৃত হয় তা হ'লে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পাত্রপাত্রীদের দেহের নানা অংশ সমানভাবে পরিদৃশ্যমান হতে পারছে না। তার মানে দর্শক দেখতে পারছেন না এমন সব ভাঁজ শরীরের মধ্যেই অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে। কিন্তু যদি কোণাকুনি আলো এবং বিভিন্ন কোণ থেকে নানা আলোর উৎস এসে ছায়াকে উধাও করে দিতে পারে, তা হ'লে অভিনয়শিল্পীদের গোটা দেহের সকল কাজকেই তাঁরা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এমন কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি পর্যন্ত। তার মানে উচ্চতা, প্রস্থ এবং গভীরতা (ডেপথ) সমানভাবে দর্শকের সামনে দৃষ্টিনন্দন করে তোলা যাবে। মঞ্চালোক ইচ্ছে করলে মানুষকে (অভিনয়শিল্পীকে) পুতুলেও পরিণত করতে পারে।

ফ্ল্যাট-লাইট বা সম্মুখভাগ থেকে ফেলা আলো দৃশ্যগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে অক্ষম। সুতরাং বাস্তব নাট্যে এর ভূমিকা শূন্য বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু যখন সুপরিকল্পিত বৈষম্যপূর্ণ আলোছায়ার মায়া মঞ্চে কাজ করতে থাকলো, অমনি গোটা প্রয়োগ বা বিশেষ কোনো দৃশ্যের সৌন্দর্য এমন বেড়ে গেলো যে, মঞ্চ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়াই তখন কষ্টকর। নানা এ্যাঙ্গেল থেকে আলোর ব্যবহার তো আছেই। আবার পেছন দিককার কয়েকটি কোণ থেকে আলোর ব্যবহার মঞ্চের ওপর নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পারে। টেলিভিশনের স্টুডিওতে এই পদ্ধতির কাজ থাকে অনেক বেশি। দ্বি-মাত্রিক অর্থাৎ সাদা-কালোয় গভীরতা আনার ব্যাপারটা এখানে কিন্তু জটিল। এতে অনেক সমস্যার মুখোমুখিও এসে দাঁড়াতে হয়। ছোট মঞ্চের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, অভিনয়-শিল্পীর কাঁধের ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু বড়ো মাপের মঞ্চে এই পদ্ধতিটি প্রযোজনার সৌন্দর্য রচনার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়। অবশ্য আমি এমন কথা বলছি না, অতীতের থিয়েটারে পেছন দিকে একেবারেই আলো ব্যবহৃত হতো না। হতো। কিন্তু তখনকার আলোকবিজ্ঞানের জগৎ এতোটা বিশদ ও বিস্তৃতি পায় নি।

নির্বাচনজনিত চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা

গোটা নাট্যের প্রযোজনার প্রদর্শনজনিত পরিকল্পনাটি যেমন নাট্যনির্দেশকের; আবহসংগীত, আলো, ধ্বনি সংযোজনাজনিত পরিকল্পনাগুলো যার যার বিভাগের। নাটকটি যখন পড়া হয়, মহলার খসড়া যখন রচিত হয় এবং মহলা যখন পুরোদমে চলতে থাকে, তখন দৃশ্যের পরিমার্জন, সংযোজনার কাজটাও করে যেতে থাকেন নির্দেশক। এবং প্রত্যেকটি নাট্যক্ষণ ধরে ধরে বিশ্লেষণ করে থাকেন। অর্থাৎ কোন দৃশ্যের পট কী, সময় কখন, মুড কী, পরিবেশ ও পরিস্থিতি কেমন; কার কোন অবস্থান এবং কেন, বিচলনের পরিধি কতটুকু, কোন চরিত্রের কী ক্রিয়াকর্ম, মানসিক অবস্থা কার কেমন, কোন শাখা দ্বন্দ্ব কার মধ্যে কোনভাবে কাজ করবে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হবে তার শারীরিক ও মুখের অভিব্যক্তি—সব মিলিয়ে দ্বন্দ্বটা কোথায় যাবে—খুঁটিয়ে দেখলে এগুলো বুঝে নিলেই মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর মাথায় পরিকল্পনার তরঙ্গ কাজ করতে থাকবে, সে কিছু নোটও নিতে পারে। তবে সবসময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, নির্দেশক কোথায়, কেমন করে, কিসের ওপর এমফ্যাসিস দিচ্ছেন। এ-ভাবেই মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর মনে নির্বাচিত ক্ষণগুলোর খসড়া রচিত হতে পারে। নাট্যে কি সেই পরিকল্পনার খসড়া বা নকশা অনুযায়ী কাজ করে যাবে মঞ্চালোকবিজ্ঞানী?

না। তাকে জানতে হবে ওই দৃশ্যস্থ চরিত্রদের পোশাক পরিচ্ছদ, পরচুলা, মেক-আপ কেমন হবে। দৃশ্যসজ্জার অবস্থিতি এবং তার রঙের কারুকর্ম কেমন থাকবে। এর ওপর রয়েছে আবহ আর ধ্বনির কাজ। এ-বিভাগগুলো এই দৃশ্যের কোথায় কি এফেক্ট দিচ্ছে—সে সম্পর্কেও বিশদ না জানা থাকলে আলোকবিজ্ঞানীর আলোক প্রতিফলন, বিচ্ছুরণজনিত পরিকল্পনা রচনার কাজ কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এবং নির্বাচন-জনিত চিন্তাটাও ধোঁয়াটে হয়ে থাকবে। আসনে বসে দর্শক গোটা মঞ্চটাকেই দেখেন নিজেদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী। এবার দেখা গেলো, নাট্যনির্দেশক বলেছেন, বিশেষ একটি নির্দিষ্ট মঞ্চভূমির ওপর মঞ্চালোককে সীমাবদ্ধ রাখতে। তার মানে ওই ক্ষেত্রটি ছাড়া বাকি মঞ্চ অন্ধকার থাকছে তো? এখন ওই অন্ধকার ঘন কালো হবে না, অস্পষ্ট থাকবে—যেমন যাকে জোনাল এ্যাকটিং-এর সময়—সেটা বুঝে নিতে হবে বিশদভাবে। আলোকবিজ্ঞানীকে মনে রাখতে হবে, এটাই শেষ দৃশ্য বা ক্ষণ নয়। বাকিটা পড়ে রয়েছে। সুতরাং নাট্যক্ষণ, জোন ইত্যাদি বাছাই কিন্তু নির্ভর করে থাকবে আলোকিতকরণের ভারসাম্যের ওপর। যা দর্শককে ক্ষণমাত্র সময়ের জন্যও যেন অন্যমনস্ক না হতে দেয়।

পরিবেশ

মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাজ শুধুই কিন্তু মঞ্চকে আলোকিত করা নয়, চরিত্রকে ভালোভাবে দৃশ্যমান করা নয় বা কারিগরী কৌশলে তাৎক্ষণিক মায়া সৃষ্টিও এর শেষ নয়। দর্শকের মনের ওপর তার কাজটি একশো ভাগ না হলেও ষাট ভাগ তো বটেই। তার মানে দর্শকের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রচনাতে আলোর কাজ প্রভূত পরিমাণেই থাকে। আমরা জানি 'পরিবেশ' এই শব্দটি পরিস্থিতির একটা ব্যাপক অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর এই চাবিকাঠিটির নাম মঞ্চে সুপরিকল্পিত আলোক-পরিকল্পনার আন্তরিক ব্যবহার। আলোকসম্পাতই বলে দিতে পারে, দৃশ্যটি দিনরাত্রির কোনো সময়ের প্রতিরূপ। মেঘলা দিনের সকাল, কালবৈশাখীর বিকেল নাকি শীতের মধ্যরাত্রি অথবা শ্রাবণ মাসের সকাল। কিন্তু ওইটুকুতেই আলোর কাজ শেষ কী? এটা এক অংশমাত্র। পরিবেশজনিত অবস্থা, চরিত্রদের সুখ, দুঃখ, বেদনা, উল্লাস, চাপা ক্ষোভ, অথবা ক্রোধ, উদার অভিব্যক্তি, ত্রাসান্বিত মুহূর্ত-কে দর্শক হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার ভয়ঙ্কর দায়িত্বটির আশিভাগ নির্ভর করে আলোর ওপর।

মঞ্চের ক্ষেত্রে এইরূপ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দ্যুতিময় এবং নরম আলোর সংমিশ্রণ প্রয়োজন। জানা থাকা দরকার, নাট্যের নবরস অনুযায়ী আলোক প্রক্ষেপণের

পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। আনন্দোজ্জ্বল, সুখী, সোনালী পরিবেশ-এর রস যেমন এক হতে পারে না, তেমনি শান্ত, দৃঢ়, দুঃখপূর্ণ, অভিমানী, হিংসায় উদ্বেল, দানবিক আক্রোশ-এর ক্ষেত্রের আলোকসম্পাত আলাদা আলাদা পরিবেশানুগ এবং চরিত্র প্রভাবিত সময়কে ধরে কাজ করবে। তবে, আগে বলেছি, আবার বলছি, ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারটা কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মঞ্চে আলোর আরও কাজ থাকে। চরিত্র, দৃশ্য, পরিবেশ, পরিস্থিতি, ঘটনা এবং সংলাপ-প্রতীক অভিব্যক্তির ভাবরসের সঙ্গে দর্শককে একাত্মীকরণ করা। কাজটাকে যতো সহজ মনে করা হয়, ততো সহজ কি? একেবারেই নয়।

পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া

ইল্যুমিনেশান, ডাইমেনশান, সিলেকটিভিটি এবং এ্যাটমস্‌ফিয়ার (পরিবেশ) মঞ্চে আলোর আল্পনা তৈরির আগে থেকেই মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে জানতে হবে। এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সংপৃক্ত। এর প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দুইই থাকে। কিন্তু একটি ছাড়া অন্যটি নিজস্বভাবে মঞ্চে কোনো ভাবরস ফুটিয়ে তুলতে পারে না। অন্তত নাট্যের ক্ষেত্রে। পরিবেশ রচনা করতে বহু কৌণিক কেন্দ্র থেকে ডাইমেনশনাল আলোর প্রতিফলন একান্ত প্রয়োজন। মঞ্চভূমিতে নির্বাচিত আলোকরশ্মি ওই এলাকাকে প্রশস্ত করে। খুব সুক্ষ্মভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে ডাইমেনশনোল আলোর কাজ করতে না পারলে তার ফল দাঁড়াবে একেবারে উল্টো। এবং তা দর্শকদের দেখার আনন্দকেও মাটি করে ছাড়বে। কী ভাবে সবদিক বজায় রেখে আলোর সার্থক চিত্রণ সম্ভব তার জন্য নীচের ছকটি লক্ষ্য করো:
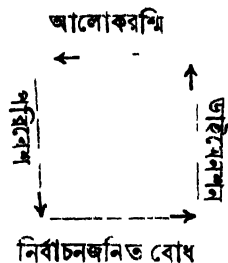
এই ছক অনুযায়ী মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে যা ভাবতে হবে, তা হলো তার কাজ অন্তত এই নিয়মের নিগড় ধরে সঠিক ভাবে চলছে কিনা। তাকে আরও ভাবতে হবে দর্শকদের গ্রহণ ক্ষমতার সীমার কথা। প্রশ্ন কিছু আসবেই তখন। এবং দেখতে পাবে, তোমার মনের প্রশ্নগুলোর জবাব তোমার উপলব্ধিজনিত জ্ঞানই বলে দিচ্ছে। তখন তুমি নিজেই একটি পূর্ণাঙ্গ কমপিউটারের মতন কাজ করে যেতে পারবে।

তরলায়িতকরণ

এতোখানি আসার পর তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো, মঞ্চালোকবিজ্ঞান স্থিতিশীল তথা স্ট্যাটিক হতে পারে না কিছুতেই। অভিনয়কালের সীমার মধ্যে পরিবেশ এবং নির্বাচনজনিত-ভাবনার কাজ দুইটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এই দুই মৌল বৈশিষ্ট্য হলো সচেতন ও অবচেতন।

বিশেষ ধরনের সচেতনতাপূর্ণ বিশেষ আলোর পরিবর্তন কেমন করে ঘটে থাকে? ধরো, একটি চরিত্র মঞ্চদৃশ্যে নিজের ঘরের বোতাম টিপে আলো জ্বাললো। আলোটি কি তিনি জ্বালালেন? না। চরিত্রটি বোতাম টিপবার অধিকারটুকু পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে কী ধরনের আলোর ঝর্ণা ছড়িয়ে পড়বে তা ক্ষেপণ করার দায়িত্ব আলোক-বিজ্ঞানীর। দেখতে হবে আলোটি মঞ্চভূমির কোন এলাকায় পড়েছে এবং সেই আলো কোন কেন্দ্র থেকে ফেললে নাট্যক্ষণটি নির্ভুল মাত্রায় পরিণত হবে। আবার অনেক সময় ক্রসফেড্ আলোর ব্যবহার করতে হয়। যখনই ভাবপ্রবণ সংগীতের ক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুত হালকা, ক্ষীণ নীল আলোয় রূপান্তরিত হলো পরিবেশ। এ-ব্যাপারটা দর্শক বুঝতে পারেন এবং তাঁরা অপেক্ষা করেন পরিস্থিতিগত পরিবর্তনের মুহূর্তকে শিল্প-সার্থক করার জন্য আলো আরও কিছু কাজ করবেই করবে।

কিন্তু জেনে রেখো, অবচেতন আলোর পরিবর্তন দর্শক চট করে জ্ঞান বা উপলব্ধির সীমার মধ্যে ছুঁতে পারে না। অথচ আলনার এই অবচেতন রূপান্তর দর্শকদের ভীষণ প্রভাবিত করে। ভারসাম্য বজায় রেখে এই আলোর গভীরতা খুব আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করে। ক্রমে মঞ্চের অন্যান্য অংশে পড়ে। তখন মঞ্চে কি ঘটছে, তা উপলব্ধি করার আগেই দর্শকের মন ও দৃষ্টিকে লুফে নেয় আলোর দ্যুতিময় অংশ। ঠিক এ-ভাবেই শান্ত আলোর মন্থর বিস্তার আর উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি কমে আসা সম্পর্কে দর্শক সচেতন থাকে না। পরিবেশগত এই পরিবর্তন অবচেতনভাবে মঞ্চে ভাবাবেগপূর্ণ একটি মুহূর্ত সৃষ্টি করে। যা, অভিনয়শিল্পীরাও সানন্দে উপভোগ করেন ও তাকে কাজে লাগান। সত্যিকারের উৎকৃষ্ট প্রযোজনায় প্রতীকী বা ইঙ্গিতময় আলোর মূল্য অনেক। দর্শক যদি শিক্ষিত হন, তিনি তখন এই ব্যবহারে খুশীতে ডগমগ হবেন, নয়তো তাঁর মন জুড়ে প্রশান্তি নেমে আসবে। এ-ধরনের আলোকের ব্যবহারকে আমরা বলতে পারি 'প্রযোজনার পরশ পাথর।' ভারসাম্যসহ এই যে গভীরতার সৃষ্টি, একে ঐন্দ্রজালিক কৌশল বলা ঠিক হবে না। কারণ এ-আলো দর্শককেও তাঁর অবচেতন স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

নাট্যদর্শন করতে এসে দর্শক কী করেন? তাঁর আসনে বসে তিনি নিজেকে উন্মুক্ত

করে দেন। এবং তাঁর ওপর খবরদারী করার অধিকারটি আগে থেকেই তিনি দান করে বসে থাকেন। এখানেই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব বেড়ে যায় প্রযোজনার। বিশেষ করে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর। কারণ বিভিন্ন দর্শকের সংবেদনশীলতা ও গ্রহণ-ক্ষমতা যদিও আলাদা আলাদা কিন্তু যবনিকা উত্তোলনের পরে সব দর্শকের এক সাধারণ সংবেদনশীলতা এই মোহনায় মিলেমিশে যায়। এর মধ্যে থাকে শিল্পগত, সৌন্দর্যগত, ভাবাবেগগত এবং আরও কিছু উপলব্ধি। যদি কেউ এই অবচেতনমূলক আলোর কাজকে গ্রহণ করতে না পারে, তবে জেনো, সে-সমস্যা কেবল আলোকবিজ্ঞানীর নয়—গোটা নাট্য উপস্থাপনারই।

রীতিপদ্ধতি

বাস্তবানুগ নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমগ্রতাই বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিখুঁতভাবে তা পরিবেশনের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এখানে সূর্যের আলো কোন সময়ের, কোন মাসের, কোন জায়গার, কোন পথে, কি পরিমাণে প্রতিফলিত হচ্ছে সে-বিষয়ে সর্তকতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। আকাশে যদি চাঁদ উঠেছে দেখানো হয়, তবেও ভাবতে হবে তিথি কি? কোন মাস? কোন পক্ষ? কোন পরিবেশ? তা সম্যক জানার পর ব্যবহারের কথা ভাবতে হবে। আবার টেবিল-ল্যাম্প যদি জ্বলানো হয়, তবে টেবিলটার অবস্থান, উচ্চতা, ঘরের মাপ, ছাদের উচ্চতা, খোলা ও বন্ধ জানলা এ-সব ভেবে নিয়ে করতে হয় আলোর কাজ। এ-সব না ভাবলে বাস্তব মঞ্চালোক রচনা কিছুতেই সম্ভব হ'তে পারে না। লোডশেডিঙে লম্প, মোমবাতি কি লণ্ঠন জ্বালালে যদি একই আলো ব্যবহৃত হয় তবেও অজ্ঞানতাই প্রকাশ পায়। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: কোনো এক তথাকথিত বিখ্যাত নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা—যিনি আসলে ভিন্ন থিয়েটারের প্রবক্তা—তাঁর একটি রাজনৈতিক আশ্রয় আছে। বলাই বাহুল্য সে তাঁবুটি বাম। একবার তাঁর নতুন প্রযোজনা দেখতে গিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেলাম। না পারি উঠতে, না যায় বসে থাকা। আগেগোড়াই তিনি টকটকে লাল আলোতে কাজ করে গেলেন—নন্দনতত্ত্বের সূত্রানুযায়ী যার মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বলাই বাহুল্য, নাটকটিকে রাজনৈতিক প্রচার-নাট্য বললে অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু কিছু বলার উপায় থাকে না, কারণ ওঁরা বলেন, নাট্য নাকি আদৌ শিল্পটিল্প বলতে যা বোঝায়—তা একেবারেই নয়। নাট্য হচ্ছে হাতিয়ার। রাজনীতি প্রচারের। আমারই এক অনুজ আলোর কাজ করেছিলো। একদিন তাকে বাগে পেয়ে চেপে ধরলাম। বোকার মত থতমত খেয়ে সে বললো, 'ডিরেক্টরস্ থিয়েটারে' মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর নাকি স্বাধীনতা থাকে না। তার ওপর এ-ভদ্রলোক ভয়ঙ্কর কট্টর রাজনৈতিক মানুষ। তিনি জানেন লাল মানেই সাম্যবাদ। তাই থিয়েটারে সর্বদা লাল ব্যবহারও সাম্যবাদেরই নাকি প্রতীক।

৮.

মঞ্চালোকবিজ্ঞানের সাজসরঞ্জাম (১)ঃ নানা ধরনের বাতি, জোয়ারবাতি, খোপঅলা জোয়ার-বাতি; স্পটস; ফ্রেসনেল, প্রোফাইল, ফোকাস-স্পট, বীমলাইট, ফলো-স্পট; প্রয়োজনীয় বাল্ব: ডিসচার্জ, টাংস্টেন, টাংস্টেন হ্যালোজেন, প্রজেক্টার ল্যাম্প, ননফিলামেণ্ট, রিফ্লেক্টার, আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্প প্রভৃতি—

আলোকবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে আলোকসম্পাতের সাজসরঞ্জামের ব্যবহার নিয়ে। আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হলেও এরই ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু তার আগে ভালো করে জানা দরকার মঞ্চালোকবিজ্ঞানের আসল সংজ্ঞা। আমি এর আগের পরিচ্ছেদগুলোতে যদিও বিশদ আলোচনা করেছি, তবুও সংক্ষেপে বলা হয়েছে: 'Stagelighting is a fluid selective atmospheric dimentional illumination appropriate to the style of a Particular Production.' এখন এই যে বিশেষ নাট্যপ্রযোজনা, তার মঞ্চালোক-পরিকল্পনা অনুযায়ী মঞ্চালোক-বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম দরকার। এবং তা যেন যথাযথ হয়। সুতরাং আমি এই পরিচ্ছেদে মঞ্চে আলোর আয়না আঁকতে যে-সব প্রচলিত এবং সর্বাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম আছে তার সচিত্র বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছি।

সাধারণত আলোর কাজকর্ম, গতিবিধি, গভীরতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে সুইচবোর্ড—যদিও আসলে বলা উচিত, এর যথার্থ নাম হবে ডিমারবোর্ড। নিয়ন্ত্রণের কাজটি এখান থেকে চালিত হয়ে থাকে। আলো নেভানো এবং জ্বালানোই কেবল এই বোর্ডের কাজ নয়; এখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে মঞ্চে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি আলোর ঔজ্জ্বল্য থেকে শুরু করে অন্ধকার নামানো পর্যন্ত ক্রমিক পর্যায়। মঞ্চে ব্যবহৃত আলোর রঙ পর্যন্ত এই সুইচবোর্ড থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রত্যেকটি মঞ্চের সম্মুখভাগে ফ্রেমের সাহায্যে প্রায় সবরকম আলোর আধার সংস্থাপন করা থাকে। নাট্যের নির্বাচিত বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে বাঞ্ছিত ও অনিবার্য পরিবেশ রচনা করার জন্য নাট্যের পাত্রপাত্রীদের বিচলন, ক্রিয়া-কর্ম, বিজনেস, অভিব্যক্তি, আবেগকে অর্থবহ ও স্পষ্ট করে তোলার জন্য আলোকরশ্মিকে দিয়ে কথা বলানো সম্ভব। মঞ্চে ব্যবহৃত আলোর গতিকে

নিয়ন্ত্রণ করা থেকে আলোর দ্যুতি বাড়ানো ও কমানোর পর্যায়গুলো দেখানো সম্ভব এই বোর্ডের মাধ্যমেই।

নানা ধরনের বাতি (Lanterns) :

বারবার 'বাতি' 'বাতি' করলে পড়ার ক্ষেত্রে যেমন অসুবিধে হয়, কাজের বেলাতেও এই নিয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে। ল্যানটার্নস্‌কে তা হ'লে কী বলি? লণ্ঠন? এই বাংলা পরিভাষাটিও কি ঠিক হয়? বোধ হয়, না। আর 'ল্যানটার্ন' কথাটা যখন মঞ্চের ক্ষেত্রে বহু ব্যবহৃত এবং প্রচলিত সুতরাং আমি আলোচনাকালে 'বাতি' বা 'লণ্ঠন' কথাটাকে সরিয়ে রেখে 'ল্যানটার্ন' শব্দটাই ব্যবহার করতে চাই। এবং করবোও। এই সব ল্যানটার্নের সঙ্গে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্সকে যুক্ত করে তার সাহায্যে মঞ্চে আলোর আল্পনা আঁকা হয়। এক একটি আধারে বসানো থাকে এই সব আলোর উৎস। এর আন্তর্জাতিক নাম 'লুমিনেয়র' (Luminaire)। এ ছাড়াও নানাদেশে এই ল্যানটার্নকে নানা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। উত্তর আমেরিকায় যেমন একে বলা হয় 'ইনস্ট্রুমেণ্ট' (Instrument). আলাদা আলাদা কৌণিক বিন্দু থেকে আলোক-রশ্মির আকার আকৃতি এবং গুণগত দিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পর্যন্ত রয়েছে এর মধ্যে।

সবরকম ল্যানটার্ন-এর মধ্যে একই সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে—রঙিন একটি কাঠামোকে ধরে রাখার যে ব্যবস্থা, এগুলোতে তাই রয়েছে। সকল দিক থেকে, বিভিন্ন কৌণিক বিন্দু থেকে আলোকরশ্মির আকার ও আকৃতি এবং তার দ্বারা কাজ করাবার যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তা নিয়েই এই আলোর কাঠামো। এখন নাট্যের কোনো বিশেষ ক্ষণে, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকে মূর্ত করে তুলতে এই সব আলোকরশ্মির নিয়ন্ত্রণ করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে বেশি করে। অর্থাৎ কোন ল্যানটার্ন কীভাবে ব্যবহৃত হবে, কোন আলোকরশ্মি কেমনভাবে, কোন কেন্দ্র থেকে দৃশ্যানুগ পরিবেশ রচনা করবে। সেটাই হবে আসল বিবেচ্য বিষয়।

জোয়ার-বাতি (Flood light)

অভিধানগত অর্থ: রঙ্গমঞ্চাদি হইতে অন্ধকার দূরীকরণার্থ নানা দিক হইতে পতিত আলো। ইংরেজিতে বলা হয়েছে: 'This term is oviously the reverse of to 'spot' but it is important to realize that most spotlight can both be spotted and flooded and that even in the case of wide-angle floodlight the result may not resemble a softlight (q.v.) as although the beam may radiate widely it may still have its origin in a source small in area and therefore capable of creating pronounced shadows.'

আসলে ল্যানটার্ন-এর সরলতম রূপকেই বলা হয়ে থাকে 'ফ্লাড' (জোয়ার-বাতি) : ধরা যাক একটি কেস্ তথা বাক্সের মধ্যে এই ল্যানটার্ন আর আলো-প্রতিফলক কাচ এমনভাবে লাগানো রয়েছে যে, বাক্সটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তা বিস্তৃত। বাক্সটির এমন একটি হাতল থাকবে—যা প্রয়োজনে ওপরে তোলা যায় আবার দু'পাশেই নামানো যায়—যা আলোকনির্দেশনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ-ছাড়া অধিকতর ব্যবস্থা এই আলোক বাক্সে থাকে না। মঞ্চে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তার মানে এই উৎস থেকে উৎসারিত আলোকরশ্মির আকার বা আকৃতি না যায় বাড়ানো, না কমানো। এর এমন ঢাকনা থাকার নিয়ম নেই—যা দিয়ে আলোকচ্ছটাকে নিয়ন্ত্রণের আওতার মধ্যে এনে ফেলা যায়। আলোর জ্যোতিঃরেখার প্রসারতা সুতরাং মঞ্চের কতোটুকু জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে, তা নির্ভর করবে ফ্লাড এবং যে-বস্তুটির ওপর আলোকচ্ছটা পড়বে তার দূরত্বের ওপর। শিক্ষার্থীদের জেনে রাখতে হবে, এই আলোর বাক্সটি যেখানে রাখা হবে—ঝুলিয়ে বা পেতে—মঞ্চের অভীষ্ট এলাকাকেই সে কেবল উজ্জ্বল করে রাখবে। এর ফলে মঞ্চে অভিনয়রত পাত্রপাত্রীর চাইতে কিন্তু এই আলো দৃশ্যসজ্জার ঔজ্জ্বল্যই বাড়ায় বেশি। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, দর্শকের দৃষ্টিকেও পাত্রপাত্রীর ওপর থেকে সরিয়ে নিতে পারে এই আলো। বিদেশের কোথাও কোথাও যে-ফ্লাড সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার শক্তি হচ্ছে ২০০, ৫০০ ও ১০০০ ওয়াট। পাওয়া গেলে অবশ্য এর থেকে নিম্নশক্তির ফ্লাডও ব্যবহার করা সম্ভব। তবে তার আকার হবে ছোট। যেখানে মঞ্চালোক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ডিমারবোর্ড ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায় না, সেখানে অবশ্য অল্পশক্তিসম্পন্ন ফ্লাড ভীষণ কাজে লাগে। যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি পর্যাপ্ত থাকে না, সেখানেও।

বেশি খোপঅলা জোয়ার-বাতি (Compartmental Floods)

ফ্লাডলাইটকে প্রয়োজনমাফিক অনেকগুলো খোপ-বিশিষ্টও করা হয়ে থাকে। প্রায় ছয়ফুট দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট বাক্সের মধ্যে ভাগ ভাগ করে বেশ কয়েকটি ফ্লাডলাইট জুড়ে দেওয়া যায় এবং দুই থেকে চার সারকিটে বৈদ্যুতিক তারও ব্যবহার করা যায়। এর ফলে দুই থেকে চার রকমের রঙকে মিলিয়ে মিশিয়ে মঞ্চে ব্যবহারের পথটি পরিষ্কার হবেই। যখন খোপঅলা ফ্লাড-লাইটের বাক্সটি মঞ্চের ওপর দিকে ঝুলিয়ে ব্যবহার করা হয়, তখন একেই বলা হয়ে থাকে 'ব্যাটেনস্'। যখন মঞ্চ-ভূমিতে স্থাপন করে এই আলোকে কাজে লাগানো হয়, তখন আবার এর নাম হয় 'ফুটলাইট'। এখানেই ফ্লাডের নামকরণের শেষ নয়। যখন একে মঞ্চের যে কোনো অংশে বসিয়ে ব্যবহার করা হয়, তখন, একে কী বলা হয়? বলা হয় 'ইলেকট্রিকস গ্রাউণ্ড।' অন্তত এক্ষেত্রে

মনে রাখতেই হবে 'গ্রাউণ্ড' শব্দটির আগে বসানো 'ইলেকট্রিক্স' শব্দটি বাদ দিলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

এই আলোর ক্রিয়া শুধু সীমাবদ্ধ থাকে মঞ্চের বিরাট অংশকে আলোকিত করার মধ্যে। যেমন: দৃশ্যপট, মঞ্চের আকাশ, পশ্চাদপট ও মঞ্চের সীমারেখাগুলো।

স্পট্‌স্‌

মঞ্চে আলোকচ্ছটার আকার আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই স্পট্-লাইটের এতো প্রয়োজনীয়তা। ফ্লাডের মতো স্পট-লাইটের আধারও প্রায় একই রকমের অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে ঘোরানোর ব্যবস্থা সহ বর্তমান। কিন্তু এর মধ্যে যে অতিরিক্ত বন্দোবস্তটি রয়েছে তা আবার ফ্লাডের নেই। এই অতিরিক্ত বন্দোবস্তটি কী? উত্তর: সেটি হচ্ছে, মঞ্চে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির কোণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধে এবং আলোক প্রতিফলিত স্থানটির ক্ষেত্রেও এই নিয়ন্ত্রণ সমানভাবে বজায় রাখার ব্যবস্থা। আলোকরশ্মির কিনারার বৈশিষ্ট্য বিচার করে এই স্পষ্ট-লাইটকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে এক: একটির নাম 'ফ্রেসনেল' বা নরম কিনারাযুক্ত আলোক-রশ্মির প্রতিফলক। অন্যটি হচ্ছে 'প্রোফাইল' (কঠিন কিনারাযুক্ত আলোকরশ্মির প্রতিফলক)।

ফ্রেস্‌নেল্‌ স্পট্‌

ফ্রেস্‌নেল-স্পট-এর লেন্স ব্যবহারের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এর লেন্স এভাবে লাগানো—যার ফলে এই স্পট মারফৎ সমতল আলোর রশ্মি সৃষ্টি করা সম্ভব। এর আলোকচ্ছটার কিনারাগুলো খুব নমনীয় হয় এবং এই স্পট থেকে খুব নরম ধরনের ছায়াও উৎপন্ন হতে পারে। একে নিরঙ্কুশ সূক্ষ্ম বলা যায় না। সেই কারণেই এগুলো অন্যান্য আলোকরশ্মির কিনারার সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারে। ফলে মঞ্চে খুব সহজেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।

আমরা আগেই জেনেছি, আলোকরশ্মির আকার হচ্ছে অনেকটা মোচার মতন। অতএব আলোকসম্পাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের দূরত্ব স্পটলাইট থেকে যতোটা বেশি হবে, আলোর আকৃতি ততোই বাড়বে। আলোক-বিচ্ছুরক-বোতাম (Focus knob) এর সাহায্যে আলোর রশ্মিকোণ পরিবর্তন করা সম্ভব। বাল্ব ও লেন্সের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ও পরিবর্তন করা যায় এই বোতাম-এর সাহায্যে। মনে রাখতে হবে, এই বাল্বকে (প্রতিফলকসহ) যখনই লেন্সের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখনই আলোকরশ্মি বিস্তার লাভ করে থাকে। আবার যখনই লেন্সের কাছ থেকে ওই বাল্বকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখনই আলোকচ্ছটার আকার কৃশকায় হতে থাকবে।

ছোট ছোট ফ্রেসনেল-স্পটের ক্ষেত্রে অবশ্য খুব একটা ঝামেলা পোয়াতে হয় না। কেন? কারণ এই ছোট ছোট স্পটের নীচের দিকে যে বোতাম থাকে, প্রয়োজন মতো তা সামনের দিকে অথবা পেছনের দিকে ঠেলে আলোকচ্ছটার বিস্তার ও বিশীর্ণতা আনা সম্ভব। কিন্তু বড়ো ধরনের ফ্রেসনেল-স্পট-এর গঠনপ্রণালী একটু অন্যরকম হয়। এর সঙ্গে লাগানো থাকে স্ক্রু সম্বলিত একটি যন্ত্র। ল্যানটার্নের পেছন অথবা সম্মুখভাগের বোতাম টিপে এর আলোকরশ্মির নিয়ন্ত্রণের অধিকারে আনা যায়।

আলোকযন্ত্রের দোকানে নানা ধরনের লেন্সযুক্ত রেডিমেড ফ্রেস্নেল-স্পট কিনতে পাওয়া যায়। এ-সব লেন্সের শক্তিও থাকে নানা মান-এর। সাধারণত যে-ফ্রেস্নেল স্পট সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাতে যুক্ত থাকে ৫০০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন বাল্ব। ছয় ইঞ্চি একটি লেন্স এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর পরে ব্যবহৃতব্য ১০০ ওয়াট আর তার সঙ্গে থাকবে ৮ ইঞ্চি লেন্স। যে-সব মঞ্চে খুব কাছ থেকে আলোর জ্যোতি-নিক্ষেপের ব্যবস্থা রয়েছে বা থাকবে, সেখানে ২৫০ থেকে ৫০০ ওয়াটই যথেষ্ট। আর যে-সব মঞ্চে বেশ দূর থেকে আলোকসম্পাতের কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ২০০০ ওয়াটের বাল্ব এবং ১০ ইঞ্চি মাপের লেন্স ব্যবহারই বিধেয়। সব থেকে বেশি এবং সব থেকে কম আয়তন বিশিষ্ট মঞ্চে আলোক-বিস্তারের পরিমাপ সংক্রান্ত তালিকা আমি পরে যুক্ত করছি এবং এ-বিষয়ের বিশদও থাকছে। তাতেই জানা যাবে, কতো কতো-শক্তিসম্পন্ন বাল্ব কতোটুকু স্থান আলোকিত করতে পারে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বলা হয়েছে, ৫০০ ওয়াট শক্তির বাল্ব এবং ব্যবহৃত ৬ ইঞ্চি লেন্সের ক্ষেত্রে মঞ্চ থেকে ল্যানটার্ন-এর দূরত্ব হবে প্রায় ১৪ ফুট। আবার ১০০ ওয়াট শক্তির বাল্ব-এর সঙ্গে ৮ ইঞ্চি লেন্স যুক্ত করলে মঞ্চ থেকে ল্যানটার্নের দূরত্ব হবে ২০ ফুটের মতন।

প্রশ্ন: ফ্রেস্নেল লেন্সের বাড়তি উপযোগিতা কী?

উত্তর: আলোকরশ্মির কিনারাগুলোকে বেশ নমণীয় রাখা।

এই লেন্স ব্যবহার করলে মূল আলোকরশ্মির বাইরের দিকে গভীরতাপূর্ণ আলো বিস্তার লাভ করে। এই স্বল্প গভীর আলোকে মারতে হ'লে বা নষ্ট করতে হ'লে ল্যানটার্নটি দৃশ্য এলাকার খুব কাছ থেকে, নইলে উইংস-এর পাশ থেকে ব্যবহার করতে হবে। ফ্রেস্নেল-স্পটের লেন্স থেকে, পেছন দিকে বা লেন্সটি যেখানে বসানো থাকে তার কাছে লম্বাভাবে কালো রঙের শেড দেওয়া থাকে। যে সব ফ্রেস্নেল-স্পটে এ ব্যবস্থা থাকে সে ধরনের স্পটই কাজে লাগে বেশি। এই লেন্সের আবার আলাদা একটা নাম রয়েছে 'কলাভরেড' লেন্স (Colousred lens)। আলোকবিজ্ঞানীরা মনে করে

থাকেন যে, সামান্য আলোকচ্ছটার বিস্তারকে কমানোর জন্য মূল আলোকরশ্মিকে বাধা না দেওয়াই ভালো।

আর একরকমের যন্ত্র আছে, যাকে বলা হয় barndoor। একে যন্ত্র না বলে যন্ত্রাংশ বলাই উচিত। এই 'বারন্‌ডোর' ফ্রেসনেল-স্পটের সামনের দিকের হাতল থেকে পিছলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এর চারটি শাটার (Shutter) এর মাধ্যমে আলোকরশ্মির নমণীয় কিনারা বা সীমারেখাকে স্পষ্ট করে তোলা যায়। ছোটখাটো মঞ্চে এই যন্ত্রাংশটির ব্যবহারের সময় মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। ল্যানটার্নের সঙ্গে এর ব্যবহারের জন্য অনেকটা জায়গার দরকার। মঞ্চের পর্দার সঙ্গে অতি সহজেই এটি আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

অল্প কথায় ব্যাখ্যা : ফ্রেসনেল-স্পটের কাজ হচ্ছে মঞ্চের আলোকরশ্মির আকার নিয়ন্ত্রণ করা এবং ওই আকারকে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য প্রয়োজন 'বার্নডোর'-এর।

প্রোফাইল-স্পট

এ ধরনের স্পট-লাইটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাল্ব ও তার প্রতিফলককে নিশ্চল রাখা। কিন্তু এর সঙ্গে ব্যবহৃত লেন্সটি ঘূর্ণায়মান গুণসম্পন্ন। আবার যেখানে ল্যানটার্নের লেন্সটি স্থির, সেখানে কিন্তু বাল্ব ও প্রতিফলক ঘুরবে। লেন্সের এই যে ঘোরাফেরা, এর মাধ্যমেই প্রোফাইল-স্পটের আলোকরশ্মির গুণগত দিক নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যে-লেন্সের একদিক সমতল, অন্যদিক উত্তল—সে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নমনীয় জ্যোতিঃরেখার কিনারা বা পার্শ্বরেখা সৃষ্টি করতে পারে। তবু যদি কিছুটা নমনীয় ও উপযুক্ত মনে না করা হয়, তা হ'লে লেন্সের নলটিকে ঘুরিয়েফিরিয়ে, উদ্দেশ্যে পৌঁছনো সম্ভব। প্রোফাইল-স্পটের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। একে বলা হয় gate. প্রোফাইল-স্পটের চারটি শাটার থাকে। এই শাটারগুলো চার পার্শ্বযুক্ত জ্যোতিঃরেখার আকৃতি সৃষ্টি করতে পারে। এর হাতলের সঙ্গে একটি সরু ছিদ্র থাকে—যা রামধনু সৃষ্টিকারী একটি পাতলা পর্দা বা মধ্যচ্ছদা—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ডাইঅ্যাফ্রাম', তাকে ধরে রাখে। আলো এর দ্বারা বৃত্তাকার হতে পারে। অনেকে আবার (বিখ্যাত মঞ্চালোকবিজ্ঞানী) এর সঙ্গে একটি ধাতব মুখোশ পরায়—মধ্যমধ্যে ও প্রয়োজনমাফিক আলোকরশ্মির আকার ও আকৃতি রচনা করা সম্ভব।

প্রোফাইল-স্পট-এর মাধ্যমে আলোকরশ্মির বিস্তার এবং উচ্চতাকেই বিশেষ করে দেখানো সম্ভব। এর gate-এ যে ঢাকনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার নাম 'গোবো'

(Gobo)। যেহেতু এই বিন্দুতে ল্যানটার্ন অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে বলে 'গোবো' তৈরি হয় এবং উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে এমন ধাতব পদার্থ দিয়ে। কী আকারের 'গোবো' ফ্রেসনেল-স্পট এর সঙ্গে ব্যবহৃত হবে তা স্থির করতে হবে অবস্থার ভিত্তিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। সব সময় মনে রাখতে হবে, গোবো কিন্তু ওপরের দিককে নীচের দিক হিসেবে তুলে ধরে এবং বাঁ-দিককে করে তোলে ডানদিক। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খুব পাতলা টিনের পাতকে বেছে নেওয়াই সমীচীন।

আলোকচ্ছটার প্রান্তিক মানকে প্রয়োজন-মাফিক যথাযথ করতে যখন লেন্সটিকে ঘোরানো হবে, সেই মুহূর্তেই দেখতে পাওয়া যাবে আলোকরশ্মির আকারগত কিছু পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। জেনে রেখো প্রোফাইল-স্পট থেকে পছন্দ কাজ তথা এফেক্ট-আদায় করে নিতে হ'লে একই সঙ্গে লেন্স এবং শাটারগুলোকে যথাযথস্থানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্থাপন করতে হবে। যদি জোঁকের মতো লেগে থাকা না যায়, তা হ'লে এর মাধ্যমে কোনোরকমেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব হয়ে উঠবে না। প্রোফাইল-স্পটের সঙ্গে যে স্ক্রুটি লাগানো থাকে, ওই স্ক্রু কিন্তু বাল্বকেও ধরে রাখবে। ওই বাল্ব-এর ফিলা-মেন্টের মধ্যবর্তী জায়গায় এই স্ক্রুটির অবস্থান থেকে অনেক সাহায্যও নেওয়া সম্ভব। আজায়াসে আলোকরশ্মির কিনারাগুলো ঠিক করে নেবার জন্য কোনো কোনো প্রোফাইল-স্পট এর দুই প্রস্ত শাটার লাগানো থাকে। স্বাভাবিক শাটারগুলি অপটিক্যাল সেণ্টারে থাকা সত্ত্বেও এই স্পটগুলোর আর এক প্রস্ত বাড়তি শাটার রাখতে হয়। এখানে বিশেষ উল্লেখের বিষয় হলো এই যে, মাঝে মাঝে এই স্পটগুলো হয় বাইফোকাল। এবং অপটিক্যাল gate-এ বসানো থাকে এগুলো। শাটারগুলো দিয়ে লেন্সের সাহায্যে কঠিন আলোকরশ্মির কিনারাগুলো যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন ওই বাড়তি শাখাগুলোর সাহায্যে কিন্তু নমনীয় কিনারা যুক্ত আলোকরশ্মি সৃষ্টি করা সম্ভব। ওই দুই প্রস্ত শাটারের মাধ্যমে আলোকরশ্মির মান (edge quality) সহজ করা যাবে। এবং একই আলোকরশ্মির নমনীয় ও কঠিন প্রান্তিক আলোকরশ্মির মিশ্রণে আলোকে আপন প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে মঞ্চালোকবিজ্ঞানী। প্রোফাইল-স্পটের ব্যবহার ক্ষেত্রে শাটার ও মুখোশ (mask) পরিকল্পনায় ও কৌশলের কাজের ক্ষেত্রে অব্যবহৃত আলোর শক্তি ভয়ঙ্কর তপ্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এই উত্তাপ সহ্য করাও কষ্টকর। সুতরাং প্রয়োজনীয় আলোকরশ্মির আকৃতি উৎপন্ন করতে হ'লে প্রয়োজনীয় যথাযথ লেন্সটির ব্যবহার করা দরকার। এখানে শাটারের ব্যবহার মাত্রা কম করাও সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। আলোকরশ্মির আকারকে ছোট কিংবা বড়ো করাই কিন্তু শাটার ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আসলে ল্যানটার্নের অবস্থান

এবং মঞ্চের দূরত্ব তো আছেই, তার ওপর রয়েছে মঞ্চের কোন্ এলাকায় আলোর কাজ করতে হবে তার দূরত্ব বুঝে যথাযথ লেন্সের নির্বাচন।

হালে প্রোফাইল-স্পটের অনেকগুলো লক্ষ্যনীয় উন্নতির নিদর্শন আমরা পেয়েছি। যেমন ধরা যাক জুম লেন্সের কথাই। এ ক্ষেত্রে দু'টি লেন্সকেই বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা চলে। এবং এরা যথাক্রমে নিয়ন্ত্রণে রাখে আলোকরশ্মি আকৃতি ও গুণগত দিক। এই স্পট তৈরি পাওয়া যায় ৫০০, ১০০০ ও ২০০০ ওয়াট-এর। বৃহদাকার মঞ্চের ক্ষেত্রেই কেবল ২০০০ ওয়াট শক্তিকে ব্যবহারে লাগানো যায়। এ ছাড়া যে-সব মঞ্চের কাজ হয় ২০ থেকে ৪০ফুট দূরত্বের মধ্যে, সে-সব মঞ্চে সাধারণত ব্যবহৃত হয় ১০০০ ওয়াট শক্তি। এখানে মনে রাখতে হবে, 'বাইফোকাল' বা 'জুমলেন্স'-এর ক্ষেত্রে ১০০০ ওয়াট শক্তিই যথেষ্ঠ।

এমন অনেক মঞ্চ রয়েছে, যে-ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, মঞ্চভূমি সীমাবদ্ধ— সে-সব মঞ্চ ৫০০ ওয়াটের প্যাটার্ণ- ২৩' ব্যবহার করতে হবে। প্যাটার্ন ২৩ মাঝামাঝি কোণের সংস্করণটি সকল কাজের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। এর সঙ্গে বাড়তি একটি লেন্স ব্যবহার করে একেই আবার বিস্তৃত কোণ অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। আর যদি আলোকরশ্মিকে দীর্ঘকারে রূপান্তারিত করতে হয়, তা হ'লে অবশ্যই মনে রেখো, সেখানে একটি পরিবর্ত **লেন্স টিউব** ব্যবহার করা বিধেয়।

প্রোফাইল-স্পট সম্পর্কিত বিস্তারিত এবং বিশদ আলোচনার পর শেষ কথাটা হলো: ফ্রেস্‌নেল-স্পট যেমন দেখা যায় আলোকরশ্মির বাইরেও আলো ছড়িয়ে পড়ছে, প্রোফাইল-স্পটে সেরূপ ঘটা সম্ভব নয়।

ফোকাস স্পট

বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের জন্য পুরনো দিনের অনেক কিছুই এখন অকেজো বলে বর্জন করা হয়। এই সূত্রে আলোকবিজ্ঞানেরও বেশ কিছু যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জামকে এখন প্রাগৈতিহাসিক বলে বর্ণনা করে কেউকেউ আত্মানন্দে মাৎ হন। অতীতে একদিকে সমতল এবং আলোকবিচ্ছুরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো— ওই ধরনের ফোকাস-স্পট একালে অপ্রয়োজনীয় বলে একেবারে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। এ-আলোর কিনারাগুলো ছিলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এর সঙ্গে প্রতিফলককে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার না করলে আলোকরশ্মি হতো অসমতল। কিন্তু ওই পুরনো ফোকাস-স্পটকে এখন খুবই অভিজ্ঞ আলোকবিজ্ঞানীকেও কাজে লাগতে দেখা যায়। তাঁদের অনেককে জিজ্ঞস করে জানা গিয়েছে, এর সঙ্গে আলোর ব্যবহার করে নাকি অসম্ভব উন্নত মানের ফল পাওয়া গেছে। এখন বলা হয়, সত্যি যদি আলোকরশ্মির নরম

প্রান্ত রচনা আবশ্যক তা হ'লে এক টুকরো ফ্রস্ট জেল ব্যবহার করে আলোকরশ্মিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে।

বীমলাইট

আলোকরশ্মি যখন বায়ুস্তর অতিক্রম করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রতিহত বা পতিত হয় তখন মূল জ্যোতিঃরেখা যাতে দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়—মঞ্চালোকের এই স্বভাব বা চরিত্র অথবা গুণগত দিককে নিয়ন্ত্রণের আওতায় বেঁধে রাখা খুবই কঠিন। এই আলোকরশ্মি যখন মঞ্চে অবস্থিত পাত্রপাত্রী কিংবা দৃশ্যের ওপর প্রতিফলিত হয়, মঞ্চে তখন কী ঘটছে তখন এটা লক্ষ্য করে থাকেন দর্শক। হ্যাঁ, কেবল এটাই। দর্শকের অবশ্য এমন কৌতূহল খুব কম ক্ষেত্রেই জন্মে যে, আলোটা কোথা থেকে আসছে, কিভাবে আসছে। ওঁরা রসগ্রাহী, রসটিকে পূর্ণমাত্রায় পেলেই সন্তুষ্ট। অবশ্য এটা অনুমান করা খুব শক্ত নয়, যে কোনো উপায় হোক, যেখান থেকেই হোক মঞ্চের আলোকসজ্জা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এবং নাট্যমুহূর্তের ভাবরসকে দৃষ্টিনন্দক করে তুলতে এই আলো সাহায্যও করছে অনেক। শিক্ষার্থীদের জেনে রাখতে হবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচরে আসা-না-আসাটা নির্ভর করে বায়ুস্তরের সঙ্গে মিশে থাকা ধূলিকণার পরিমাণের ওপর। এখানে ল্যানটার্নের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না বললেই চলে। তা হ'লে আলোকে আমরা কেমন করে দেখতে পাই? এর উত্তর আগে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার বলি, আসলে ধূলিকণায়, বায়ুস্তরের আর্দ্রতা এবং ধোঁয়া না থাকলে আলোকচ্ছটার ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসুবিধের সৃষ্টি হবেই।

বেশি কথা বলার তেমন দরকার দেখি না। আসলে **বীমলাইট** বলতে কী ধরনের আলোকযন্ত্র বা আলোকনিয়ন্ত্রক যন্ত্রকে বোঝায়, সেটা সকলের আগে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। ইংরেজিতে খুব সংক্ষেপে একে বলা হয়েছে: Lantern with no lens but with parabolic reflector giving a parallel beam. এই অল্প কয়েকটি কথায় ব্যাপারটা খুব ঝকঝকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারলো না বোধ হয়। বাংলায় এর বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া যাক: যে সব ল্যানটার্নের মাধ্যমে অন্যান্য ল্যানটার্নের তুলনায় আলোকরশ্মিকে উত্তম ও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করা সম্ভব, তাকেই বলবো **বীমলাইট**। মনে রেখো, এর গঠনপ্রণালীর আলাদা এক বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন: যেখানে ফ্রেস্‌নেল এবং প্রোফাইল-স্পটের আলোকরশ্মিগুলো মোচার আকারের মতন মঞ্চের যে-স্থানে ফেলা হয়—তার আকার ল্যানটার্নের দূরত্ব অনুযায়ী বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। কিন্তু বীমলাইটের রশ্মি না বাড়ে, না কমে। এর সঙ্গে কোনো লেন্সের ব্যবহারের কথা শোনা যায় নি; ভাবা তো দূরের কথা। তবে

একটি বিশেষ ধরনের প্রতিফলক (Reflector) এর সঙ্গে ব্যবহার করলে এই সমান্তরাল আলোকরশ্মির সৃষ্টি হতে পারে। বায়ুস্তরে যদি একটিও ধূলিকণা থাকে, এই রশ্মির মধ্যে তা প্রতিফলিত হবেই। কোনো কোনো দেশে এতে ১০০০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন বাল্ব কাজে লাগানো হয়; যেমন: ব্রিটেন। ইওরোপের অন্যান্য মঞ্চে ৫০০ ওয়াট বীমলাইট-এর সঙ্গে ২৪ ভোল্টের ল্যাম্প ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আমার কথা হলো, কোনো দেশকেই অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। আলোকবিজ্ঞানী তার কাজের প্রয়োজনে একে কাজে লাগাবে।

অনুসারক বা ফলো-স্পট

ইংরেজিতে বলা হয়েছে: Profile spotlight with an operator used to follow actors around the stage. ফলো-স্পটকে অনেকেই আলাদা যে নামে ভূষিত করে থাকেন, তা হলো লাইমস-স্পট (Limes spot). নাম থেকেই বোঝা যায় এই আলোর কাজ হলো মঞ্চ-এলাকাতে অভিনয়শিল্পীর বিচলন অনুযায়ী অনুসরণ করাই এর কাজ। প্রোফাইল-স্পটের মতন দেখতে অনেকটা। তবু এর কারিগরী গঠনে, লেন্সের দিক থেকেও এই স্পট কিছু স্বাতন্ত্র্যের দাবি তো করতেই পারে। এর ল্যানটার্নটি এমনভাবে সাজানো যে, ইচ্ছেমতনও এটিকে ওপর, নীচ দিকে ওঠানো বা নামানো যেতে পারে। অত্যন্ত গভীরতাপূর্ণ মঞ্চালোক সৃষ্টির কাজে ফলো-স্পটে ব্যবহার করতে হয় ডিসচার্জ ল্যাম্প। এ-থেকে বেশ কঠিন প্রান্তসম্পন্ন আলোকরশ্মির প্রতিফলন ঘটে থাকে। আমাদের দেশের তুলনায় বিদেশের নাট্যেই এর বেশি ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এদেশে তেমন এর ব্যবহার নেই বলে এই স্পটের গুরুত্বকে অস্বীকার করা নিতান্ত মূর্খামীর পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করি।

প্রয়োজনীয় বাল্ব (Lamps)

আধুনিককালে মঞ্চে ব্যবহৃত ল্যানটার্ন-এ প্রধানত তিন ধরনের ল্যাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে, লক্ষ্য করলে এটাই দেখা যায়। কিন্তু একজন মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে আগে জানতে হবে, কোন ল্যাম্পের আলোকশক্তি কতো এবং তার স্থায়িত্বের পর্যায়গুলো কী কী। এটা জানা না থাকলে ল্যাম্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে। কারণ আমরা জানি, একটি ল্যাম্পের ব্যবহারের ফলে অথবা ব্যবহারের অভাবে পর্যাপ্ত আলোকশক্তি দিন দিন কমতে থাকে। আবার এমন ল্যাম্পও রয়েছে বহু ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও তার আলো অপরিবর্তনীয় থেকে যেতে পারে।

আমি প্রথমে যে তিন ধরনের ল্যাম্প-এর কথা বলেছি তার নামগুলো আগে থেকে বলে নেওয়া ভালো। (১) **টাংস্টেন**; (২) **টাংস্টেন-হ্যালোজেন**; (৩) **ডিসচার্জ**। এ-প্রসঙ্গে কেউ যদি প্রশ্ন করে, 'ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প' বা বাল্বকে কি মঞ্চমায়া রচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় না? এর সোজা উত্তর হবে: না। কেন? কারণ এই দীর্ঘ নলাকৃতি লম্বা ধরনের ল্যাম্প-এর আলোকরশ্মিকে মঞ্চে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা যায় যে, এই আলোর স্বচ্ছতা প্রখর নয়?

বাল্ব আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কজন জানেন, বাল্ব আসলে বিজলী বাতির স্থায়ী চিমনীমাত্র: The glass covering of an electric light. কিন্তু এই চিমনির ভেতরে আলোর জ্বলা নেভা কেমন করে সম্ভব হয়? উত্তর: চিমনির ভেতরে থাকে সূত্রবৎবাহী একটি শিখা-বিশেষ, যাকে বলা হয় **'ফিলামেন্ট'**। ইংরেজিতে একে বলা হয়: A thread of conductor in electric bulbs. এই দুইয়ে মিলে আমরা একটি সম্পূর্ণ ল্যাম্প প্রত্যক্ষ করি।

ডিসচার্জ ল্যাম্প: এ-ল্যাম্পের আলোচনাটি আগে করে নিলে অন্যান্য বিশদ ব্যাপ্যার পক্ষে সুবিধা হয়। এর আলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা যায় না। এই অপরিবর্তনীয় আলোটি মঞ্চে আলোকসম্পাতের কাজে লাগে। একে সাধারণ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও **ফলো-স্পট** অথবা **সিনিক প্রজেক্টর** (Scenic Projector) এর সাহায্য নিলে ওই আলোকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব। মাঝারি বা বড় ধরনের মঞ্চ না হ'লে এর ব্যবহার সঠিক হবে না।

টাংস্টেন ল্যাম্প: বাসায়, বাড়িতে আমরা যে ধরনের বাল্ব ব্যবহার করে থাকি এই ল্যাম্প তার সমগোত্রীয় অনেকটাই। কিন্তু মঞ্চে এর ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, কারণ, এর আলোক-বিচ্ছুরণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। অস্বাভাবিক উত্তাপ থেকে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে টাংস্টেন ল্যাম্প ব্যবহার করলে সেই সব সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। ল্যানটার্নের সঙ্গে ফিলামেন্ট যাতে যথাযথভাবে সূক্ষ্ম সঙ্গতি বজায় রেখে আলোক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে কারণেই আধুনিক স্পট-লাইটের ল্যাম্পে বিশেষ ধরনের একটি টুপি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যাকে বলা হয়, **প্রিফোকাস ক্যাপ**। এ-আলো ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এর আয়ু ধরা হয় হাজার ঘণ্টা থেকে ৫০ ঘণ্টাতক। ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য এর আয়ু আরও কম হতে পারে। এর আকার সাধারণ আকার থেকে কিছু বড়ো। এর বাল্বটি বড়ো কেন করা হয়? কারণ মঞ্চে ব্যবহার করার প্রয়োজনে একে অধিক শক্তিসম্পন্ন করার জন্য ফিলামেন্ট আর বাল্ব-এর সীমা মধ্যেকার দূরত্বকে না বাড়ালে ফিলামেন্ট গলে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। এ-ছাড়া

এই ল্যাম্পের মধ্যে 'আর্গন গ্যাস' ভরে দেওয়ার ফলে এর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে অনেক। ৫০০ ওয়াটের একটি 'টাংস্টেন ল্যাম্প' কেবল যে বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় আলো দেয় তা নয়, এখানে এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে, যার দ্বারা এর আধারকে খুশিমতন নাড়াচাড়া এবং সোজা বাঁকা করা সম্ভব। স্বাভাবিক না হলেও টাংস্টেন ল্যাম্প-এর আলো কমানো বাড়ানো যেতে পারে। এবং তা নির্ভর করে বিদ্যুৎ প্রবাহের ভোল্টেজের নিয়ন্ত্রণের ওপর। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বাল্ব-এর নীচের দিকের অভ্যন্তরে অভ্রের আস্তরণ থাকে। কেন থাকে? কারণ এই আস্তরণ ওপরের তাপকে আটকে রাখে। সুতরাং ফিলামেন্টের বিপদ অনেকটা তো কাটেই, তা ছাড়াও নাড়াচাড়া করলে ফিলামেন্টের কোনো ক্ষতি হয় না।

টাংস্টেন হ্যালোজেন ল্যাম্প: টাংস্টেন ল্যাম্পের আলোকবিচ্ছুরণ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায় কিন্তু টাংস্টেন হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলো শেষ পর্যন্ত একই থেকে যায়। ১০০০ বা ততোধিক ওয়াটের নতুন ল্যানটার্নে এই ল্যাম্প একটি মাত্রাসম্পন্ন সংযোজন। এর একটি সুবিধের দিকও রয়েছে। আকারের দিকে থেকে এই ল্যাম্প ছোট আর এর লেন্সের মধ্যে কোনোরকম জটিলতা থাকে না। এর যান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্মও সরল। কিন্তু এর দ্বারা নানা রকমের আলোর আকৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব। লম্বা, খাটো, পাতলা, গভীর—যেমন খুশি আলোর রূপারোপ এর দ্বারা সম্ভব। অবশ্য তার জন্য বিশেষ ধরনের কলা-কৌশল অবশ্যই থাকা চাই।

ফিলামেন্ট গলে যাবার সমস্যা যেখানে প্রবল সেখানে টাংস্টেন হ্যালোজেন ল্যাম্প আকারে ছোট হ'লে বাল্বের প্রান্ত ফিলামেন্টের দূরত্ব কমে যাওয়ার ফলে কি ফিলমেন্টকে যথাযথ রাখার ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকা সম্ভব? এরকম একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে। যদি ওঠে, তার উত্তরে বলা হয়েছে: হ্যালোজেনকে বাষ্পে আনতে হ'লে উচ্চমানের তাপাঙ্ক প্রয়োজন। 'ইনার্ট গ্যাসের' সঙ্গে প্রয়োজন অনুপাতে ফিলামেন্ট জাতীয় বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাল্বের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়। এবং এ ধরনের আরও কিছু ব্যবস্থা করা থাকেই, যার ফলে ফিলামেন্ট গলে যাওয়ার সম্ভাবনাকে আপাত দূরত্বে রাখা সম্ভব হয়েছে।

ছোটখাটো মঞ্চের ক্ষেত্রে এই ল্যাম্প অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উপযুক্তও বটে। আয়ুর মাপ হিসেব করলে কিন্তু দামের দিক থেকে এই ল্যাম্পের ব্যবহারই আসল কম খরচে গিয়ে দাঁড় করায়। এখানে একটা কথা জরুরী বলে মনে করা হয় যে, দীর্ঘকাল অব্যবহৃত থাকলে এই ল্যাম্প কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনে বাধাও দিতে পারে। এ-জন্য সব

সময় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিফলক (Refleetor) এবং লেন্সে যেন ধুলো ময়লা জমতে না পারে। অবশ্য এখন এই আলোকে ডাস্টপ্রুফ করার চেষ্টাও চলছে।

যেমন : (ক) **প্রজেকটার ল্যাম্প ; (খ) রিফ্লেকটার ল্যাম্প ; (গ) নন-ফিলামেণ্ট ল্যাম্প ; (ঘ) কার্বন আর্ক ; (ঙ) মেটাল আর্ক ; (চ) আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প ; (ছ) প্রিফোকাস ও বাইপোস্ট হোল্ডার ল্যাম্প।** এই অতিরিক্ত অথচ প্রয়োজনীয় ল্যাম্প প্রসঙ্গিত ও বিশদ আলোচনা আমি অন্য পরিচ্ছেদে আলাদা ভাবে করলাম—যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যেক ল্যাম্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কিত জ্ঞান পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছন্দ হয়ে আসতে পারে।

৭.

মঞ্চালোবিজ্ঞানের সাজসরঞ্জাম—(২) ইনটেনসিটি কনট্রোল, ডিমিং পদ্ধতি, রিমোট কন্ট্রোল, চ্যানেল ও সময়ের হার, টুয়েন্টি ওয়েস, ক্রস ফেড, মাস্টার কনট্রোল, নব, কিউ, কিউস্টেটল্‌, প্রিসেটিং, মাস্টার, চেক, বিল্ড, সময়জ্ঞান, ম্যানুয়েল সিস্টেম, ডিমার লোড,...

ইনটেনসিটি কন্ট্রোল বা আলোর গভীরতার নিয়ন্ত্রণ: মঞ্চালোক-বিজ্ঞানের অতি দ্রুত অগ্রগমন এবং নতুন নতুন সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কারের কাজগুলো এই বিজ্ঞানের সকল শাখাকেই সমৃদ্ধ করেছে। সে সব আবিষ্কারের কথা এবং বিবরণ কোনো-না-কোনোভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় কিন্তু তার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আমরা থেকে যাই সেই অন্ধকারেই। মঞ্চে আলোর আল্পনা আঁকতে বা বলা যেতে দৃশ্যদীপন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্য **ডিমিং পদ্ধতি** (Dimming system) অনেকগুলো বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছে। ইলেকট্রনিক এই নতুন আলোর দিশারী। বিদেশের 'বখ্যাত রঙ্গগৃহগুলোতে এখন আর আগের মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলার মতন দৈহিক পরিশ্রম করতে হয় না এ-ক্ষেত্রে। এখন এসেছে ইলেকট্রনিক পরিচালিত টেবিল, বাক্স, এমন কি হাতে করে নিয়ে যাবার মতন 'লাইট মুভেবল বক্স'। এখানে কাজ করে কেবল হাতের আঙুলগুলোর ডগা। এর সাহায্যে কেবল বোতাম টিপে সমগ্র আলোক-ব্যবস্থার কাজটি বিজ্ঞান এবং শিল্পসম্মতভাবে সমাধা করার পথ খুলে গিয়েছে। নাট্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নাটক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন এমন সব নতুন চিন্তার আবির্ভাব ঘটছে যে, নানা ধরনের যান্ত্রিক ব্যবহার মঞ্চালোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবশ্যিক না হয়ে পারে নি।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে, ইলেকট্রনিক ডিমিং সিস্টেম যে পুরনো প্রচলিত পদ্ধতিকে একেবারে ধুয়েমুছে সাফ করে দিতে পেরেছে তা বলা যায় না। পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানে অতোখানি অগ্রবর্তীর ভূমিকা কি নিতে পেরেছে সব দেশ ? পারে নি। এমন কি যেখানে ইলেকট্রনিক সদম্ভে কাজ করে যাচ্ছে, বিদেশের বহু ছোট ছোট রঙ্গালয় এখনও পর্যন্ত

ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি। কাজেকাজেই, এখনও বেশিরভাগ রঙ্গশালাতেই দৈহিক, কায়িক শ্রম-নির্ভর মঞ্চালোক-দীপন-পদ্ধতি চালু রয়েছে। এখনও হাত পা হাঁটু কনুই এমন কি কপালের সাহায্যেও মঞ্চে আলোকনিয়ন্ত্রণের জন্য ডিমারকে কাজে লাগাতে হয়।

সে যাই হোক, এবার মঞ্চালোক-ক্রিয়ার সূক্ষ্মতা ও গভীরতা কিভাবে, কতো স্বচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, সে প্রসঙ্গে আসছি :

রিমোট কনট্রোল বা দূর থেকে মঞ্চালোক-নিয়ন্ত্রণ

মঞ্চে আলোকসম্পাত নিয়ন্ত্রণের বা নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির মূল কাজগুলো কী কী? উত্তর : (ক) মঞ্চে ব্যবহৃত বিভিন্ন কোণ, কেন্দ্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ল্যানটার্নের মাধ্যমে পরিমাণ মতো আলোকরশ্মি সরবরাহের জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্র থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা ; (খ) প্রত্যেকটি ল্যানটার্নে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ-নির্ভর মঞ্চায়িত নাট্যের দৃশ্যাবলী, নাট্যক্ষণ, কম্পোজিশন ও পিকচারাইজেশনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়নজনিত জ্যোতিঃরেখা-বলয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

যে-ব্যক্তি মঞ্চালোকবিজ্ঞানী অর্থাৎ মঞ্চালোকনিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠিটি যার হাতে, সে যদি স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দৃশ্যের প্রয়োজনীয় সর্বাংশকে দেখতে না পায় তা হ'লে তার পক্ষে কাজটিকে সুন্দর, সার্থক, শিল্পসম্মতভাবে করে ওঠা দুষ্কর। এ-জন্য মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণের কাজকর্মের জন্য এমন একটি স্থান থাকে বা থাকবে—যাতে সে প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে পারে।

পুরনো ধরনের যে বৈদ্যুতিক বোর্ড থেকে আলোক-নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এতোকাল, বা এখনও হচ্ছে, সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ এবং ভারী বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজটি একই সঙ্গে চলতো এবং এখনও চলে। অর্থাৎ একটি বোর্ড থেকেই এই দু'টি কাজ চালানো হয়। সাধারণত ওই বোর্ডটি মঞ্চের বাইরে একটা সুবিধে মতন জায়গায় বসানো হতো। কারণ স্বল্পদৈর্ঘ্য বৈদ্যুতিক তার-এর সাহায্যে মঞ্চের জন্য ব্যবহৃত ল্যানটার্নগুলোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কাজ যাতে সহজ হয়ে উঠতে পারে। ডিমার-বোর্ড হয়তো রঙ্গগৃহের পেছন দিককার একটি ঘরে স্থাপন করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু তাতে অসুবিধেও কিছু কম ছিলো না। মঞ্চের সঙ্গে এর যোগাযোগ রাখতে প্রচুর বৈদ্যুতিক তার-এর প্রয়োজন হয়ে পড়তো। ভারী ভারী যন্ত্রপাতিগুলো চালাতে নানা ধরনের কষ্টসাধ্য কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হতো। তা ছাড়াও অন্য একটি সমস্যা থেকেই গেলো। সমস্যাটি হলো, পেছন দিক থেকে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর পক্ষে মঞ্চের বিশদ ভালোভাবে দেখার সম্ভাবনাও কম।

তার মানে ওই অবস্থায় মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর পক্ষে কাজ করা কঠিন—যেহেতু সে তখন যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণে এতো ব্যস্ত যে, তার পক্ষে সব দিক সমানভাবে সামাল দেওয়া হয়ে পড়ে ভয়ঙ্কর কঠিন কর্ম।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতির কণ্ট্রোল মূলত নির্ভর করে তার বোর্ডের দু'টি অংশের ওপর। এর একটি অংশের মাধ্যমে ডিমার-বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। জেনে রাখতে হবে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এটি নির্বাচিত এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী এক সুবিধেজনক স্থানে স্থাপিত। দূরে রাখা এক টেবিল থেকে এই ডিমার-বোর্ডটি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু মূল কেন্দ্র থেকে খুব ছোট্ট একটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে ডিমার-বোর্ডে সংকেত পাঠানো হয়ে থাকে, ঠিক সে কারণেই এদের মধ্যে যোগাযোগ-রক্ষাকারী তারগুলো যথাসম্ভব হাল্কা এবং দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন। তার মানে আধুনিক মঞ্চালোক-নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতিগুলো এমন একটি জায়গায় বসানো উচিত—যেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও আলোকনিয়ন্ত্রণের কাজ দুইই হওয়া সম্ভব।

চ্যানেল, সময়ের আনুপাতিক হার ইত্যাদি

চ্যানেল-এর হুবহু বাংলা পরিভাষা করা শক্ত। এবং দু'একটি ক্ষেত্রে যাওবা চেষ্টা-চরিত্তির করে একটি শব্দ দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছে, তা সহজবোধ্য ও স্বচ্ছন্দ নয় বলে এখানে আসল শব্দটাকেই বহাল রাখছি। চ্যানেল-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: A Complete Stage circuit (Q. V.) including a dimmer. এখানেই কি থামবো? নাকি থামা চলে? শিক্ষার্থীদের তো অন্তত জানা দরকার 'সারকিট' কথাটার বিশদ ব্যাখ্যা। আমি আসল আলোচনার জগতে পা দেবার আগে সারকিট কথাটার ব্যাখ্যাটাও করে নিতে চাই: A Complete path from the electrical supply to the lantern. When such a path includes a dimmer, it should be called channel, but the word 'circuit' is often used loosely to include channel.

এবার আসা যাক বিশদ আলোচনায়। কণ্ট্রোল চ্যানেলের মধ্যে কী কী থাকে এবং তাদের কাজই বা কেমন ধরনের—এটা না জানলে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাজে, উপলব্ধিতে, প্রয়োগে ও নতুন চিন্তার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। উত্তরে বলি, কণ্ট্রোল চ্যানেল-এর মধ্যে রয়েছে বা থাকে: (১) দূর থেকে আলোকনিয়ন্ত্রণের কাজ চালাবার জন্যে একটি ভারোত্তলন দণ্ড। আলোর গভীরতা ও সূক্ষ্মতা পরিবর্তনের জন্য এর ব্যবহার প্রয়োজনীয়; (২) ডিমারের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বৈদ্যুতিক তার; (৩) নিশ্চিতভাবেই ওই 'ডিমার'; (৪) রক্ষাকারী ফিউজ;

(৫) অত্যন্ত বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে এমন বৈদ্যুতিক তার—যা ডিমার থেকে মঞ্চের একটি সকেটে যুক্ত হয় ; (৬) এবং ওই [illegible]টি সকেট কতগুলি বা অনেকগুলো সকেট। এই সব চ্যানেলের প্রত্যেকটিই নির্দিষ্ট একটা বিদ্যুতের পরিমাণকে কাজে লাগাতে পারে। এবং প্রত্যেকটি চ্যানেলেরই এক অথবা একাধিক ল্যানটার্নের বৈদ্যুতিক তার বহন করার ক্ষমতা থাকে। অবশ্য এই বৈদ্যুতিক তার বহন করার ক্ষমতা নির্ভর করে চ্যানেলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তারই ওপর। এই নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিকে কখনও কখনও 'সারকিট্স' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এবং এর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রায়ই X-ways নামে পরিচিত। এই x কেই চ্যানেলের একটি সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। যেখানে এই পদ্ধতিতে ২০টি চ্যানেল থাকে সেখানে এটিকে বলা হয় "20 way".

ইঙ্গিত ও তার বিভিন্ন অবস্থা (Cue, Cue-States)

আলোর পরিবর্তন মানেই হচ্ছে আলোকরশ্মির গভীরতা বা সূক্ষ্মতার পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে অবশ্য বলা হয় cue (কিউ)। আর এই আলোর পরিবর্তনের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থির অবস্থাকে বলা হয় 'কিউ-স্টেটস' বা ইঙ্গিতের বিভিন্ন অবস্থা। ফ্রেডরিক বেন্থাম এর ব্যাখ্যা করেছেন: This is the signal given by the stage manager (or taken directly from the action on the stage) to carry out a plotted change of lighting. The change may be slow or fast. A cue is of course not restricted to lighting.

মনে রাখতে হবে, আলো যতোক্ষণ মঞ্চের কাজে নিয়োজিত থাকে ততোক্ষণই তাকে আমরা বলে থাকি 'কিউ'। এবং যখনই আলো তার কাজ থেকে বিরতি লাভ করে তখন তাকে বলা হয় 'কিউ-স্টেটস্'। যখন চ্যানেলগুলো ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে তখন ওই কিউকে 'বিল্ড' বলার রীতি প্রচলিত আছে। আবার যেখানে আলোকচ্ছটার ঔজ্জ্বল্য কমে যায় বা কমতে থাকে তাকে বলা হয় 'চেক' (check)। এই বিল্ড আর চেককে আবার 'ফেড-আপ', 'ফেড ডাউন'ও বলা হয়ে থাকে। এখানে তা হ'লে বাকি থাকলো 'ক্রস-ফেড' এর বিশ্লেষণ। শিক্ষার্থীদের জানাই, একটি কিউ যেখানে কিছু চ্যানেলের দ্যুতিদান করে এবং সেই দ্যুতি বাড়ে ও কমে তাকে 'ক্রস ফেড' (Cross Fade) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

কণ্ট্রোল ডেস্কের ভারোত্তলন দণ্ড (Pre-Setting)

মঞ্চালোক-নিয়ন্ত্রণ-ডেস্কে যদি কয়েকটি মাত্র চ্যানেল থাকে তবে একমাত্র অতি তৎপর মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর পক্ষেই কিউ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই অতি

তৎপর আলোকবিজ্ঞানী নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে তাই বেশিরভাগ ভারোত্তলন দণ্ডগুলোকে দিয়ে খুব আস্তে আস্তে 'চেক' এবং 'বিল্ড'-এর কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। যদি সেকেণ্ডে একটি ক্রসফেড্ দরকার হয়, তখন পড়তে হয় বিপদে। এই সমস্যাকে সহজতর করার জন্য, নানা পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করা হলো 'প্রিসেটিং' পদ্ধতির—'A Preset must have a minimum of two controls to each channel so that an alternative choice is possible. Such controls must be duplicates both as to size and facility. A control with three such controls is then a three preset."

তার মানে মঞ্চে আলোকসম্পাতের সব দিক পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা থাকে। প্রিসেট কন্ট্রোল ডেস্কে প্রত্যেকটি চ্যানেলকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক ভারোত্তলন দণ্ড যুক্ত করা হয়। কম পক্ষে একটি চ্যানেলের দু'টি দণ্ড তো বটেই। নইলে থাকবার কথা তিনটির। ক্ষেত্র বিশেষে এর বেশি ভারোত্তলন দণ্ড যে ব্যবহৃত হয় না তা বলা যায় না। এ-রকম কয়েকটি ভারোত্তলন দণ্ডই প্রিসেট নামে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই প্রিসেটকে নিয়ন্ত্রণ করে কোন পদ্ধতি ?

উত্তর : **মাস্টার** (Master)। এখানে জানবার বিষয় হলো, যখন এই প্রিসেট, ডেস্কের শূন্য '০' সংখ্যায় অবস্থান করে, তখন কিন্তু ডিমারের কোনো কাজ থাকে না বা ডিমার কাজই করে না। ওই সময়ে প্রিসেটের চ্যানেলে যে ভারোত্তলন দণ্ডগুলি থাকে—তাদের নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে যায়। এ-ছাড়া মঞ্চের ল্যানটার্নগুলিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও চ্যানেলের থাকে না। সে কারণেই ভারোত্তলন দণ্ড প্রিসেটের এমন একটি স্তরে স্থাপন করতে হয়, যে স্তরে 'কিউ-স্টেটস্' স্থাপিত রয়েছে। এর ফলে কিউ-এর পক্ষে কিউ স্টেট্স্ নির্ণয়ের কাজ সহজ হয়ে থাকে। কিন্তু কী ভাবে করতে হবে এই কাজ ? জেনে রাখো : এক হাতে মাস্টারকে শূন্য সংখ্যা থেকে পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে যেতে হবে।

প্রিসেট সব সময়েই নিয়মকে অনুসরণ করে চলে। ধরা যাক, প্রিসেটে অবস্থিত মাস্টারকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে একই সঙ্গে একাধিক প্রিসেটকে কর্মরত রাখা গেলো, তা হ'লে ওই চ্যানেলের ঔজ্জ্বল্য হবে সর্বাধিক।

প্রিসেট-বোর্ডে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। ধরা যাক একটি কিউকে সময় বিশেষে ভাগ করার ক্ষেত্রে এবং একটি কিউ-এর ওপর আর একটি কিউ স্থাপন করতে প্রিসেটকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। একাধিক সুইচের দ্বারা আলাদা আলাদা চ্যানেলকে দুই বা তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া

সম্ভব। তার মানে একটি চ্যানেলের জন্য কেবল একটি সুইচই নির্দিষ্ট। অন্য আরও একটি পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই পদ্ধতির নাম 'পিন ম্যাট্রিক্স' (Pin Matrix)। এর দ্বারা কয়েকটি শ্রেণীকে একসঙ্গে গ্রথিত করা হয়ে থাকে। একেই বলা হয় **শ্রেণীবিভাগ** (Grouping)।

কম্পিউটার কিন্তু এই জটিলতাকে অনেক সহজতর করেছে। কেন মঞ্চালোকবিজ্ঞানে কম্পিউটারের প্রয়োজন সে প্রসঙ্গ আগে আলোচনা করা হয়েছে।

সময়জ্ঞান

মঞ্চালোকবিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী 'সময়জ্ঞান' হলো কতোগুলি ভিন্ন ভিন্ন আনুপাতিক হারের সমষ্টি—যা অভিনয়শিল্পীর অভিনয়ের খুঁটিনাটির মতনই হুবহু বলে মনে করা হয়। মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে বুঝে বুঝে কাজ করতে হয় এবং তা অবশ্যই অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া দরকার। কারণ সময়ের অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য নাট্যপ্রযোজনাকে তো বটেই, দর্শকদের মধ্যেও প্রাণসঞ্চার করতে পারে। কিন্তু জানা দরকার, অভিনয়কালে আলোক-প্রবাহের ওপর গভীর মনোযোগ দেওয়ার পদ্ধতি। আমরা জানি কিউ-এর মধ্যবর্তী সময়ে সবকিছু পরিকল্পনামাফিক সম্পাদন করাটাকে সহজ করে তোলে প্রিসেটিং। যখন 'কিউ' শুরু তখন অপারেটরের কাজ হয় সূক্ষ্মতম সময়ে পার্থক্যের ওপর সযত্ন দৃষ্টি রাখা। ধরা যাক একটি কিউ সময় নিলো ১৫ সেকেণ্ড। এটা কিন্তু সঠিক গাণিতিক নয়। এর কমবেশিও এক আধটু হতে পারে। 'কিউ'টি ধীরে ধীরে শুরু হতে পারে, আবার গতিসঞ্চার হতে পারে এর মধ্যে। এভাবেই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছনো সম্ভব। আবার এর বিপরীতটাও যে হতে পারে না সে কথাও জোর গলায় বলা যায় না। তার মানে আসল কথাটি হলো এখানে সময়জ্ঞান।

দৈহিক শ্রমদানের পদ্ধতি (Manual system)

হস্তচালিত ডিমিং-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে কোন উপায়ে? সেখানে আসল ব্যাপারটাই হচ্ছে সময়জ্ঞান ও সচেতনতা। এটাই মুখ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। বাস্তবিকপক্ষেও এটাই সত্য। কিউগুলোর মাঝের স্তরে কাজ করে যাওয়ার সময়টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যখন কিউ শুরু হয় তখন কোন এবং কী অ্যাকশন গ্রহণযোগ্য তা নির্ভর করে স্মরণশক্তির ওপর। এবং এর ওপর নির্ভর করেই কাজগুলো করে যেতে হবে। অনেক সময় এমন ঘটে যে, ধরা যাক দশ সেকেণ্ডের একটি কিউ শুরু করা হয়েছে। এবার বিভিন্ন ভারোত্তলন দণ্ডগুলিকে বিভিন্ন অবস্থায়, পরিবেশ অনুযায়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেলো পাণ্ডুলিপিতে চিহ্নিত নির্দেশিকার ওপর নজর দেবার

বিন্দুতম অবকাশ পর্যন্ত পাওয়া গেলো না। তখন কী হবে? কল্পনা বা খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করতে গেলে তো সবকিছুই মাটি হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে স্মরণশক্তির প্রয়োজন। মঞ্চালোকসহ মহলা দেবার সময় কীভাবে কোন কাজ করা হয়েছিলো, হুবহু তা স্মরণের পর্দায় গেঁথে রাখতে হবে। এ-দেশে অবশ্য লাইটিং রিহার্সালকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই প্রবণতা অত্যন্ত খারাপ। আলোকে বাদ দিয়ে আধুনিক নাট্যের অস্তিত্ব কল্পনা করাই কঠিন। এর ওপর যদি বিভিন্ন ডিমার একই সঙ্গে কাজ করতে থাকে তা হ'লে পাণ্ডুলিপি ফলো করার অবকাশ একেবারেই থাকা সম্ভব নয়।

হস্তচালিত ডিমার-এর ক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি রয়েছে তিনটি: স্লাইডার-ডিমারের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় এক প্রস্ত সাধারণ নব্ (knob)। অপেক্ষাকৃত দূরত্ব সম্পন্ন রেজিস্ট্যান্স ডিমারের ওপর এই নবগুলি কাং ক'রে বসানো থাকে। বারোটিরও বেশি এই নব্ এভাবেই অপারেটরের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। তবু এখানে স্মরণ রাখা দরকার, যেখানে এ-ধরনের স্লাইডার নব্ ছ-টিরও বেশি ব্যবহৃত হয়—তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা কিন্তু অতো সহজ নয়। আরও উচ্চমানের ডিমার পদ্ধতিতে কয়েকটি হাতলের ব্যবস্থা থাকে। এই হাতলগুলিও প্রয়োজনবোধে ব্যবহৃত হতে পারে।

ডিমারের বিদ্যুৎ সরবরাহজনিত ক্ষমতা (Dimmer Load)

আলোর গভীরতা ও সূক্ষ্মতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ডিমার ৬০ ওয়াট থেকে সর্বাধিক দুই কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। যদি ডিমার খুবই বৃহদাকার হয় তবে এর পরিমাণ পাঁচ কিলোওয়াট পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু সকল মঞ্চেই ইলেকট্রনিক ডিমার থাকে না। সেখানে পুরনো প্রচলিত ডিমারের মাধ্যমে কাজ করতে হয়। এই প্রচলিত ডিমারের জায়গায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বড়ো একটা দেখা যায় না। ব্যবহার করাও দুষ্কর। সুতরাং এ ধরনের পুরনো ডিমার তার নির্দিষ্ট সীমার বাইরে অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করতে পারে না। উদাহরণ: ২ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ডিমার থেকে ১ কিলোওয়াট ল্যানটার্নের নিয়ন্ত্রণ কিছুতেই যথাযথ হতে পারে না। আবার ৫০০ ওয়াট ল্যানটার্নের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করাও সহজ কাজ নয়।

আসলে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিই মঞ্চালোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন যুগ, নব তরঙ্গ, নতুন মাত্রা এবং মাত্রা এনেছে। মঞ্চালোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতো জর্জরিত জটিলতা ছিলো সেখানে এসেছে প্রকৃত আলোর আল্পনা আঁকার কল্যাণ হস্ত। এর সঙ্গেই অনেক জাদু, আশ্চর্যজনক অনেক কারিগরী কলাকৌশল রয়েছে, যা দর্শকদের নানা উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দিয়েছে। এনেছে বিতর্ক, কৌতূহল, উপভোগের গভীরতা।

৮.

দৈহিক শক্তিদ্বারা বিদ্যুৎকে মঞ্চালোকবিজ্ঞানের কাজে লাগানো :
রিগিং, বুল, উইংনাট, নিরাপত্তা, বৈদ্যুতিক তারের ব্যবহার, বার, বুম, ফিউজ, সারকিট, প্যাচিং, অস্থায়ী তার-এর ব্যবহার, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রক্রিয়া, ডিপ...

মঞ্চালোকবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন করে আর বলার কিছু থাকলো কী ? এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তো আগেই করা হয়েছে। ওই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত, চিত্রিত করতে যে-সব যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম প্রয়োজনে লাগতে পারে তার বিশদ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। এবার এতো সব সরঞ্জামকে দৈহিক শক্তিদ্বারা বিদ্যুতের সাহায্যে কী ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে প্রসঙ্গ :

রিগিং

ইংরেজ কথাটা হচ্ছে 'রিগিং'—যার অভিধানিক অর্থ দড়িদড়া খাটানোর পদ্ধতি। এখানে ওই কথাটার অর্থ : ল্যানটার্নগুলোকে কোথায় কিভাবে টাঙানো হবে তার নির্দেশ। আসলে ল্যানটার্নগুলোকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে দৈহিক শক্তির প্রয়োগ যথাযথ হতে পারে। ধরা যাক **বল্টু** অথবা **উইং-নাট**—এগুলোও সেইভাবেই ব্যবহার করতে হয়। হালকা ধরনের ল্যানটার্নের জন্য যে বল্টুর ব্যবহার, তার মাপ হচ্ছে $\frac{3}{8}''$, আবার ভারী ধরনের জন্য ধরা রয়েছে $\frac{1}{2}''$ মাপের বল্টুর। সব ল্যানটার্ন এমনভাবে তৈরি করে রাখতে হবে, যাতে সেগুলো এই সব বল্টুর সাহায্যেই ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব। অবশ্যই লম্বভাবে। কেন, বলতো ? কারণটা হচ্ছে এই যে, যদি এগুলো কোণাকুনিভাবে ঝোলানো হয় তা হ'লে এদের কর্মশক্তি তো কমে যায়ই, জীবনীশক্তি পর্যন্ত হ্রাস পায় অনেক তাড়াতাড়ি।

ল্যানটার্নগুলো সমান্তরালভাবে টাঙাবার জন্য যে নল ব্যবহৃত হয় তার পরিমাপ $1\frac{1}{2}''$। এই ধাতব নল হয় সমান্তরালভাবে নয়তো লম্বভাবে স্থাপন করতে হবে। এ নলগুলিকে বলা হয় 'বার' বা 'পাইপ'। আর লম্বভাবে খুঁটির মতন ব্যবহৃত নলকে বুম (boom) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনেকটা হুক-এর মতন আংটার সাহায্যে ল্যানটার্নগুলোকে মঞ্চে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। আর সেটি আবার ধারণ করে থাকে বুমের

হাতল। দেওয়ালে স্থায়ীভাবে মারার জন্য নানারকম ব্র্যাকেট কিনতে পাওয়া যায়। এর দ্বারা খুব সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যই কেবল সাধিত হতে পারে। এ-ছাড়া গোঁজের ওপর ঘূর্ণায়মান আংটাও পাওয়া যায়—যা মইয়ের সাহায্যে ওপরে উঠে ঠিকঠাক করে নেওয়া বেশ কষ্টকর। মঞ্চগৃহের মধ্যে যে-সব ল্যানটার্ন ঝুলিয়ে রাখা উচিত ব্র্যাকেটের ব্যবহার কেবলমাত্র সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকা দরকার। প্রয়োজনে নাট্যাভিনয়ের সময় এগুলো সহজেই ঘোরানো ও ফেরানো যায়। যখন কোনো ল্যানটার্নকে মঞ্চের মেঝেতে অর্থাৎ মঞ্চপীঠ তথা বেদীতে কোনো স্ট্যাণ্ডের ওপর স্থাপন করা হয় তখন উইংনাট-এর জায়গায় কাঠের ছিপিমতন একটা জিনিস বসানো হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় স্পিগট (spigot)। তখন এগুলোকে $\frac{3}{8}''$ এবং $\frac{1}{2}''$ মাপ-এর তৈরি করে নিতে হবে—যাতে দু'রকম মাপের ল্যানটার্নের বল্টুর সঙ্গেই এ-গুলো সহজেই আটকে রাখা সম্ভব হয়।

নিরাপত্তা

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মঞ্চে অভিনয়শিল্পীর কাজের সহায়তার জন্য যে-সব ল্যানটার্ন থাকে বা ব্যবহৃত হয়—তা থেকে বিপদের একটা সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়। বিপদটা কিসের? ঝোলানো ল্যানটার্ন খুলে পড়ে যাওয়ার। এ-কারণে ল্যানটার্নগুলো এমন-ভাবে তৈরি করা হয় যাতে বিপদের সম্ভাবনাকে এড়ানো যেতে পারে। তবে অসাবধান-তার ফলে যদি বিপদ বা বিপত্তি আসে—এ কারণে কাজ শুরু করার আগে প্রত্যেকটি সাজসরঞ্জাম ভালো করে দেখে নিতে হয়। পরীক্ষা করে নিতে হয় নাট-বল্টু ঠিকমতো আঁটা আছে কিনা। এ ছাড়া কী করতে পারি আমরা? ঝুলন্ত ল্যানটার্নগুলোকে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে নিতে পারি—যাতে সবকিছু আলগা হয়ে এলেও ল্যানটার্ন-গুলো খসে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না একেবারেই।

আলোকবিজ্ঞানের কাজ ও বৈদ্যুতিক তারের ব্যবহার

১. মঞ্চে আলোর কাজ করা—যাকে আলোর আল্পনা, মঞ্চালোকচিত্রণ, দৃশ্যদীপন ইত্যাদি যতো রকম আখ্যাতেই ভূষিত করা হোক না কেন, এ-কাজে বৈদ্যুতিক তার-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি সর্বাধিক। পথিক যেমন পথ না থাকলে গন্তব্য স্থানে পৌছতেই পারে না, এখানে বিদ্যুৎশক্তির অবস্থাও ঠিক একই রকমের। বলা যায়, এরা হলো, মঞ্চালোকবিজ্ঞান নামে একটি পূর্ণাঙ্গ দেহের শিরা উপশিরা। আমরা জানি, মঞ্চের কাজে সাধারণত আমরা যে বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করে থাকি—তার পথ ও পদ্ধতি হলো দুই রকমের। স্থায়ী মঞ্চের নিয়মিত অভিনয়-এর ক্ষেত্রে যেভাবে তার ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে

অস্থায়ী-ভাবে তা হওয়া কি সম্ভব? অন্তত সবগুলো আলোর ক্ষেত্রে? না। স্থায়ীভাবে বৈদ্যুতিক তার-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রের নিয়ম হলো: সেগুলো সব সময়ই সকেট-এর মধ্যে এনে তাদের বিস্তৃতির সমাপ্তি ঘটানো উচিত। এর ফলে ল্যানটার্নগুলোকে পরিষ্কার রাখার কাজ সহজ হবে। সাধারণ পেশাদারী মঞ্চে ২ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন চ্যানেলে যে সকেট মঞ্চালোকের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা হওয়া উচিত ১৫ এ্যাম্পায়ার ৩ রাউণ্ড পিন বি ই এস এ। ছোটখাটো মঞ্চের ক্ষেত্রে ১ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন চ্যানেল দরকার এবং এক্ষেত্রে ৫ এ্যাম্পায়ার ৩ রাউণ্ড পিন বি ই এস এ সকেট কাজে লাগে। এখানে একটি কথার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এবং তা হলো, সকল ধরনের যন্ত্র-পাতির ক্ষেত্রে ১৫ এ্যাম্পায়ার সকেটকে যাতে কাজে লাগানো যেতে পারে তার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবতে হবে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে মঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত প্লাগ পাল্টানো। বিদ্যুৎ-প্রবাহ নিরাপত্তার বাইরে চলে গেলে যে-তার সহজে গলে যায়, মঞ্চে ব্যবহৃত প্লাগের ক্ষেত্রে তেমন তার ব্যবহার করা কোনোমতেই উচিত নয়। ফিউজ-চেকিং বদলাবার কাজটা মঞ্চের একেবারে মেঝের দিক থেকেই করা হয়। এবং তা করার নিয়ম হচ্ছে এর একটি মধ্যবর্তী স্থান বেছে নেওয়া। মঞ্চে ব্যবহৃত ফিউজ সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো ডিমারের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু সে ডিমার উচ্চমানের ফিউজ হোল্ডার সমন্বিত হওয়া দরকার—যা সব ক্ষেত্রে কিনতে পাওয়া যায় না। এ-সব ফিউজ হোল্ডার একটা নির্দিষ্ট শক্তির ফিউজকে ধারণ করে রাখতে পারে।

একটি ডিমার-এর সাহায্যে একাধিক ল্যানটার্ন জ্বালানো যেতে পারে। মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর জানা থাকা দরকার, পাশাপাশি বসানো দু'টি সকেট-এ এসে একটি চ্যানেল সম্পূর্ণ হয়। যে-সব ল্যানটার্ন রঙ্গগৃহে ঝুলিয়ে রাখা হয়, সেগুলোকে এফ ও এইচ (FOH) বা Front of house বলে। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে: that part of the theatre used by the public, i. e. in front of the curtain but also taken in another context means lighting positioned in the auditorium and directed in the stage. এগুলোকে নাড়ানোচাড়ানো প্রায় হয়ই না কিন্তু মঞ্চে ব্যবহৃত ল্যানটার্নগুলোকে প্রয়োজনে বারবার নাড়াচাড়া করতে হয়। সে জন্যই রঙ্গগৃহে ব্যবহৃত ল্যানটার্নের সকেটগুলো ল্যানটার্নের খুব কাছাকাছি লাগানো হয়ে থাকে। এতে, অন্তত এই জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক তার-এর দৈর্ঘ্য কম হয়ে থাকে।

মঞ্চে যে-সব সকেট ব্যবহার করা হয়, সেগুলো পরিবর্তনযোগ্য তো বটেই এবং

ব্যবহারের দিক থেকেও অনেক সহজ। মঞ্চেরই একপাশে সকেটগুলো স্থাপন করা থাকবে। উঁচু জায়গায়, যাতে ঝুলন্ত ল্যানটার্নগুলোর ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধের সৃষ্টি না হতে পারে। অধিকাংশ মঞ্চেই দেখা যায় ঠিক বাঁদিকে ডিমার এবং সকেট-গুলো। এখানে বাম পার্শ্বে মানে কিন্তু দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো অভিনয়-শিল্পীর বাম দিক। আসলে দর্শক আসন থেকে ওটা হবে ডান দিক।

মঞ্চালোকবিজ্ঞানের কাজ করার জন্য যে সব 'বার' ব্যবহার করা হবে, তা অবশ্যই হবে ফাঁপা। কারণ তার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক তার ঢুকিয়ে যাতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। প্রত্যেক তড়িৎ প্রবাহের পথ, ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'সারকিট'—তার শেষ প্রান্তটি মঞ্চের দু'ফুট ব্যবধানে বার-এর ফাঁপা গর্তের মধ্যে স্থাপিত রাখা হয়।

মঞ্চভূমিতে যে-সব ল্যানটার্নকে কাজে লাগাবার জন্য স্থাপন করা হয়—তার সকেটগুলো মঞ্চের দু'দিকে স্থাপন করাই উচিত। অর্থাৎ মঞ্চ সমতলে। দৃশ্য পরিবর্তনের সময় প্লাগগুলোকে এক জায়গা থেকে খুলে অন্য জায়গায় লাগাতে হয়। মঞ্চের নীচের দিকে স্থাপিত সকেটগুলো নানা কৌশলে স্থাপন করা হয়। একে বলা হয়ে থাকে 'ডিপ' (dips).

মঞ্চে স্থায়ীভাবে বৈদ্যুতিক-তার ব্যবহারের বিশেষ কয়েকটি দিক থাকে : (ক) মঞ্চ পরিকল্পনাটি 'তার' ব্যবহার করার আগে করে নিলে ভালো হয়। কোন ধরনের মঞ্চে একে কাজে লাগানো হবে, একবার না একাধিকবার হবে, নাকি একই মঞ্চে দিন কয়েক পরে পরে বা সপ্তাহে নির্দিষ্ট একটি বার-এ হবে অথবা হবে এক মঞ্চ থেকে অন্য মঞ্চে—এ-সব পরিকল্পার অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। এবং সেভাবেই বৈদ্যুতিক তার-এর প্রয়োজন, বিস্তার ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থিরীকৃত হবে ; (খ) মঞ্চে এমনভাবে বৈদ্যুতিক তার-এর ব্যবহার কতে হবে—তা যেন স্টেজ-ওয়্যারিং-এর সাধারণ মানের নীচে না থাকে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ইলেকট্রিসিয়ান এর পরামর্শ নিলে বিষয়টি যথাযথ এবং বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে। যদি স্বাভাবিক ইলেকট্রিসিটির হঠাৎ অভাব দেখা যায় এবং মঞ্চালোক-কর্মের জন্য বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উদ্যোগ নিতে হয়—সে সম্পর্কিত ভাবনাগুলোর পর্যায় কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে থাকা চাই-ই চাই ; (গ) সুবিধে ও অসুবিধে দুটি দিক-এর কথা ভেবে নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করা দরকার। বৈদ্যুতিক তার-এর স্টক এমন থাকতে পারে যে তাতে বিশেষ ধরনের তার-এর অভাব দেখা দিলো। তখন যেমন তেমন বৈদ্যুতিক তারকে জুড়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক আলোকবিজ্ঞানীকেই অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে! এ-জন্য বৈদ্যুতিক তার-এর স্টক-এর দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনি দেখতে হবে অভিনয়-মঞ্চটি কোন শ্রেণীর। মানুষের মাঝখানে? ওয়ানওয়াল পদ্ধতির?

নাকি প্রসেনিয়াম ? এ-ছাড়াও বিদ্যুৎ বিষয়ক কিছু আইনকানুন থাকতেই পারে। সেটা জায়গা বিশেষে এক এক রকমের হ'লে আর একটা বিপদ মুখোমুখি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ-সব যদি মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর মাথায় না থাকে তবে অভিনয়কালীন অসুবিধের জন্য তাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন নাট্যনির্দেশক ; (ঘ) এই সমস্ত দিকে মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা না থাকলে বা ব্যবহারিক বিধি বিশদভাবে জানা না থাকলে তাকে অবশ্যই একজন দক্ষ ইলেকট্রিসিয়ানের পরামর্শানুযায়ী সব কিছু ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

২. এখানে **'প্যাচিং পদ্ধতি'** প্রসঙ্গটি আলোচনা না করে নিলে পরের বিশদালোচনার ক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা দিতে পারে। এই পদ্ধতিটি আসলে কী, সেটা আগে জানা দরকার। প্যাচিং পদ্ধতি হচ্ছে ডিমার আর তড়িৎপ্রবাহের বাইরের পথগুলোর মধ্যে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মতন ব্যবস্থা করা। আরও সহজ করে বলতে গেলে বলতে হবে: স্থায়ী বৈদ্যুতিক তার-এর প্রান্তভাগগুলো এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে প্রয়োজন হলেই সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যেতে পারে। এই সব তার-এর প্রান্তভাগ ডিমার-সকেট-এর সঙ্গে প্লাগ-এর মতন লাগিয়ে ব্যবহার করা বিধেয়। অথবা বলা যায়, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগকারী জ্যাক প্লাগ (Jack Plags) ও জিল-সকেট (Jill Sockets) লাগানো আধুনিক একটি ফ্রেমের মধ্যে বসিয়ে নিয়ে কাজ করা। তার মানে প্যাচিং পদ্ধতির আসল কাজ হচ্ছে এর দ্বারা নির্দিষ্ট সকেটের পথগুলো অতি সহজে এবং অত্যন্ত দ্রুত নির্বাচন করা সম্ভব। এই ব্যবস্থা থাকলে অস্থায়ী ওয়্যারিং-এর কাজকে নাট্যে অনেকটা কমিয়ে আনা যেতে পারে। মঞ্চটির আকার যদি গোল হয়, অথবা অর্দ্ধ-গোলাকৃতি তবে এই পদ্ধতির কাজ সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়।

৩. **অস্থায়ী বৈদ্যুতিক তার ব্যবহারের ব্যবস্থা:** এক্ষেত্রে যতোগুলি প্লাগ ব্যবহার করা হবে, তার ওপর দিকটা যেন রবার দিয়ে মোড়া থাকে আর সকেটগুলো যেন বেশ শক্ত এবং মজবুত হয়। কেন বলতো ? কারণ এর ফলে অতিরিক্ত ধকল সইবার শক্তি ওরা পায়। আর হঠাৎ পড়ে গেলে বা আঘাত পেলে অকেজো হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। এখানকার বৈদ্যুতিক তারগুলো নমনীয় রবার বা প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া থাকলে কাজের পক্ষে খুবই সুবিধে হয়। মঞ্চে অস্থায়ী তার-ব্যবস্থা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা:

(a) খোলা তার বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত তার, নিউট্রাল (Neutral) এবং আর্থ (earth) যেন যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা থাকে। এর প্রান্তভাগ যেন কোনো কারণেই খোলা বা অনাচ্ছাদিত না থাকে ; (b) তারগুলো যখন প্লাগ বা সকেট-এর মধ্যে

স্থাপন করা হয়, সেগুলি যাতে ভালোভাবে তার-আঁটা-ক্লিপ দিয়ে আঁটা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ; (c) তারগুলো সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং স্থাপন করার ব্যাপারেও পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে যতোটা সম্ভব সোজাসুজি তারগুলো স্থাপন করা সম্ভব হয় পরন্তু প্রত্যক্ষভাবে যাতে ল্যানটার্নের তাপ তাতে না লাগতে পারে। প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে পিভিসি টেপ দিয়ে তারগুলো আটকে দিতে পারলে কোনো শঙ্কা থাকে না ; (d) প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের কাজগুলো নিখুঁতভাবে করা হয়ে গেলে, আরও একবার চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ করা উচিত। যদি কোনো ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে তাহ'লে তা সংশোধন করে নেবার অবকাশ থাকবে। কী কী লক্ষ্য করতে হবে ? (১) তার-এর বাইরের আচ্ছাদন কোথাও যেন কাটাছেঁড়া, বা ফুটোফোটা না থাকে ; (২) প্লাগ আর সকেটগুলোর স্ক্রু ঢিলেঢালা হয়ে আছে কিনা। যদি সেরকম থাকতে দেখা যায় তা হ'লে তা খুলে নিয়ে, পরখ করে, শাস্তভাবে এঁটে দিতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ-প্রক্রিয়া

বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ব্যবহারের বাঁধাধরা নিয়ম থাকে। যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহের জায়গা থেকে বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিগুলোকে কমপক্ষে ৬´ ফুট দূরত্বে রাখতে হয় এবং এই পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপন করতে হয়। যে সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই স্থাপনের কাজ করা হয়, তা আসলে নিরাপত্তার আগাম ব্যবস্থা। মঞ্চের একদিক থেকেই আলোকসম্পাত-নিয়ন্ত্রণের কাজটি করতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু ছোট মঞ্চের ক্ষেত্রে এ নিয়ম মেনে কিছু করা সম্ভব হয় না।

মনে রাখতে হবে, মঞ্চের ওপরের দিকে যে-সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তার ওয়ারিং পদ্ধতি কিন্তু একটু আলাদা রকমের। সকেট-এর বাইরের পথগুলো, তার মানে, এগুলো যে বাক্সে থাকে, তার প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখা উচিত। কেন ? কারণ এর ফলে মঞ্চালোকবিজ্ঞানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এদের চট করে চিনে নিয়ে কোনো ক্ষেত্রে যদি 'প্যাচ-প্যানেল' স্থাপন করার প্রয়োজন থাকে তবে নির্দিষ্ট ডিমার প্রক্রিয়াকে 'জিল-সকেট' দিয়ে চিহ্নিত করে নিতে পারে। এবং 'জ্যাক প্লাগ'-এর নির্দিষ্ট মঞ্চ-অবস্থানকেও একই রকমভাবে চিহ্নিত করে নেওয়া দরকার। বিভিন্ন রঙকেও এ-কাজে লাগানো যেতে পারে।

দৃশ্যদীপনের নকশা রচনা—১ : পর্যায়-১, ২, ৩, ৪, ৫ ও সৃজনমূলক ভারসাম্য, FoH-এর কাজ ও তার ব্যাখ্যা, মঞ্চালোক নির্দেশনার খুঁটিনাটি, সংযমশীলতা, লাইটিং-লেআউট, ফোকাসিং, আলোকরশ্মির কিণারা স্থাপনের পদ্ধতি।

কোনো এক বিখ্যাত নাট্যদলের মহলায় যাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। গিয়ে অবাক। দেখলাম সেখানে বিখ্যাত এক মঞ্চালোকবিজ্ঞানী তাঁর যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং কর্মীদের নিয়ে মহলার সঙ্গে সঙ্গে আলোর আল্পনা এঁকে যাচ্ছেন। বলাই বাহুল্য মহলাটি সাধারণ মহলা ছিলো। এবং শীততাপনিয়ন্ত্রিত একটি সুবিখ্যাত মঞ্চে সকালের দিকে ঘটনাটি ঘটছিলো। মঞ্চালোকনির্দেশক অডিটোরিয়ামের সামনের সারিতে বসে অভিনয় প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং মাঝে মাঝেই উঠে চিৎকার করে তার কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন কোথা থেকে কোন আলোটি পড়বে, কোন জায়গাবে পড়বে এবং আলোকযন্ত্রগুলি কোন ক্ষণে কোন রঙকে প্রতিফলিত করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে সঙ্কোচ নেই ব্যক্তিগতভাবে আমার খুবই খারাপ লাগছিলো। কেন ? কারণ আচমকা মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর নির্দেশ স্বাভাবিকভাবে চলা মহলার স্বচ্ছন্দ গতি এবং স্বতস্ফূর্ততা সাময়িকভাবে শুদ্ধ করে দিচ্ছিলো। তারপর আবার সেই মহলা। অনেকটা খেই-হারানোর মতন হয়ে যাচ্ছিলো—যাকে সামাল দিতে গিয়ে নাট্যনির্দেশক ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। অনেক কষ্টে পাঁচটি ছয়টি দৃশ্য দেখার পর আর বসে থাকা সম্ভব হলো না। উঠতে হলো আমাকে। নাট্যনির্দেশক টি-ব্রেক দিয়ে আমার পেছন পেছন এলেন এবং অডিটোরিয়াম থেকে বেরোবার পর শুধোলেন, আমার হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ কি। অতএব আমাকে জিজ্ঞেস করতে হলো : এটা মহলার কোন দিন ? ভদ্রলোক জানালেন, এটা মাত্র তৃতীয় মহলা। তখন প্রশ্ন করতেই হয়, মঞ্চালোকনির্দেশক কি নাটকের পাঠগুলোর আসরে উপস্থিত ছিলেন ? সবিনয় উত্তর এলো, 'না।' তখন অনিবার্য প্রশ্ন করতে হয় : নাটকটির বিষয়বস্তু, বক্তব্য, সিনপ্লটিং, চরিত্রের কাজ, দৃশ্যের সময়, নাট্যমুহূর্ত, গতিবেগ ও গতিপথ সম্পর্কে তাহ'লে মঞ্চালোকনির্দেশক-এর কোনো ধারণাই আগে থেকে গড়ে তোলার বা নেবার সুযোগ হয়নি ? এবারও উত্তরটি যথারীতি একই হলো। অর্থাৎ 'না'।

প্রশ্ন : তাহ'লে উনি আলোর কাজটা করছেন কীভাবে ?

উত্তর : আজই নাটশেলে কাহিনীটা ওঁকে বলা হয়েছে।

আমি তাঁকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা সঙ্গত মনে করি নি। কারণ তাঁর যে সময়টা চলে যাবে তা কিছুতেই আর ফিরে আসবে না। তিনি তাঁর পরিকল্পনার পরিমণ্ডলে তখন রয়েছেন। ওই প্রেরণা থেকে সরিয়ে আনা সঠিক কাজ কিছুতেই হতে পারে না। কেন চলে যেতে হচ্ছে সেটা কোনো নন্‌রিহার্সাল ডে-তে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে বিদেয় নিতে হলো।

* পরে ভদ্রলোক একদিন এলেন। ঠিক দু'দিন পরেই। যে-সব কথা কথা সেদিন আমি বিশদে আলোচনা করেছি তা হলো : (ক) নাটক পাঠের প্রত্যেকটি আসরে যদি মঞ্চালোকনির্দেশক উপস্থিত না থাকেন, তবে কেবলই ডিটেলটা যে তার ধারণার বাইরে থেকে যাচ্ছে তা নয় বরং নাট্যক্ষণ, চরিত্র, বিষয়বস্তুর নির্বাচনজড়িত গুরুত্ব, চরিত্র ও ঘটনাগত দ্বন্দ্বের পর্যায় ও তাদের ক্রিয়া সম্পর্কিত উপলব্ধিতে পৌঁছতে তিনি পারছেন না ; (খ) প্রয়োজনীয় নাট্যক্ষণ রচনা, ওই ক্ষণের সময়, চরিত্রায়ণের পর্ব এবং ক্ষণ বিশ্লেষণজনিত পর্যায়গুলো সম্পর্কে তিনি একেবারে অন্ধকারে থাকছেন ; (গ) তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে না, চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য, অন্য চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও সংঘাতের সীমা। পরন্তু ওই ক্ষণের রসবস্তু, ভাবরস কেমন তাও থাকছে অজানা ; (ঘ) তিনি জানতে পারছেন না, কাহিনীর গতি সোজাসুজি, বক্রগতির না ধীরোদাত্ত অথবা প্রশান্ত ইত্যাদি ; (ঙ) তিনি কি জানেন নাট্যকার কী চাইছেন, নির্দেশকই বা কাহিনীর পর্যায়গুলো বিকশিত করতে করতে কোথায় গিয়ে থামবার বাসনা করেছেন ? এটা গেলো প্রথম পর্যায়ের আলোচনা ও প্রশ্ন —যে গুলো সম্পর্কে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কোনো ধারণা নেই, সুতরাং রসসৃষ্টিতে সহায়ক হবার উপলব্ধিতে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

দ্বিতীয় পর্যায় : নাট্যের সামগ্রিক খসড়া পরিকল্পনা যা মহলার প্রাণ। একাধিক চূড়ান্ত বৈঠকে ওই পরিকল্পনার ব্যাখ্যা এবং নাট্যের অন্যান্য অঙ্গের কাজ সম্পর্কিত একটি চূড়ান্ত সমঝোতায় আসার চেষ্টা। নির্দেশক মঞ্চালোক-বিজ্ঞানী, সুরকার, ধ্বনি সৃষ্টিকারী, পোশাক-আসাক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মঞ্চদৃশ্য-স্থপতি, ফার্নিচার-প্রপ্‌টে-পরিকল্পক, রূপরাগ রচনাকারী, শিফটার ও স্মারকদের নিয়ে বসবেন। এবং দৃশ্যের প্রত্যেকটি পর্যায় সম্পর্কিত তাঁর ধারণা ও পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন এবং কোথায় কোন অঙ্গের দুর্বল বা কাহিল সহযোগিতা তাঁকে অসাফল্যের জলধিতে ডুবিয়ে মারতে পারে সে-কথাও স্পষ্ট করে বলবেন সকলকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্য

বিশেষ তিনি পড়ে শোনাতে পারেন, অথবা নির্বাচিত দৃশ্যসমূহ বা প্রয়োজনে আবার পাঠ করে বোঝাতে পারেন গোটা নাটকটাই। তারপর আসবে অভিমত বিনিময় প্রসঙ্গ। এখানে প্রযোজনায় যে-কোনো অঙ্গের রূপকার তথা পরিকল্পক স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত এবং এই বিষয়ের কোথাও তাঁর যদি কিছু অতিরিক্ত সাজেশান থাকে তা ব্যক্ত করতে পারেন; আবার কোথাও সংশোধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করলে তা ব্যক্ত করতে পারেন। এরই ভিত্তিতে নাট্যনির্দেশক তাঁর চূড়ান্ত মহলার জন্য তৈরি পাণ্ডুলিপিকে প্রয়োজনে সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করতে পারেন। অবশ্য যদি যুক্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং সামগ্রিক মায়া সৃজনে সাহায্যের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়: নির্দেশক কার কাছে কোথায় কতোটুকু সহযোগিতা চান এবং তা কোন ধরনের ও কেমন তা বুঝিয়ে বলা। এর মধ্যে নির্দেশ থাকবে আলোর কাজ, স্টেজ-সেটিংসহ মঞ্চের বিশদ মডেল নির্মাণ, পোশাক-আশাক-এর ডিজাইন এঁকে আনতে বলা। অবশ্যই তার বর্ণ এবং অলঙ্কারসহ। ধ্বনির ক্ষেত্রে কোনটি লাইফ হবে, কোনটি হবে স্টক থেকে নেওয়া, সিচ্যুয়েশন অনুযায়ী আবহের অর্কেস্ট্রেশন সম্পর্কিত প্রকল্পের কথা ভাবা। এ ছাড়া রয়েছে চরিত্র উপযোগী পরচুল, দাঁড়িগোঁফ ইত্যাদি এবং পদাভরণ। এ-সময় প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানকে একটি করে পাণ্ডুলিপি দিতে হয়।

চতুর্থ পর্যায়: মহলা—যাকে বলা হয়ে থাকে নাট্যের আসল কাঠামো রচনা এবং প্রতিমা রচনার ক্রমিক প্রস্তুতি ও অগ্রগতি। আলোকবিজ্ঞানীর কাজ হবে বেশ কয়েকটি মহলাতে নিয়মিত উপস্থিত থেকে নাট্যের আসল মর্ম উপলব্ধি করা। তারপর ব্যঞ্জনা। মহলায় বসার আগে তাঁর জানা থাকছে কোন কোন চরিত্রের কী ধরনের পোশাক, কোন রঙের; এদের রূপরাগের রঙ, চুলের কালার, সেটের রঙ এবং ফার্নিচারের রঙ ও মঞ্চভূমির কোন জোনে তার অবস্থানটি কেমন।

পঞ্চম পর্যায়: এবার মঞ্চালোকনির্দেশক মঞ্চে তার আলোর কাজের একটি নকশা (Design or Layout) তৈরি করবেন। বিশদ নকশা। কোন দৃশ্য কোথায় ঘটছে, এক বা একাধিকার ঘটছে ?‐ কোন সময়ে ঘটছে এবং নাট্যিক ক্রিয়ার বিকাশ-জনিত পর্যায়গুলো আসছে কেমন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চালোকের যন্ত্রাদি ও সাজসরঞ্জাম বসাবার একটি ছক তৈরি না থাকলে তাকে অসুবিধের মধ্যে পড়তে হতে পারে। কোন আলো কোন আলোকে খেয়ে নেয় এবং মঞ্চের অন্যান্য রঙের সঙ্গে আলোর মিশ্রণ কোন এফেক্ট দিতে পারে—এটা বুঝে লাইটিং লে-আউট বা নকশা তৈরি করার দরকার। এবার এই নকশা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে নাটকের

পাণ্ডুলিপির ওপর নির্দেশ চিহ্ন দিয়ে আসল লাইটিং স্ক্রিপ্ট তৈরী করা। (বৃত্ত এবং নির্দেশ চিহ্ন বিষয়ক আলোচনাও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থাকছে) অতঃপর কয়েকটি চূড়ান্ত মহলায় আলোর কাজের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে। এবং হতে পারে কেবলই কয়েকটি লাইটিং রিহার্সাল আলাদাভাবে।

মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে জানতে হবে, কোন জায়গায় কোন আলোকযন্ত্র বা ল্যানটার্ন স্থাপন করলে নাট্যের গুণ, গতি, ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পাবে বা কোন বস্তুর ওপর গুরুত্ব আরোপ (Emphasis) করলে দৃশ্যটির মাত্রা সঠিক হবে। মঞ্চালোক-বিজ্ঞানে একেই বলা হয় 'সৃজনমূলক ভারসাম্য'। সর্বোৎকৃষ্ট আলোকসম্পাত বলে কোনো কথা থাকতে পারে না—যেহেতু নাট্য কো-অপারেটিভ আর্ট। প্রয়োজনের শক্ত গণ্ডীর বাইরে এক পা এগোবার সাধ্য তার নেই—এই সার কথাটা তাকে সব সময় মনে রেখে কাজ করতে হবে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিদেশের এবং এ-দেশের কয়েকজন নামী মঞ্চালোকবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু কোনো শিল্পেরই নির্দিষ্ট বা স্থায়ী কোনো 'মডেল' হতে পারে না, সেই হেতু অতো মাপজোক করে, অঙ্ক কষে, কৌণিক দূরত্বের হিসাব রেখে তাঁরা আলোক-সম্পাত করেন না। এই মন্তব্য অনেকটাই খেয়ালখুশির কথা মনে করিয়ে দেয় না কি ? এমনও তো হতে পারে সিলিঙে একটি স্পট বসানো দরকার। নাট্যনির্দেশক বলেছেন, এখানে ওই স্পটটি চরিত্রের বিশেষ ক্ষণকে চিত্রায়িত করবে। এবার মঞ্চটি যদি ছোট হয় এবং তার সিলিং খুব উঁচু না হওয়ায় চরিত্রের ওপর যে আলো পড়বে তা হবে সমান্তরাল। তাই যদি হয় তবে চরিত্রের চোখমুখ এবং প্রয়োজনীয় অভিব্যক্তি অস্পষ্ট হতে বাধ্য। তখন কিন্তু বিভিন্ন কৌণিক দূরত্বে বসানো অন্যান্য আলোকের সাহায্য নিতে হবে। তা হলে বেহিসেবী বা খেয়াল খুশির আলো কাজে লাগে না—এটা কি প্রমাণিত সত্য হয়ে ওঠে না ? মঞ্চের কোনো দৃশ্যের পাত্র-পাত্রীর ওপর যে কোনো কৌণিক দূরত্ব থেকে আলো ফেললে তার ছায়া পড়বেই পড়বে। যদি ছায়াটা প্রয়োজনীয় না হয় তবে ওই ছায়াকে খেয়ে ফেলার জন্য অন্য কৌণিক দূরত্ব থেকে আর একটি আলোকে কাজে লাগাতে হবে। সে আলোর কৌণিক দূরত্ব কতো হবে ? হয় ৪৫° ডিগ্রি নয়তো ৭০° ডিগ্রি।

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন এবং তা হ'লো আলোর জাদুকরী যাই করা হোক না কেন, দর্শক কিন্তু চরিত্রের অভিব্যক্তিগুলো স্পষ্ট করে দেখতে চায়। তার মানে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাজের প্রথম শর্ত হলো, পাত্রপাত্রীরা যতো ভালোই অভিনয় করুক না কেন তাদের অভিব্যক্তি, ক্রিয়া এবং বিজনেসকে স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে

দেখানো, দ্বিতীয় শর্ত হলো পরিবেশ রচনা। মঞ্চের সম্মুখভাগ থেকেই যদি কেবল আলো ফেলা হয়, তা হ'লে দেখা যাবে দৃশ্যের পাত্রপাত্রী থেকে শুরু করে সমগ্র দৃশ্যকে দেখায় দৈর্ঘ্যপ্রস্থবিহীন ঘষা ঘষা মতন। এবার ওদের স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করতে এবং যথাযথ দৃশ্য-পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে স্পট-এর প্রয়োজন আবশ্যিক। তিনটি স্পট-লাইটের ব্যবহার আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে কিছু নতুনত্ব তো আনতেই পারে। আর তা নির্ভর করে থাকে নাট্যের পরিবেশন-বৈচিত্র্যের ওপর। এ-ক্ষেত্রে একটি স্পটকে জানলার বাইরে স্থাপন করে আলোর গতিকে দৃশ্যমান করে তোলা সম্ভব।

যে-আলোগুলি মঞ্চের কাজে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে, তা অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে কতোখানি সহায়ক ভেবে নেওয়া দরকার। ব্যবহৃত আলো দিয়ে দৃশ্যের পাত্রপাত্রী, দৃশ্যের গভীরতা, উচ্চতা ও প্রস্থ ঠিকমতন ফুটিয়ে তোলা যাবে কিনা সে সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। নাট্যাভিনয় চলাকালীন ব্যবহৃত স্পটগুলো থেকে ফেলা আলোর রঙ পরিবর্তনের সুযোগ যাতে থাকে সে ব্যবস্থাও আগেভাগেই করে রাখা দরকার। মনে রেখো, একটি প্রোফাইল-স্পট থেকে আলোকনিয়ন্ত্রণের কাজ সব থেকে ভালোভাবে করা যায়। এবং এর মুখে প্রয়োজনীয় নানা সরঞ্জাম ব্যবহার করে প্রতিফলিত আলোর মধ্যে নানা রকম চিত্রবিচিত্রতা আনা সম্ভব।

তিনটি স্পট নিয়ে কাজ করার আর একটি কৌশলের কথা বলি: একটি স্পটকে রঙ্গগৃহে স্থাপন করো, বাকি দু'টিকে প্রসেনিয়াম আর্চের পেছনে রেখে ব্যবহার করো।

যদি ব্যবহারের জন্য চারটি স্পট-লাইট পাওয়া যায় তা হ'লে দৃশ্যাবলীর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দু'টি FOH স্পট স্থাপন করা উচিত রঙ্গালয়ে এবং বাকি দু'টিকে ব্যবহার করা উচিত প্রসেনিয়াম-এর ঠিক পেছন দিকে। এমন একটি উচ্চতায় এই স্পটগুলোকে স্থাপন করতে হবে যেখান থেকে মঞ্চস্থিত পাত্রপাত্রী এবং দৃশ্যাবলীর ওপর আলো ফেললে তা দর্শকদের চোখে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এবং ছায়াগুলো হয় হ্রস্ব। প্রয়োজনে এখানে ডিমার ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি ডিমার ব্যবহার-যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ডিমারের সঙ্গে যেন বাড়তি স্পট ব্যবহার করা না হয়। যদি পাঁচটি স্পট পাওয়া যায় কাজ করার জন্যে—তা হ'লে মঞ্চালোকের সকল বাধাকেই অপসারিত করা যায় এবং বাঞ্ছিত মুহূর্তগুলোকে সৌন্দর্যময় করতে কোনো অসুবিধে থাকে না। আরও বৈশিষ্ট্য রচনা করা যেতে পারে যদি ৬ নম্বর স্পট হাতের কাছে থাকে। ধরা যাক ৬ নম্বর স্পট পাওয়া গেলো ব্যবহারের জন্য, তা হ'লে ওটাকে স্থাপন করতে হবে প্রসেনিয়ামের ঠিক মধ্যবর্তী জায়গায় কি? যে দু'টি ক্রসিং স্পট-ব্যবহারের জন্য রয়েছে সে দু'টিকে কাজে লাগিয়ে মঞ্চের মধ্যভাগে

আলোর স্বল্পতাকে উজ্জ্বল করা যেতে পারে। আসলে ৬ নম্বর স্পট কোথায় বসানো হবে তা নির্ভর করবে স্পটটির আকারের ওপর।

৭ নম্বর স্পট নিয়ে কাজ করাকে অনেকে বাড়াবাড়ি করার মতন মনে করে থাকেন। চারটি স্পট প্রসেনিয়ামের পেছন দিকে তা হ'লে ব্যবহার করতে হয়। ধরা যাক ওই চারটি স্পটকে যথাক্রমে আমরা ক, খ, গ, ঘ, ধরে নিলাম। একজন অভিনয়শিল্পী যখন মঞ্চের ডানদিকে অবস্থান করেন, তখন ক ও গ স্পটের সাহায্যে তাঁর ওপর আলো ফেলতে হবে। এবং যখন ওই অভিনয়শিল্পী তার বামদিকে দাঁড়াবেন তখন খ ঘ স্পটের সাহায্যে তাঁর ওপর আলো ফেলতে হবে। কিন্তু ওই অভিনয়শিল্পী সরাসরি স্পটগুলোর নীচে যদি দাঁড়ান, তখন এগুলোর কিছুই করার থাকে না। এ অবস্থায় FOH স্পটের সাহায্য নিতে হয়।

৮ নম্বর স্পট যদি পাওয়া যায় ব্যবহারের জন্য এবং তাকে স্থাপন করা হয় রঙ্গালয়ের মধ্যে তবে তার দু'পাশে থাকা দরকার দু'টি FOH স্পট। রঙ্গগৃহের ও মঞ্চের আকার আকৃতি গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই দু'টি স্পটকে পার্শ্বস্থিত দূরবর্তী জায়গায় বসানো হয়। এবং ৯ নম্বর স্পটটি অবশ্যই হবে FOH। এর ফলে আমরা দু'দিক থেকেই মঞ্চে আলোর আল্পনা আঁকতে পারি। যদি ধরে নিই এই চারটি FOH-এর নামকরণ করা হলো যথাক্রমে চ, ছ, জ ও ঝ—তা হ'লে মঞ্চের পেছন দিকে অবস্থিত যে অভিনয় শিল্পীকে ক ও গ এর সাহায্যে আলোকিত করা হয়ে থাকে, তিনিই যদি আবার মঞ্চের সম্মুখভাগে চলে আসেন তা হ'লে স্পট চ ও জ এবং ঝ থেকে তাঁর ওপর আলো ফেলতে হবে। ওই সূত্রকে যদি যথার্থ মনে করা হয় তবে একটা প্রশ্ন উঠবে: মঞ্চের পেছন দিক থেকে অর্থাৎ স্পট খ ও ঘ-এর আলো থেকে অভিনয়শিল্পী মঞ্চের সম্মুখ ভাগের দিকে এগিয়ে যাবে?

মঞ্চালোক-নির্দেশনার কাজ

এখানে প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে, অভিনয়শিল্পীদের গরিষ্ঠ সংখ্যাই—সে পেশাদারী হোক অথবা অপেশাদারী, তাঁরা জানেন না, আলোর আল্পনা অভিনয়কে কতোখানি গুণগত উচ্চসীমায় পৌছে দিতে পারে। এ-ব্যাপারটা নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাতেও খুব একটা দেখা যায়না। অতীতে কোনো একটি বিশেষ ক্ষণ যখন ক্লাইম্যাক্সে, ঠিক তখন প্রধান অভিনয়শিল্পী যদি তাঁর মনোমতন আলো না পেতেন তবে খুব উত্তেজিত হয়ে চাপা এবং অস্পষ্ট গলায় বলতেন 'ফোকাস-ফোকাস'। অর্থাৎ

তাঁর মুখে পর্যাপ্ত আলো ফেলতে হবে। এবং তিনি মুখাবয়বের নানা অংশের একটা জাদুকরী কাজ দেখিয়ে হাততালির হরিলুট কুড়িয়ে নেবেন। ব্যাস। এই মনস্কতা প্রায় সকল অভিনয়শিল্পীরই কিন্তু চাপা গলায় হুমকি দেওয়াটাই যা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় সকল অভিনয়শিল্পীরই দাবী থাকে, মঞ্চের যেখানেই তিনি উপস্থিত থাকুন না কেন তাকে যেন পর্যাপ্ত আলো দেওয়া হয়। আলোর ঝর্ণায় স্নান করবার মতন। আসলে এটা কি সম্ভব? সম্ভব নয়। মঞ্চে যদি ষোলোজন চরিত্র থাকে তাঁদের প্রত্যেককে পর্যাপ্ত আলো দিতে গেলে প্রযোজনাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কোন ব্যাখ্যাতে গিয়ে পৌঁছবে? আসলে আলো তার প্রয়োজনের বাইরে যাবে না। কারণ মঞ্চালোক-নির্দেশক জানে, দর্শকরা অবশ্যই অভিনয়শিল্পীদের অভিব্যক্তির কায়দাটায়দা স্পষ্ট করে দেখতে ভালোবাসেন। কিন্তু সেই কায়দাকানুন কতোখানি নাট্যানুগ সে হিসেবটা তো আগেই করা হয়েছে। অর্থাৎ মঞ্চালোক-নির্দেশকের হাতের কাছেই রয়েছে দৃশ্যদীপনের বিশদ নকশা এবং লাইটিং স্ক্রিপ্ট। এই নিয়মের পথকে অতিক্রম করতে গেলে ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটে যেতে পারে এটা ভালোভাবেই জানা থাকে মঞ্চালোক-নির্দেশকের।

তবে এটা ঠিক, যেহেতু অভিনয়শিল্পীকে কাজ করতে হয় মঞ্চস্থিত দৃশ্যসজ্জার সামনে সে কারণেই পটের তুলনায় তাঁর ওপর স্পষ্ট করে আলো ফেলার একটা প্রয়োজনীয়তা থাকেই। কিন্তু সেটা কি সব অবস্থানের ক্ষেত্রেই? না। ঘটনার সময়, দৃশ্যসজ্জার বাহার পরন্তু নাটকীয় ক্ষণকে বিচার করে আলোকসম্পাতের কাজগুলো করে যেতে হবে ঘড়ির-কাঁটার মতন নিয়ম ধরে।

এখানে একটি প্রশ্ন তোলা যায়: মঞ্চপট এবং অভিনয়শিল্পী এদের ক্ষেত্রে কি একই মাত্রার ব্যবহার সঙ্গত? উত্তর হবে: সাধারণ ক্ষেত্রে বা সর্বত্র অবশ্যই নয়। নাট্যমুহূর্তের বিশ্লেষণেই বলা থাকবে এমফ্যাসিসটা পড়বে কার ওপর, মঞ্চভূমির কোন অংশে? তার মানে অভিনয়শিল্পী ও দৃশ্যপট এই দুইয়ের মূল্য কি সমান? অবশ্যই নয়। হতেও পারে না। যখন কালো পর্দার সামনে একটি গোটা নাট্য প্রযোজিত হয় তখন দৃশ্যপটের তো চিহ্নই থাকে না। এ-ক্ষেত্রে তো বটেই, অন্যক্ষেত্রেও অভিনয়শিল্পীর গুরুত্ব অনেক বেশি কারণ দর্শকরা আসলে অভিনয়টাই দেখতে আসেন। কিন্তু এমনও তো দেখা গেছে, নাটকটি সুলিখিত না হওয়ায়, অভিনয়শিল্পী-দের আপ্রাণ-চেষ্টাজনিত-অভিনয় রসসৃষ্টিতে অসমর্থ হওয়ায় দৃশ্যপট, আলোর জাদু বা অন্য কোনো কারিগরি কৌশলের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে দর্শকদের চমকে দেওয়া হয়েছে এবং সে নাট্য দেখার জন্য দিনের পর দিন কম ভিড় হয়নি। এই ভিড় কিন্তু নাট্যের সামগ্রিক সাফল্যের কোনো মূল্যই দেয়নি—যেহেতু এই প্রযোজনা অতদূর

পৌঁছতেও পারে নি। এ অনেকটা খাঁড়ার ওপর দিয়ে হাঁটা, দড়ির ওপর দিয়ে সাইকেল চালানো বা ভালুক নাচ দেখিয়ে লোক জমাবার মতন। এর মধ্যে নাট্যের টোটালিটি কোথায়? কোথায়ই বা আর্ট? কিন্তু অভিনয়শিল্পীকে আলোকিত করতে গিয়ে যেন গতির ভারসাম্য নষ্ট না হয় সেটা মঞ্চালোক-নির্দেশকের সব সময়ই মনে রাখতে হবে। তার মানে এখানে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি: অভিনয়শিল্পীর ওপর যে-আলো ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই আলো যেন দৃশ্যপটের ওপরে বেশি পরিমাণে না পড়ে। আবার মঞ্চদৃশ্যের জন্য নির্দিষ্ট আলোর দ্বারা যেন অভিনয়শিল্পীরা প্রভাবিত না হন। তার মানে তাঁদের ওপর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলো যেন না পড়ে।

মঞ্চভূমিতে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের (ফার্নিচার প্রপ) ওপর যে আলো পড়ে, তার প্রতিফলন বস্তুগুলিকে উজ্জ্বল করে। মনে রাখতে হবে দৃশ্যসজ্জা ও আসবাবপত্রের ওপর প্রতিফলিত আলোর পরিমাণ ও মাত্রা যদি ঠিক থাকে তবে আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা আসবে না ঠিকই কিন্তু এ-কথাও সত্য—এই পর্যায়ে আলোকসম্পাতের মধ্যে মাত্রা বজায় রাখাটা খুবই কঠিন ব্যাপার।

অনেক সময় এমন হয়, অভিনয়শিল্পীর মুখের ওপর পড়া আলোর পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণের আওতার মধ্যে রাখাটাই কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু পারফেকশনে আসতে গেলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই হবে। সেটা কিভাবে সম্ভব? ৪৫ থেকে ৭০ ডিগ্রি কোণ থেকে যদি আলো ব্যবহার করা যায় তা হ'লে ডায়মেনশন এবং সংযম দুইই বজায় রাখা সম্ভব হবে। এতে ছায়ার সৃষ্টি হবেই। তবে সে ছায়া অভিনয়শিল্পীর আকৃতির [illegible] হবে অনেক হ্রস্ব। যখন ৯০° ডিগ্রি কোণ থেকে আলো ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সমা[illegible] থেকে, তখন অভিনয়শিল্পীর ওপর আলো পড়বে সমান্তরালভাবেই। এর দ্বারা ডায়মেনশন আনা যায় না, আনা যায় বাঞ্ছিত আলোর স্পষ্টতা। কিন্তু এর দোষ হচ্ছে এই আলো যে ছায়ার সৃষ্টি করে তার আকার কিন্তু অভিনয়শিল্পীরই মতন।

প্রকৃত সত্যের সন্ধানের জন্য যদি মঞ্চালোকবিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে হয় তবে শিক্ষার্থীদের জেনে রাখা দরকার, প্রকৃত বাস্তবানুগ প্রযোজনার ক্ষেত্রে স্পষ্টতাই কিন্তু মূল কথা হবে আলোকসম্পাতের। কিন্তু যদি প্রতীকী, ইঙ্গিতময়, মনস্তত্ত্বমূলক প্রযোজনা হয়—তা হ'লে মন থেকে আগের ধারণাকে একদম মুছে ফেলতে হবে। অবশ্য লাইটিং-লেআউট করার সময়েই সেটা আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হবে। তার মানে নাটকের বৈশিষ্ট্য+প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য=স্টেজ লাইটিং লেআউট। এর জন্য ক্রস লাইটের প্রয়োজন হতে পারে বেশি। চরিত্রদের মুভমেণ্ট তথা বিচলন-ভিত্তিক অনুসারী-আলোর

কথাও ভাবতে হতে পারে। সংলাপের কিউ-সচেতন আলোকসম্পাত সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

সংযমশীলতা

একথা সত্য যে পরিপূর্ণ, নিখুঁত ও নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হ'লে মঞ্চ ও মঞ্চগৃহের নানা কৌণিক বিন্দু থেকে অনেক রকমের আলো ব্যবহার করাই বিধেয় এই বাণীটি প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু আমার সতর্ক ইঙ্গিত: আলোক-যন্ত্র ও সরঞ্জামের সংখ্যা যতো বেশি হবে ততোই জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। এর জন্য যেমন লাগে প্রচুর সময়, তেমনি বেশি লোক এবং অসম্ভব পরিশ্রম—শেষ পর্যন্ত যা সংযমের বাঁধনে বেঁধে রাখা যায় না। সার্থক মঞ্চদৃশ্য-দীপনের জন্য অনেক ভেবে চিন্তে—যতোটা সম্ভব কম আলোর কাজের মধ্যেই থাকে বাহাদুরী ও কৃতিত্ব। তবে সেই আলোক-সরঞ্জাম যেন প্রয়োজনের চাইতে আবার কম না হয়। এতে পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা প্রকাশ পায় বেশি। মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ কিন্তু এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফোকাসিং (Focusing)

মঞ্চের বিভিন্ন কোণ থেকে যখন আলো ব্যবহার করা হয়, তখন আলোকরশ্মি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাটাও করে যেতে হয়। এই সময় যে-সব সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় তা দূর করার জন্য কী করা যেতে পারে? একটি পদ্ধতির শরণ নিতে পারি। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সেটিং বা ফোকাসিং। ইংরেজিতে এর ব্যাখ্যা: Quite apart from the technical meaning of the word "focus" it is often used very loosely in the theatre. "Focus that spot over here" may involve putting the lamp even further out of focus. Hence "hard" and "soft" focus···যখন একটি স্পট থেকে ফোকাস দেওয়া হয়, তখন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় একটি বিশেষ দিকের প্রতি—যাতে আলোকরশ্মি অপ্রয়োজনীয় স্থানের ওপর না পড়ে। এ-জন্য যে সতর্কতা অবলম্বনীয়, সেটা হলো মঞ্চালোক-নির্দেশক-এর নিজের পরীক্ষা করে নেওয়া। আবার এটাও দেখতে হবে ওই ফোকাস যেন অভিনয়শিল্পীর চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়। দেখতে হবে ফোকাসের ফলে কোনো ছায়ার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। যদি হয় তা'হলে কী পরিমাণে ওই ছায়া পড়েছে এবং তার দৈর্ঘ্য কতো? ছায়াটি অপ্রয়োজনীয়ই ধরে নেওয়া যাক। এবার ছায়াটাকে মুছে ফেলার জন্য কী করা উচিত সেটাও মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীকে ঠিক করে নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই ছায়া কাটার জন্য অন্য একটি আলোকে

কাজে লাগাবার এক প্রচলিত পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই পদ্ধতিকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা খুব দক্ষ মঞ্চালোকবিজ্ঞানী না হ'লে ছায়া-কাটার আলো অনেক সময় মঞ্চদৃশ্যকে অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্য দেয় এবং তার ফলে চরিত্ররা এই পরিপ্রেক্ষিতে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় দর্শকদের কাছে। আসলে ভারসাম্য বজায় রাখাটা আগে দরকার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করা মানেই নাট্যকে আঘাত করা।

মনে রাখতে হবে: (ক) অনুজ্জ্বল বা নরম আলোকরশ্মির প্রান্তগুলো (কিণারা) উজ্জ্বল আলোকরশ্মির চাইতে চোখে পড়ে কম; (খ) মঞ্চস্থাপত্যের ওপর পড়া আলোক-রশ্মির কিণারাকে যদি দৃশ্যপটের কিণারা-বরাবর স্থাপন করা যায়, তা হলে দর্শকদের উপভোগের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না।

এবার আসা যাক আলোকরশ্মির মধ্যবর্তী অংশে। আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে এখানেও কিছু সমস্যা থেকেই যায়। সেই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য কী করণীয় সেটা মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে ভালোভাবে জানতে হবে। প্রচলিত তথা বাঁধাধরা নিয়মের প্রশ্ন তুললে বলা যায়, যে-সব দৃশ্যে রঙের ব্যবহার থাকবে সে-সব দৃশ্যে আলো ফেললে খুব একটা বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে না—যেমনটি দেখা যাবে সাদাসিধে দৃশ্যাবলীর ওপর আলো ফেলার ক্ষেত্রে। তা হ'লে কি দৃশ্যাবলীর উপরিভাগে রঙ ব্যবহার করলেই সমস্যার সহজ সমাধানের পথ আবিষ্কার করা সম্ভব? অনেক বিশেষজ্ঞ সে রকমই মনে করে থাকেন। তাঁদের মত হলো, মঞ্চদৃশ্য-স্থপতিরা দৃশ্যাবলী রচনার সময় যদি এক ধরনের রঙ দৃশ্যাবলীর ওপর দিকে ব্যবহার করেন বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন তা হ'লে নাকি সমস্যার সমাধানের পথ সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই যুক্তির পক্ষে আমার কিছু বলার নেই। আমার প্রশ্ন: এটা কি পদ্ধতি? কিছুতেই নয়। বরং আলোর মুখে অবস্থা, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি বুঝে রঙিন কাচে প্লাস্টিক শীট ব্যবহার করলে সমাধানের পথটা অনেক সহজ হয়ে উঠতে পারে। 'গোবো' ব্যবহারকে অযৌক্তিক বলা ঠিক হবে না বরং এতে বাঞ্ছিত কর্মটি অনায়াসে হয়ে যাওয়া উচিত।

অনেক সময় গাছ বা ডালপালার মধ্য দিয়ে দৃশ্যের ওপর আলো ফেলার মুহূর্ত আসতে পারে। এক্ষেত্রে 'গোবো'র ব্যবহার আবশ্যিক তো বটেই, তা ছাড়াও এতে আলোর গুণগত দিক বৃদ্ধি পায়। এই দশকের একজন বিখ্যাত মঞ্চালোকবিজ্ঞানী বলেছেন, তিনি নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর অবশেষে স্থির করেন যে, ফোকাসিং-এর জন্য ল্যানটার্নই যথেষ্ট। আর সুইচবোর্ডের কয়েকটিমাত্র কিউ। তবে, হ্যাঁ, স্মৃতিশক্তি প্রখর না হ'লে এ-ধরনের কাজে হাত দেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। অভিনয়শিল্পী যখন তাঁর অভিনয়-সীমার মধ্যে থাকেন, তখন ফোকাসিং

ল্যানটার্নকে ওপরের দিকে তুলতে হয় আবার তিনি বা তাঁরা যখন মঞ্চের অন্য কোনো স্থানে অবস্থান করেন, তখন ফোকাসিং-স্পট্‌কে নীচে নামিয়ে নিতে হয়। এ-ছাড়া ডিমারকে যথাযৎ স্থানে স্থাপন করে এমন স্বাভাবিক আলোর কাজ করা যেতে পারে যে, যা দৃশ্যাবলীর ওপরে পড়া সত্ত্বেও কটকটে বা চোখজ্বলা আলোর সৃষ্টি না করতে পারে।

সুইচবোর্ড অপারেটিং সম্পর্কে এই মঞ্চালোকবিজ্ঞানী বলেছেন, আস্তে আস্তে প্রয়োজনমাফিক সুইচবোর্ডটি চালালে অনেক অবাঞ্ছিত অসুবিধের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

সংযম প্রসঙ্গের শেষ কথা: প্রযোজনার সকল দিক ভেবে, বেশ ভালো করে বুঝে নিয়ে, নাট্যনির্দেশক ও অন্যান্য অঙ্গের নির্দেশকদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে যেন অধিকসংখ্যক আলোক-যন্ত্র ব্যবহার করা না হয়।

১

মঞ্চালোকবিজ্ঞানে রঙীন আলোর ব্যবহারিক দিক : শাদা আলো, সিনেমইড, রসকোলিন, জেল্, জেলাটিন্, প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি, আলোর রঙ নির্বাচন ও ফিল্টার ব্যবহার, সময়ানুপাতিক আলো, ফিল্টারের বিশদ, ডায়মেনশন্যাল রঙ, আলোর মিশ্রণ, রঙ নিয়ে অনুশীলন, রঙের তালিকার বিশদ ও পর্যায়…

কথিত আছে মঞ্চে আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নাকি আলোকসম্পাতে রঙের ব্যবহার। কথাটা কি মিথ্যে ? না। কিন্তু এ-নিয়ে ঘাবড়াবার কোনোই কারণ নেই। যেমন, ধরো একটি একক আলোকরশ্মিকে কোনো রঙে রঙীন করে তোলার মধ্যে অবশ্যই কোনো জটিলতা থাকতে পারে না। কিন্তু যখন আলোক-রশ্মির মধ্যে একাধিক রঙের মিশ্রণ ঘটানো হয়, তখনই সমস্যাটা প্রকট হয়ে ওঠে।

আলোকরশ্মিকে রঙীন করার জন্য এক ধরনের অদাহ্য নমনীয় প্লাসটিক জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাজারে এগুলি প্লাস্টিক শীট আকারে পাওয়া যায়। নানা জায়গায় এই বস্তুটির নানা নামকরণ করা হয়েছে। যেমন : (ক) **সিনেমইড** (Cinemoid) ; (খ) **রস্‌কোলিন** (Roscolene) ; (গ) **জেল** (Gel)।

'**জেল**' এই কথাটি আসলে **জেলাটিন** (Gelatin)-এর সংক্ষিপ্ত নাম। ফিল্টার বা ওই স্বচ্ছ শীটগুলো আগে 'জেলাটিন' থেকেই তৈরি হতো। আসলে কি জানো ? জেলাটিন কিন্তু অতি দাহ্য পদার্থ। এতে সহজেই আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হালে জেলাটিন খুব কদাচিৎ ব্যবহার করতে দেখা যায়। কেন ? কারণ এ-কালে, এই সময়ে রঙীন আলোকসম্পাতের জন্য নানা ধরনের রঙীন কাচ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রয়োজন-মাফিক রঙের ও সাইজের এই কাচ বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়। নতুন এই ব্যবস্থা চালু হবার পর ওই পুরনো বস্তুটির কদরও কমে গিয়েছে।

জেনে রেখো আলোর ফিলামেণ্ট জ্বলতে জ্বলতে ক্রমে লাল হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে যায়। সেই কারণে এর সঙ্গে আলাদা একটি বস্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে—যার ফলে এই উত্তাপকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ডিমার-এর সাহায্যে আলোক যখন ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয় তখন ফ্যাকাসে রঙ তার রূপ পরিবর্তন করতে পারে। ধীরে ধীরে আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে আলোর উজ্জ্বলতাও দৃশ্যে কমে আসছে।

একটি উৎস থেকে যখন আলোর রঙীন রশ্মিকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে, তখন সেই ল্যানটার্নটির আকার হয়ে থাকে একটু আলাদা রকমের। টাংস্টেন এবং টাংস্টেন-হ্যালোজেন এর-মধ্যে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায় না—এটা কিন্তু লক্ষ্য করার। এর দ্বারা কোনো বিপত্তির সৃষ্টিও হতে পারে না। তবু যদি কোনো অসুবিধে তার শক্ত মাথা তোলে—তাতে আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সমস্যাকে ডেকে আনে না। ইনক্যানডেস্‌সেন্ট, ল্যাম্পের স্পট (Incandescent lamped-spot) এবং ডিসচার্জ-ল্যাম্প-স্পট-এর ফিল্টারের মধ্যে পার্থক্য বা তারতম্য থাকে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, ডিসচার্জ ল্যাম্প-উৎস নীল আলো নিক্ষেপ করে থাকে।

আলোর রঙ নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা কোথায়? প্রশ্ন যদি এই হয়, তবে উত্তরটা হবে: নানারকমের রঙীন আলোকরশ্মির মিশ্রণে কোন রঙের কী প্রতিক্রিয়া হয় এবং এই রঙীন আলোকরশ্মিগুলো মঞ্চের বিভিন্ন কোণ থেকে যখন ব্যবহার করা হয়—তখন দৃশ্যাবলীর ওপর প্রতিফলিত সেই আলোর প্রতিক্রিয়াই সমস্যা। আগে থেকে জেনে বুঝে নিলে কিন্তু তেমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না।

এ-কথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ছবি আঁকার জন্য রঙের মিশ্রণ তৈরি করা আর মঞ্চদৃশ্যকে রঙীন করে তোলার জন্য রঙবাহারী আলোর মিশ্রণকে এক মনে করলে মস্ত ভুল হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: ছবি আঁকার সব রঙগুলোকে যদি একত্রে মেশানো যায়, তা হলে কী রঙ দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত? কালো। কিন্তু মঞ্চে ব্যবহৃত সবগুলো আলোর মিশ্রণের পর যে আলো তৈরি হবে তার রঙ হবে শাদা। এবার আর একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করো: আলোর মুখে যদি নানা রঙের ফিল্টার ব্যবহার করা হয় এবং সেই আলোর মিশ্রণ ঘটানো হয় তা হ'লে কী হবে? কী পাবো? কোনো রঙই পাবো নয়। তার মানে কালো। মঞ্চের ক্ষেত্রে যা অন্ধকার। রঙের এই রূপান্তরের নাম বিয়োজন। পরখ করে দেখো: তিনটি প্রাথমিক রঙের ফিল্টার যদি ল্যানটার্নের মুখে পরপর লাগানো হয় তা হ'লে যা সৃষ্টি হবে, তাও কোনো রঙ নয়।

আগেই বলেছি সব রকম আলোর মিশ্রণ—শাদা আলো। যদি মনে করা হয়, আলোর এই শাদা রঙ বাদ দেওয়া হবে, তা হ'লে কিন্তু বাদ দিতে হবে সবগুলো রঙকেই। তার মানে শাদা আলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে কোনো রঙেরই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এইভাবে যদি বর্ণালীর মধ্য থেকে কেবল গাঢ় লাল রঙের ফিল্টার ব্যবহার করা হয় তা হ'লে সব রঙ দূর হয়ে গিয়ে যা পড়ে থাকে তা কেবলই লাল তো? এ-রকমভাবে, এই পদ্ধতিতেই যে কোনো রঙের ফিল্টার এককভাবে ব্যবহৃত হবে। মঞ্চে

এবং আধিপত্য করবে কেবল সেই রঙটাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে সামান্য এই রঙের আভাটুকুর দাম কিন্তু অনেক। নাট্যবিজ্ঞানের ৩য় খণ্ডে (প্রয়োগবিজ্ঞান) বলা আছে কোন্ রঙ কোন্ রঙকে খেয়ে একবারে হজম করে নিতে পারে। এই তথ্যটি আলোকবিজ্ঞানীকে সব সময় মনে রাখতে হবে। এর মধ্যে ধরতে হবে ক্যানভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, অভিনয়শিল্পীর গায়ের চামড়ার রঙ, মেক-আপ, চুল, দাড়িগোঁফ—সমস্তটা মিলিয়ে যে রঙের সজ্জা ও তার বিচিত্র বিকাশ তার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে মঞ্চে আলোকসম্পাতের কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। বলা হয়েছে: বস্তুকে যে রঙে রঙ করা হয়ে থাকে তার উপাদানের মূলে থাকে যে-পদার্থ, আলোর রঙের ক্ষেত্রেও ওই একই মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। যদি একটি দৃশ্যকে সম্পূর্ণ নীল রঙে প্লাবিত করা হয় তা হ'লে এর ওপরে যতো রকমের উজ্জ্বল আলোই ফেলা হোক না কেন ওই দৃশ্যটি কিছুতেই ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে না। তার মানে গোলাপী ইত্যাদি সকল রঙের কথাই বলা হচ্ছে। এর মানেটা কী দাঁড়ালো বলতো? উত্তর: ওই নীল আলোটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না নিয়ে এলে দৃশ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব হতে পারে না। এই সূত্র ধরে আমরা কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি: যদি আলোকসম্পাতের মাধ্যমে দৃশ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা যায় তা হ'লে যে রঙে দৃশ্যটি রাঙানো হয়েছে, তার মধ্যে রঙের এমন কোনো উপাদান রয়েছে—যার ফলে এ-রকমটি হওয়া সম্ভব হতে পেরেছে। সুতরাং রঙের এই উপাদান খুব অল্প পরিমাণে মঞ্চদৃশ্যের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেই চমৎকার একটি ফল পাওয়া সম্ভব। অবশ্য মঞ্চ আলোকিত হবার পরই।

জেনে রেখো ফিকে রঙের আভা সকল রঙের সঙ্গেই কোনোও না-কোনোভাবে খাপ খেয়ে যায়। যে কোনো রঙের ওপরই এর একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়া থাকে। এমন কি প্রয়োজনে অভিনয়শিল্পীর মুখের ওপর এই ফিকে আভা ফেললে বাঞ্ছিত ফল লাভের পথ খুলে যেতেও দেখা গেছে। এই রঙের সঙ্গে মানুষের চোখ ও মস্তিষ্কের একটি সরল এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে। এমন আলোর ব্যবহার কি ঠিক যা দর্শকদের চোখ ও মস্তিষ্কের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে থাকে? না। তার মানে নাট্যের কাজে মঞ্চে ব্যবহৃত আলোর রঙকে দর্শকদের দৃষ্টি এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবেই। খুব উজ্জ্বল বা চোখ ধাঁধানো আলো দিয়ে নাটোর কাজ শুরু করলে দর্শকদের ওপর যেমন অত্যাচার করা হয় তেমনি সমগ্র নাটোর মূল ভারসাম্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। এ-জন্য দেখা যায় এই বিশ্বের সব বিখ্যাত নাটকের শুরু হয়েছে সাধারণ আলো দিয়ে। তারপর নাট্যের ক্রমাগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী আলোর শক্তি ও বিচ্ছুরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

এখানে বেন্থাম সাহেবের একটি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা গেলো না। এই উদ্ধৃতিটি যে কোনো মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাছেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যময় : Colour is a sensation we receive when presented with only part of the visible range of light. This range is radiation of wavelengths from 4000A to 7000A. The unit of measurment A (Angstrom Unit) is 10 of a metre and there is a complete sources of these wavelengths which when presented simultaneously to the eye are seen as white light. This light can be refracted by passing it through a very narrow slit on to a prism. What then appears is a series of multiple images of the slit side by side, each in a different colour. These are the familiar coloured band—the spectrum—Red, Orange, Yellow, Green, Blue green, Blue and violet. In reality there are hundreds of colour line—saturated hues (pure colours)—but there are so many that they appear as a continuous ribbon.

আলোর রঙ নির্বাচন ও ফিল্টার ব্যবহার

রঙ্গমঞ্চে ব্যবহারের জন্য পছন্দসই ও প্রয়োজনীয় রঙের নির্বাচন-এর কাজটির সঙ্গে উপলব্ধি ও বিকাশ-এর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রশ্ন হলো, কেমন করে রঙের যথাযথ ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে? সাধারণত দেখা যায় এর একটা পুরনো ধরাবাঁধা নিয়ম রয়েছে—তাকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হয়। প্রশ্ন হলো, এখনও কি প্রচলিত পথ ধরেই হাঁটা হবে—যখন মঞ্চালোকবিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে? আমার উত্তর : সেই আদিকালে আমাদের রান্নার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো তা কি আজ জানা যাচ্ছে? না। এর মধ্যে নিরীক্ষামূলক নানান রান্না আমাদের রসনাকে তৃপ্তি দিয়েছে। আসল কথা হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। মঞ্চে আলোর কাজটি কিন্তু অনেকটাই ওই রকমের। কোন রঙের সঙ্গে কোন রঙ খাপ খাবে, কোন রঙের দৃশ্যের ওপর কোন রঙের আলো ফেলা উচিৎ, কোন রকম উজ্জ্বলতার আলো নিয়ে মঞ্চে নাট্যের কাজ শুরু করা উচিত—সমস্ত ব্যাপারটাই কাজের আগ্রহ, চর্চা, অনুশীলন এবং নিরীক্ষার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটা উচিৎ।

মঞ্চে আলোকসম্পাতের অন্যান্য উপকরণের মতোই আলোর রঙ নির্ভর করবে প্রযোজনার নিজস্ব স্টাইলের ওপর। আলোক পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনার ভিত্তিতে স্থির করতে হবে, নাট্যের চরিত্র অনুযায়ী তাতে রঙের ব্যবহার থাকবে কি থাকবে না। এবং থাকলে কী কী রঙ থাকবে; তা কোথায় কেমন করে ব্যবহৃত হবে (অবশ্য এগুলি চূড়ান্ত মহলায় লাইটিং-স্ক্রিপটের ওপর চিহ্নিত করতে হবে)। যদি কেবল শাদা আলোয় কাজ করতে হয় তবে নাট্যের গভীরতাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

আবার এমন পরিকল্পনা যদি রচনা করতে হয় যে, রঙীন আলোর ব্যবহার ব্যতিরেকে নাট্যকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, তাহ'লে দেখতে হবে, সেই সব আলোর চরিত্রগুলো কেমন হওয়া দরকার। সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, রঙবাহারী নাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রঙীন আলো, অল্পকিছু শাদা আলোর কাজ? যদি বাস্তব নাট্যে রঙের কাজ থাকে তবে তার আভার রকমটা কেমন হবে এটা জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নরম আলোর অর্থ কি হবে 'করুণরস' আর উজ্জ্বল আলোর মানে দাঁড়াবে 'আনন্দরস'? সময় সকাল বা সন্ধ্যা হ'লে আলোর রঙের পরিকল্পাটি কেমন হবে? সকাল বিকেল সন্ধ্যা নিয়েও অনেক সমস্যা রয়েছে। নাট্যের পট যদি হয় শীতপ্রধান দেশে, নাতিশীতোষ্ণ দেশে, পাহাড়ের নীচের গ্রামে অথবা শহরে, নদী তীরবর্তী কোনো জায়গায়, সমুদ্রের সৈকতের কাছাকাছি স্থানে, পাহাড়ের গায়ের কোনো শহরে বা গ্রামে—এ-সব প্রশ্ন তো থাকেই, তা ছাড়াও রয়েছে ঋতুর প্রশ্ন, মাসের প্রশ্ন, সময়ের প্রশ্ন। একি শীতের সকাল? যদি তাই হয় তবে কোন মাস? সে সকালে কি কুয়াশা ছিলো, আকাশে ছিলো মেঘ অথবা ছিলো না? যদি হয় বর্ষাকাল, হেমন্ত, বসন্ত কি গ্রীষ্ম, তারও বাস্তব বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ ছাড়া রয়েছে মহানগরী, উপকণ্ঠ, মফঃস্বল। মফঃস্বলের কোনো গ্রাম—তার শস্যের জমিতে সবুজ থাকতে পারে—একেবারে অবন্ধুর ক্ষেত্র হতে পারে, আবার নানা ধরনের গাছগাছালির আধিক্য থাকতে পারে। যেমন ধরো কলকাতা শহরের কোনো বিত্তশালীর ড্রইং রুম কি তার বাগানবাড়ির ড্রইংরুমের আলোকে স্বীকার করে নেবে? নেবে না। তার মানে সমস্ত ব্যাপারটি না বুঝে কেবল কতগুলো যন্ত্রের মহিমা, গুণাবলী জেনে মঞ্চালোকবিজ্ঞানী সাজার চাইতে না সাজাই ভালো।

এমন কোনো নাট্য হতে পারে যেখানে রঙটাই আসল। তখন তুমি কী করবে? হাতের কাছে প্রয়োজনীয় অথচ দুষ্প্রাপ্য রঙ নাও পেতে পারো। তখন যতোটা জোগাড় করা সম্ভব তাই দিয়ে কাজ করতে হবে তো? তাই করো। এখানে একই সঙ্গে দু'টি ফিল্টারকে কিন্তু কাজে লাগানো যেতে পারে। অর্থাৎ একটি ফ্রেমে দু'টি ফিল্টারের সংযোজন। এর একটা খারাপ দিক সম্পর্কেও তোমাদের সাবধান করে দিই,

একটি ফ্রেমে দু'টি ফিল্টার ব্যবহারের ফলে কিন্তু ফিল্টারগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।

মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাজ হবে কয়েকটিমাত্র ফিল্টার বেছে নেওয়া। কিছু ফিকে লাল আর কিছু নীল ফিল্টার। সচেতন থাকতে হবে মঞ্চে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ল্যানটার্নের ক্ষেত্রে ভিন্ন রঙ বেছে না নেওয়া। যদি দেখা যায় মঞ্চদৃশ্য চাইছে সবুজ এবং নীলে মেশানো একটি আলো তা হ'লে বাড়তি সবুজটা তো চাইই চাই। কারণ শান্ত, মিষ্টি এই দৃশ্যের জন্য শান্ত মিষ্টি আলোই প্রয়োজন। আর যদি চোখ ধাঁধানো নীল বা বেগনের দরকার হয়, সেক্ষেত্রেও অনুজ্জ্বল শান্ত ধরনের ফিল্টারকে কাজে লাগানোই হবে বুদ্ধিমানের কর্ম। দোকানে নানা ধরনের ফিল্টার থাকে, চাইলেই দোকানী যা তুলে দেবে। তা তোমার কাজে না লাগতেও পারে। সুতরাং ফিল্টার কেনবার সময় ভালো করে দেখেশুনে প্রয়োজন মাফিক ফিল্টারগুলো নিজেকে পছন্দ করে কিনতে হবে।

ফিল্টারের বিশদ

প্রথমেই বলে রাখি ফিল্টারগুলোকে 'সিনেমইড'-এর পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

(ক) যে সব ফিল্টারকে এমনিতে উজ্জ্বল অথচ আসলে ফ্যাকাশে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা-চিহ্নিত নাম: ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪। ৫১ ও ৫২ তে থাকে একটু সোনালী আভা। ৫৩ ও ৫৪তে পাওয়া যাবে ফিকে লালের আভাষ। আসলে ৫১ হচ্ছে ফিকে হলদে রঙের। সূর্যকিরণ দেখাবার জন্যে এটি ব্যবহার করা যায়।

(খ) খড় বা ধূসর রঙের জন্য ৩ কেই চিহ্নিত করা হয়েছে। ৪৭ একটু উজ্জ্বল রঙের আভা বিশিষ্ট। সামান্য একটু হলদে আভাও এর সঙ্গে মেশানো থাকে।

(গ) ২ ও ৪ এর রঙ হচ্ছে একটু উজ্জ্বল হলদে। অথচ ৫, ৩৩, ৩৪ এবং ৩৫ হচ্ছে চড়া ধরনের হলদে। রোমান্টিক দৃশ্যে পাত্রপাত্রীর মুখে এগুলো ফেলার রেওয়াজ রয়েছে।

(ঘ) ফিকে লাল রঙের মধ্যে ৭, ৯, ৭৮, ১০ এবং ১১ হচ্ছে আসল। বাস্তববাদী নাট্যে এগুলোকে উপযোগী বলে মনে করা হয়।

(ঙ) ১২, ১৩, ১৪, ২৫ ও ২৬ খুবই উজ্জ্বল ধরনের রং ধারণ করে। এগুলো ব্যবহৃত হয় বিপদ, খুনখারাবীর ক্ষেত্রে।

(চ) এর সঙ্গে ১, ৪৬, ৪৯ ব্যবহার করে সংগীত-মধুর দৃশ্য রচনা করা সম্ভব। এর মায়াবী তাৎপর্য লক্ষ্য করার মতন।

(ছ) খুব শান্ত অথবা ফ্যাকাশে রঙের জন্ম ব্যবহায ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪

(জ) ১৭ ও ৬৭ দু'টি মৌলিক স্টীল রঙ।

(ঝ) ৪৫ এবং ৬৫ এর চাইতে (১৭ ও ৬৭) একটু চড়া ধরনের রঙ

(ঞ) নীল রঙের সঙ্গে একটু সবুজ আভা চাই ? বেছে নাও ১৮ আর ৬১।

(ট) একটু গভীর কালো রঙ পেতে হলে চাই ৬১ ও ৪৩। এর সঙ্গে একটু নীল রঙের আভা মেশালেই যথেষ্ট।

(ঠ) ৬২ এবং ৬৩ হচ্ছে ধূসর ধরনের রঙ। এর ব্যবহার হয় আকাশের উপস্থাপনায়।

(ড) গাঢ় ধূসর রঙ বলতে ১৯ ও ৬৩। রাত্রির দৃশ্যপটে এর প্রয়োজন

(ঢ) ১৫ ও ১৬ হচ্ছে সবুজ নীলে মেশানো। কিন্তু ফিকে ধরনের সবুজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ৩৮ ও ৭৭।

(ণ) ২১, ২২, ২৩, ২৪ এবং ২৯ গাঢ় থেকে গাঢ়তর পর্যায়ে নিয়ে যাবার ফিল্টার।

(ত) ৩৬, ৪২ ও ৭২ হচ্ছে নিউট্রাল। বিভিন্ন রঙের ওপর এগুলো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া মঞ্চে যদি স্যানটানের অভাব থাকে তখন এ-তিনটি ফিল্টার বেশি করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(থ) ৬০ ব্যবহার করলে সব রঙের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যই নষ্ট করে ফেলা যায়।

(দ) ২৯, ৩০ ও ৩১ নম্বরকে সুবিধের জন্যই 'সিনেমইড' পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। যদিও এগুলিকে ঠিক রঙের পর্যায়ে ধরা ঠিক হবে না।

(ধ) ৩০ নম্বর-এর গুরুত্ব ফার্নিচার প্লটের ওপর ব্যবহারের জন্য।

(ন) ২৯ ও ৩০ দিয়ে মঞ্চে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করা সহজ। আলো ছড়িয়ে দেবার কাজেও এদের প্রয়োজন অনিবার্য। এই রঙ দু'টির আরও কিছু গুরুত্ব রয়েছে: যেমন আলোর মধ্যে কোমলতা রচনা করা, ব্ল্যাকবক্স বা পি সি লেন্স-সম্পন্ন স্পট-এ এ-দু'টি ব্যবহার করলেও নরম আলো পাওয়া যেতে পারে।

ডায়মেনশন্যাল রঙ: মঞ্চে যদি ডায়মেনশন্যাল আলোর কাজ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তবে আলোকবিজ্ঞানীকে ব্যবহার করতে হবে ভিন্ন ধরনের ফিল্টার। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উজ্জ্বল আলোর ব্যবহারের জন্য একদিক থেকে (মঞ্চের একপাশ) ব্যবহার করতে হবে ৫১। ঠিক এভাবেই নরম আলোর জন্য পার্শ্ব থেকে ব্যবহার করতে হবে ১৭ এবং ৬৭। ১৭ আর ৫৪ও একই কাজ দেবে। আলোর রঙের বৈচিত্র্যের দ্বারা দৃশ্যে সৌন্দর্য রচনা করতে মঞ্চের দু'পাশ থেকে গভীরতাকে বাড়াবার চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি দু'পাশ থেকে প্রতিফলিত আলো বৈষম্য সৃষ্টি করতে না পারে

তবে কিন্তু সংকট দেখা দিতে বাধ্য। জেনে রেখো, আলো নিয়ে কাজ করতে করতেই এর গভীরতা ও ভারসাম্য-বোধের জগতে একদিন তুমি পৌছে যেতে পারবে।

আলোর মিশ্রণ

তিনটি প্রাথমিক রঙের মিশ্রণ থেকে বাঞ্ছিত আলোকচ্ছটা ফুটিয়ে তুলতে যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, সেটি একেবারে বাতিল হয়ে না গেলেও কিছু পুরনো যে হয়েছে সে কথাটা কি অস্বীকার করা সম্ভব? অতীতে অভিনয়কালে পাত্র-পাত্রীদের ওপর যখন আলোকদ্যুতি ফেলা হতো তখন সাধারণত 'ফুট-লাইট' আর ব্যাটেন থেকে আলো ব্যবহার করার প্রচলন ছিলো। ওই ফুটলাইট এবং ব্যাটেন থেকে পরিবেশিত আলো ছিলো মোট চার রকম রঙের। এতে থাকতো প্রাথমিক তিনটি রঙ—লাল, সবুজ এবং নীল। আর থাকতো শাদা আলো। এখন মঞ্চালোকবিজ্ঞানের জন্য নানারক যন্ত্র, আলোক উৎস, আলোক বিচ্ছুরণের সাজসরঞ্জাম দিন দিন বাড়ছে এবং এর প্রয়োগও দেখা যাচ্ছে মঞ্চে। লাল আলোর ক্ষণ, নীল আলোর ক্ষণ, মিশ্রিত রঙের ক্ষণ তো রয়েছেই; পরন্তু লাল, নীল এবং মিশ্রিত রঙকে ঔজ্জ্বল্য দান বা শান্ত রঙে পরিবর্তন করার পদ্ধতি চালু হয়েছে। আবার এসব রঙের সমন্বয়ে 'ফিল-আপ' মুহূর্তেরও সৃষ্টি করা হয় মঞ্চে। তার মানে মঞ্চে ব্যবহৃত ল্যানটার্নগুলো থেকে পূর্ণ আলো ফেলা হলো কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 'ফুল আপ' মঞ্চ হলেও দেখা যাবে সমস্ত ল্যানটার্নগুলো পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে না।

তিনটি রঙের মিশ্রণকে সেখানেই কার্যকর হতে দেখা যায়, যেখানে দৃশ্যপটকে আলোকিত করবার জন্য সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে ফ্লাড-লাইটকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা ফিকে ধরনের রঙ সৃষ্টি করার চেষ্টা মানেই পণ্ডশ্রম। আবার লম্বা ধরনের 'ক্রসফেড'-এর ওপর রঙের ভারসাম্য সৃষ্টি করার কাজটিও অত্যন্ত কঠিন। এতে এমফ্যাসাইসড হয়ে যেতে দেখা গেছে মঞ্চস্থাপত্যকে। কারণ এর ওপর দিয়ে নানা রঙের প্রতিফলন বয়ে যায়। কাজেকাজেই নাট্যের প্রয়োজনে একই রঙের ফিল্টার ব্যবহার করা বিধেয়। তার মানে নাট্যের দৃশ্য ও দৃশ্যপটের রঙ হবে এক? এ নিয়েও কম বিতর্ক নেই। সে বিতর্ক উঠেছে ও উঠছে। হালে। মঞ্চে যখন প্রাকৃতিক কোনো দৃশ্য দেখাবার পরিকল্পনা করা হয়, সেখানে দেখা যায় আকাশ-এর দৃশ্যই প্রাধান্য পায়। কেন? সে প্রশ্ন নিয়েও ঝড় উঠেছে। তবু তিনটি রঙের মিশ্রণই দৃশ্যপটে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই তিনটি রঙেরর মধ্যে দু'টিই নীল! মঞ্চমায়া রচনার জন্য দৃশ্যপটের ওপরের দিকে যে আলো ফেলা হবে, নিচের দিকের আলোর সঙ্গে তার পার্থক্য থেকেই যায়।

রঙ নিয়ে অনুশীলন

রঙকে নয়, আলো নিয়ে আলাদা অনুশীলনের কাজ করা যেতে পারে। এই নিরীক্ষামূলক অনুশীলন থেকে মঞ্চালোকবিজ্ঞানের অনেক অজানা, অভাবিত এবং নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে। এতে নিজের মনোমতন কাজ করার চাবিকাঠিটিও হাতে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। যেমন ধরো :

১০ পিঙ্ক—৪ এ্যামবার—সূর্যাস্ত ৮ স্যালমন—২ „ =অগ্নিশিখা	৩৪ এবং ৩৫ এর সঙ্গে তুলনীয়
১২ ব্লু—১ ইয়োলো ১৬ ব্লু-গ্রীণ—২৪ গ্রীণ ৫০ ইয়োলো—১৭ স্টীল	গ্রীণ রঙের সঙ্গে এ-সব গ্রীণ তুলনীয়
৫৪ পিঙ্ক—১৭ স্টীল ৩৬ পিঙ্ক—৫০ ইয়োলো	গ্রে রঙ ৬০-এর সঙ্গেএ-সব তুলনীয়
৩৬ পিঙ্ক—১৭ স্টীল ৩৬ „ —৩ স্ট্র	৩৬ ও ৪২ এর সঙ্গে তুলনীয়।

এর সঙ্গে তোমাদের জানা দরকার, মান-সম্পন্ন সিনেমইড স্টেজ-ফিল্টার কতো রকমের হওয়া সম্ভব। এই তালিকা বিশেষ করে কাজে লাগবে প্রয়োজন অনুপাতিক নির্বাচনের জন্য। প্রথমে সংখ্যাভিত্তিক রঙের তালিকাটি লক্ষ্য করো :

১। হলুদ, ২। হালকা এ্যামবার, ৩। স্ট্র (খড়ের রঙ), ৪। মাঝারি এ্যামবার, ৫। কমলা ৬। গাঢ় কমলা, ৭। প্রাথমিক লাল, ৮। হালকা গোলাপী, ৯। গাঢ় স্যালমন, ১০। হালকা স্যালমন, ১১। মাঝামাঝি গোলাপী, ১২। কালচে পিঙ্ক, ১৩। গাঢ় গোলাপী, ১৪। ম্যাজেন্টা, ১৫। রুবী, ১৬। ময়ূরপঙ্খী নীল, ১৭। নীলচে সবুজ, ১৮। স্টীল নীল, ১৯। হালকা নীল, ২০। কালচে নীল ২১। গাঢ় নীল, ২২। মটর সবুজ, ২৩। মস সবুজ, ২৪। হালকা সবুজ, ২৫। কালচে সবুজ, ২৬। পার্পল, ২৭। মভ, ২৮। ধোঁয়াটে পিঙ্ক, ২৯। হেভি ফ্রস্ট, ৩০। হালকা ফ্রস্ট, ৩১। মাঝারি নীল, ৩২। গাঢ় এ্যাম্বার, ৩৩। সোনালী এ্যাম্বার, ৩৪। গাঢ় সোনালী, ৩৫। পেল ল্যাভেণ্ডার, ৩৬। পেল সবুজ, ৩৭। প্রাথমিক সবুজ, ৩৮। প্রাথমিক নীল, ৩৯। উজ্জ্বল নীল, ৪০। পেল ভায়োলেট, ৪১। পেল নেভি-ব্লু, ৪২। দিনের আলো, ৪৩। ক্রোম হলুদ, ৪৪। এ্যাপ্রিকট,

উজ্জ্বল গোলাপী, ৪৬। ক্যানারি, ৪৭। পেল হলদে, ৪৭। গোল্ড মিস্ট, ৪৮। পেল গোল্ড, ৪৯। পেল স্যালমন, ৫০। পেল রোজ, ৫১। চকোলেট টিন্ট, ৫২। পেল চকোলেট, ৫৩। জিঙ্ক, ৫৪। পেল গ্রে, ৫৫। স্লেট ব্লু, ৫৬। টারকোইস, ৫৭। ৫৮। মাঝারি লাল, ৫৯। পেল রেড, ৬০। স্টীল টিন্ট. ৬১। জিভোল ব্লু, ৬২। এরিয়েল ব্লু, ৬৩। ল্যাভেণ্ডার, ৬৪। স্ট্র টিন্ট, ৬৫। রেড ফ্রস্ট, ৬৬। পেল গোল্ডেন রোজ, ৬৭। গ্রীন টিন্ট, ৬৮। স্যালমন টিন্ট।

এবার লক্ষ্য করো বর্ণানুক্রমিক সিনেময়েড স্টেজ-ফিল্টারের তালিকা চার্ট :

হলুদ-এ্যাম্বার-লাল				
পেল ইয়েলো	—	ক্রোম ইয়েলো	—	ডিপ গোল্ডেন
স্ট্র টিন্ট	—	গাঢ় এ্যাম্বার	—	এ্যাম্বার
স্ট্র	—	সোনালী এ্যাম্বার	—	পেল রেড
হলুদ	—	গাঢ় স্যালমন	—	মাঝারি লাল
ক্যানারি	—	এ্যাপ্রিকট	—	প্রাথমিক লাল
হালকা এ্যাম্বার	—	কমলা	—	লাল ফ্রস্ট
মাঝারি এ্যাম্বার	—	গাঢ় কমলা	—	রুবী

নীল-পার্পল-বেগনী				
টারকোইস	—	পেল ব্লু	—	ব্লু ফ্রস্ট
নীলচে সবুজ	—	জিস্ল্ ব্লু	—	আকাশী নীল
ময়ূরপঙ্খী নীল	—	হালকা নীল	—	গাঢ় নীল
এরিয়েল নীল	—	উজ্জ্বল নীল	—	পার্পল
স্টীল টিন্ট	—	স্লেট নীল	—	মভ
দিবালোক				

ল্যাভেণ্ডার-সোনালী-পিঙ্ক				
পেল বেগনী	—	পেল স্যালমন	—	ডার্ক পিঙ্ক
ল্যাভেণ্ডার	—	পেল গোলাপী	—	স্যালমন পিঙ্ক
পেল ল্যাভেণ্ডার	—	হালকা স্যালমন	—	উজ্জ্বল গোলাপী
গোল্ড টিন্ট	—	হালকা গোলাপী	—	গাঢ় গোলাপী
পেল গোল্ড	—	পিঙ্ক	—	ধোঁয়াটে পিঙ্ক
পেল সোনালী গোলাপী	—	মাঝারি গোলাপী	—	ম্যাজেন্টা

গ্রীন-নিউট্রাল-রাস্ট				
গ্রীন টিন্ট	—	প্রাথমিক সবুজ	—	পেল চকোলেট
পেল গ্রীন	—	নীলচে সবুজ	—	পেল গ্রে
পী (মটর) গ্রীন	—	টারকোইস	—	হালকা রাস্ট
মস্ গ্রীন	—	ময়ূরপঙ্খী নীল	—	হেভি রাস্ট
হালকা সবুজ	—	চকোলেট টিন্ট	—	ক্লিয়ার
কালচে সবুজ	—			

১১

নাট্যে আলোর আল্পনা অঙ্কন : অনুশীলন ও সৃজনশীল রচনা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলী, জানলার ভেতরে, জানলার বাইরে, মঞ্চের পেছনের পট, অভিনয় এলাকা, মঞ্চে ঝোলানো আলো, আলোকসম্পাতের ভারসাম্য, ভিপ্রসেনিয়াম মঞ্চে আলোর কাজ, গেট···

নাট্যে আলোর কাজের প্রধান সহযোগী কী? মঞ্চস্থাপত্য। অর্থাৎ দৃশ্যসজ্জা। এই ব্যাপারটির ওপর মঞ্চে আলোক-সম্পাতের মান ওঠানামা করে। প্রথমত দেখতে হবে দৃশ্যসজ্জার উপকরণগুলো কী কী এবং কেমন। তাকে কিভাবে মঞ্চে দাঁড় করানো হয়েছে, তার কোনো অংশে ছাদের আভাস আছে কিনা। এতে জানলা কটি এবং তা কোন কোন জায়গায় বসানো হয়েছে। দরজা আছে কিনা এবং তা কোথায় বসানো হয়েছে। জানলা ও দরজায় পর্দা ব্যবহৃত কিনা এবং সেই পর্দার রঙ কী কী? আকাশ দেখবার মতো ফাঁক রয়েছে কিনা। দেওয়াল থাকলে তার বয়স কতো, রঙ কী (বিষয়টি দরজা ও জানলার ক্ষেত্রেও ব্যবহার্য ;, দৃশ্যসজ্জা একতল না দ্বিতল। যদি দ্বিতল হয় তবে সিঁড়িটা কোনদিকে স্থাপিত। প্ল্যাটফর্ম-এর ওঠানামা আছে কিনা এবং তার প্রত্যেকটির গঠন-চরিত্র কেমন। গাছগাছালি বা তার অংশ ব্যবহৃত কিনা, ব্যাকিংস বলতে কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা। নাকি কালো পর্দার সামনে প্ল্যাটফর্ম-এর ওঠানামা। র-স্ট্রাম্প এবং ফার্নিচার প্রপ থাকলে তা কেমন ; মঞ্চের কোথায় তার অবস্থিতি? চরিত্ররা কোনদিক থেকে বেশিবার আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে একটি সার্থক নাট্যের উপস্থাপনা উদাহরণস্বরূপ হাজির করা হোক। ধরা যাক নাটকটির নাম 'বনবাস'। এর প্রথম দৃশ্যটি অভিনীত হচ্ছে একটি বেশ বড়ো ধরনের ঘরে। তাতে জানলা একটি, দরজা ২টি—একটি বাইরে যাওয়ার, একটি ভেতর বাড়ির দিকে। যথাক্রমে ব্যাকস্টেজে এবং মধ্যস্থ ডান ব্লকের প্রান্তে। জানলা খুললে বাইরের সবুজ প্রকৃতির আভাস চোখে পড়ে। ফার্নিচার প্রপ বলতে একটি তিনজন বসার মতন সোফা নিম্ন-মধ্যম ব্লকে, তার ডান ও বাঁ-পার্শ্বে যথাক্রমে একজন করে বসার সোফা। বাড়িটি পুরনো। ঘরের রঙ হালকা সবজে—দীর্ঘদিন রঙ না করায় তা মলিন হয়ে এসেছে। দরজায় একটি পর্দা—বেগনী রঙের। জানলার পর্দাটির রঙ সোনালী হলুদ। ছাদের আভাস রয়েছে।

নাটকটি শুরু হচ্ছে ভোর ভোর সকালে।

এবার মঞ্চালোক-নির্দেশকের কাজ হবে মূল নাট্যনির্দেশকের সঙ্গে আলোচনায় বসা। আচ্ছা দৃশ্যটির সময়সীমা কতোটুকু? পজ-এ্যাকটিং-এর সময় কতোটা? মঞ্চে যখন নায়িকা ঢুকলেন তাঁর পোশাক-আশাক কেমনভাবে পরা থাকবে এবং রঙের ম্যাচিং কী হবে? জানতে হবে চরিত্রটির রূপরাগের ডিটেল এবং কোন রাগসংগীতের সুর দিয়ে আরম্ভ হচ্ছে নাট্য। পরন্তু আবহ সহযোগিতার পরিকল্পনাটি কী? যদি দু'জন চরিত্র প্রবেশ করে, অথবা তার চাইতে বেশি—তারও বিশদ এবং বিচলনের পরিকল্পনা, কম্পোজিশন, পিকচারাইজেশন জেনে নিয়ে মঞ্চালোক-নির্দেশককে লাইটিং-প্লট বা আলোক-প্রক্ষেপণের নকশা রচনা করে ফেলতে হবে। কতোটা কৌণিক দূরত্ব থেকে কোন আলো, কোন ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে—একটি চৌকোনো অঙ্কিত সীমার মধ্যে খোপ খোপ করে প্রত্যেকটি আলোকযন্ত্রের ক্রিয়া, ফোকাসের ব্যবহার ইত্যাদি বিশদে লিখে নিলে কাজের সময় কোনোই অসুবিধে থাকবে না। অবশ্য মহলায় উপস্থিত হতে হতেই নকশাটা মাথায় গিজ্ গিজ্ করবে। এবার ওই নকশা নিয়ে নাট্যনির্দেশকের সঙ্গে বসে চূড়ান্ত করে নিতে হবে সমগ্র প্ল্যানিং।

যদি দৃশ্য চলাকালীন সূর্যোদয় ঘটে এবং সূর্যোদয়ের পর কতোক্ষণ সময় দৃশ্যটি মঞ্চে অভিনীত হবে সেটা জেনে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে নাট্যনির্দেশক বাচনপ্রতীক আলোর কাজও প্রয়োজনীয় মনে করতে পারে। মঞ্চভূমির কোন এলাকায় কখন কোন চরিত্র থাকবে এবং ওই চরিত্রদের সংলাপ বিনিময় কোন রসসৃষ্টি করবে যা করতে এগোবে—সেটাও জেনে নিলে মঞ্চালোক-নির্দেশনার কাজটি হবে সহজ এবং সাবলীল। মঞ্চে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জামাদির কোনটা কোথায় থাকবে পরন্তু বিশেষ কোনো মঞ্চ-উপকরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে কিনা—সে বিশদটাও জানা না থাকলে কিন্তু অসুবিধের সৃষ্টি হতে পারে।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলী

আসল কথাটা হলো স্টাইল। অভিধানিক অর্থ: বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলী। ওয়ার্লড বুক এনসাইক্লোপেডিয়ার মতে: In the way ideas are expressed by artist. আর্টের ক্ষেত্রে এটাই কিন্তু আসল। নাট্য যে-চরিত্রেরই হোক না কেন, অথবা যে শ্রেণীর—প্রকৃতিবাদী, বাস্তববাদী, প্রতীকী ইত্যাদি ইত্যাদি—মঞ্চে এলেই তা বাস্তব। এই বাস্তবতা কিন্তু জীবন বা সমাজের বাস্তবতা নয়, আসলে এটা মঞ্চের নিজস্ব বাস্তবতা। এ-সম্পর্কিত আলোচনা নাট্যবিজ্ঞানের আগের তিনটি খণ্ডেই করা হয়েছে।

আবার অল্প কথায় বলি, নাট্য আসলে বাস্তবের অনুকরণ যদিও কিন্তু মূলত অভিনয়-কালে প্রাধান্য আরোপ করতে হবে মঞ্চের নিজস্ব বাস্তবতার ওপর। মঞ্চালোক-প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তব আর প্রকৃতি দু'টিই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাৎপর্যপূর্ণও বটে। মঞ্চালোক-সম্পাতকারীকে সব সময় মনে রাখতে হবে, মঞ্চে যাই ঘটুক তার কাজটি কিন্তু বাস্তবই। কেন বলতো? কারণ মঞ্চালোক বাস্তব জীবনকেই ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব নেবে। যেমন ধরো, রাত্রেও দিনের আলো দেখতে হয় তো তোমাকে?

জানলার বাইরে ও ভেতরে

মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর বিভিন্ন বোঝাপড়ার পর্বগুলোর কথা আগেই বলেছি। মডেল নির্মাণ, ছক রচনার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এবং এই পরিচ্ছেদেই জানলার কথা উল্লেখ করেছি। এবার সত্যি সত্যিই জানলায় আলোর কাজ প্রসঙ্গ আসছে। মঞ্চদৃশ্যে জানলা আছে ধরে নিলাম। এবার মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর করণীয় কী কী কাজ?

(ক) তাকে জানতে হবে যে-ঘরে জানলা আছে সেই ঘরসহ বাড়িটির বয়স কতো;

(খ) যে পরিবার বাস করে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন;

(গ) ঘরের কোন দেওয়ালে অর্থাৎ কোন দিকে জানলা অবস্থিত;

(ঘ) জানলায় কোনো পর্দা আছে কিনা;

(ঙ) একখণ্ড পর্দা নাকি দু'খণ্ড—যা দু'দিকে টেনে সরানো যেতে পারে ও টেনে বন্ধ করা যায়;

(চ) জানলার কাছাকাছি কোনো ফার্নিচার রয়েছে কিনা;

(ছ) ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে, নাকি বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা নেই;

(জ) ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক বাল্ব (একাধিক বাল্বও থাকতে পারে) আছে কিনা এবং তার পাওয়ার কতো;

(ঝ) বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা না থাকলে কোন ধরনের বাতি জ্বলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার জানলার বাইরে আসা যাক। এখানকার পরিবেশটি কেমন? গাছগাছালি আছে কি নেই। যদি থাকে তবে সেই গাছগাছালির সন্নিবেশ ঘন না পাতলা? কোন ধরনের গাছ গাছালি? লম্বা না ঝাকড়া? ঝোপঝাড় আছে, নাকি আছে ফুলের বাগান অথবা শস্যক্ষেত্র? দূরে কোনো পথের চিহ্ন, জলার অংশ, পুকুরঘাট, কুঁয়ো, ইঁদারা অথবা টিউবওয়েল আছে কিনা? নাকি কেবল, বাড়ির পর বাড়ি—কদাচিৎ এক আধটি গাছের অস্তিত্ব? পট: গ্রাম না শহর? শহরের মধ্যভাগ না প্রান্তসীমা?

এবার আসি সেই জায়গায় যেখানে সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোন ঋতু? কোন মাস? দিন না রাত্রি? কারণ এমনও হতে পারে তো যখন ঝুমকো জবার গাছে থোক থোক জবা ঝুলছে, অথবা পলাশ ফুলের রক্তিম রাগ দৃষ্টি লুকে নিচ্ছে; আমগাছের শাখায় শাখায় মুকুলের হাসি?

নাট্যবিজ্ঞানীকে মনে রাখতে হবে, সময় যা হবে তার আলোর আল্পনা হুবহু তাকেই তুলে ধরবে দর্শকদের চোখে। এবং তা ওই জানলা দিয়েই। আমরা জানি প্রকৃতির রয়েছে অনেক উৎস। দিনের বেলা আলো দান করে সূর্য। রাত্রে চাঁদ। মঞ্চস্থিত জানলা দিয়ে বাইরের যা কিছু দেখা যায়, প্রাকৃতিক আলোই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে। বাড়িঘর, অন্য বাড়ির ছাদ, গাছগাছালি, শস্য ক্ষেত্র, ঝোঁপঝাড়, ফুলের বাগান-সবই। আর জানলা দিয়ে যে আলো এসে ঘরে পৌঁছে তা হয় সূর্যকিরণ নয়তো জ্যোৎস্না। সরাসরি এদের ঘরে আসার সুযোগ মেলে খুব কম ক্ষেত্রেই। তা হ'লে কোন আলো আমরা দেখতে পাই? উত্তর: অধিকাংশই প্রতিফলিত আলো। গাছগাছালি, ঝোপঝাড়, বাড়ি এ-সবের ওপর পড়া আলো প্রতিফলিত হয়ে জানলা দিয়ে প্রবেশ করে। তার মানে বিষয়টি যতো সহজ ভাবা যায় ততো সহজ তো নয়ই বরং অনেক জটিল। মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর দৃষ্টি, উপলব্ধি ও বিকাশভঙ্গির জ্ঞান টনটনে থাকলে কিন্তু কাজটি করে তুলতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক মিনিট। মঞ্চে ব্যবহৃত আলো কি একমুখী উৎস থেকে আসতে পারে? কিছুতেই না। তা হ'লে? আসলে এই আলো আসে বিভিন্ন উৎস থেকে। মঞ্চস্থিত দৃশ্যসজ্জা, আসবাবপত্র প্রভৃতির ওপর যে আলোর প্রতিফলন দেখা যায়—তা কিন্তু নিয়ন্ত্রিত আলোকরশ্মি। নিয়ন্ত্রিত আলোকরশ্মির জন্য দু' প্রস্ত আলোক-সরঞ্জামের প্রয়োজন। একপ্রস্ত সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দিয়ে জানলার বাইরে আলোকচ্ছটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে—যাতে দর্শকদের চোখে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে পারে। আরেক প্রস্ত আলো ব্যবহৃত হবে জানলার বাইরে থেকে আলোককে মঞ্চে পৌঁছে দিতে। অবশ্যই জানলার ভেতর দিয়ে। যদি জানলার বাইরে বৃক্ষসারির মধ্য দিয়ে আকাশ দেখা যায়, তা হ'লে কী করতে হবে? ওপরের দিকে ঝোলাতে হবে একটি ফ্লাড্-লাইট। জানলার বাইরের পরিবেশ বুঝে আলোক যন্ত্র, সরঞ্জাম এবং আলোর রঙ নির্বাচন করতে হবে। জানলার বাইরের আলোক-পরিকল্পনাটি কিন্তু রচনা করতে হবে জানলার ভেতরের দৃশ্যপটে কী ধরনের আলো ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে। রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ-কথাটি প্রযোজ্য।

জানলার বাইরের আকাশটা যদি গাঢ় নীল হয় তা হ'লে কী করতে হবে? গাঢ়

নীলই কি ব্যবহৃত হবে? এক্ষেত্রে দেখতে হবে জানলার বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশটি কেমন। সবুজ গাছগাছালি থাকলে গাঢ় নীল কি প্রকৃত বাস্তব মায়া রচনা করতে পারবে? অথবা যদি থাকে কাশফুলের সারি-তা হ'লে? এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান আলোক-বিজ্ঞানীর কাজ হবে অন্য ফিকে ধরনের নীল রঙ ব্যবহার করা। এখানে দু'টি বৈষম্যমূলক নীল ফিল্টার যদি ব্যবহার করা যায় তা হ'লে কিন্তু বাঞ্ছিত পরিবেশটি রচনা করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যদি বাইরের আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘমন্দ্রিত হয়? সে ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি ফিল্টারকে কাজে লাগাতে হবে। বারবার বলেছি, আবার বলছি, পরিপ্রেক্ষিত বুঝে কিন্তু রচিত হবে মঞ্চালোক-পরিকল্পনা। জানলার বাইরের আকাশ ও প্রকৃতিকে বাস্তবমুখী মায়ায় পৌঁছে দিতে গেলে ওপর ও নীচ দু'দিক থেকেই আলো ব্যবহার করা ভালো। এতে কোনো জটিলতা থাকবে না, ফাঁকও না। সব সময় দেখতে হবে, জানলার বাইরে ব্যবহৃত আলোক-সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি যেন দর্শকদের দৃষ্টিগোচরে না আসে। এর জন্য আলাদা একটি গ্রাউণ্ড প্ল্যানিং করে নেওয়া দরকার। নীচ থেকে এ-ক্ষেত্রে দৃশপটে যে আলো ব্যবহার করা হবে তাতে তিনটি রঙ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি নীল রঙ। আর থাকবে সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আলোর রঙ। যদি জানলার অদূরে কোনো মন্দির, মসজিদ, গীর্জার চূড়া দেখাতে হয়, সেক্ষেত্রে একটি স্পট কাজে লাগবেই লাগবে।

এবার এসো, আমরা ঠিক উল্টো দিকটার কথা ভাবি। অর্থাৎ জানলার বাইরে থেকে যে আলো মঞ্চে এসে পড়বে জানলারই ভেতর দিয়ে—সেক্ষেত্রে আলোক-বিজ্ঞানীর করণীয় কী? নিয়মমতো এখানে ফ্রেনেল স্পট ব্যবহার করাই ভালো। এক বা একাধিক। অবশ্য প্রয়োজন মাফিক। ফ্রেসনেল স্পট ব্যবহারের সুবিধেটা কী জানো? শুনে রাখো: এতে অতিরিক্ত ছায়ার সৃষ্টি হবে না। অবশ্য স্পটগুলো কোথায় কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার একটা কাঠামো বা ছকও করে নিতে পারা যায়। জানলা ও আকাশের মধ্যবর্তী জায়গায় এগুলো ঝোলানো যেতে পারে। কিন্তু এমন একটি কৌণিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যার দ্বারা জানলার ওপরের দিকের অংশকে আলোকিত করা সম্ভব। মঞ্চের মেঝেও এর দ্বারা আলোকিত করা যায়। আলোকিত করা যাবে জানলার নিকটস্থ মঞ্চের পাত্রপাত্রীদেরও। এমনকি এই আলো মঞ্চের ফার্নিচার প্রটকে সমুজ্জ্বল করতেও সাহায্য করে থাকে। মোটামুটি উচ্চতা-বিশিষ্ট জানলাকে সুন্দরভাবে আলোকিত করতে দু'জোড়া ফ্রেসনেল স্পটই যথেষ্ট। প্রত্যেকটি জোড়ায় লাগবে একটি করে রঙ। জোড়ার মধ্যে একটি ল্যানটার্ন

এমনভাবে পাশাপাশি স্থাপন করা দরকার যাতে জানলাটি সুস্পষ্টভাবে দর্শকদের চোখে পড়ে। এই দু'জোড়া ফ্রেসনেল স্পটের একজোড়ায় থাকবে হলুদ রঙ, অন্য জোড়ায় নীল। এর দ্বারা একটি ত্রিমাত্রিক রঙের সৃষ্টি করা যেতে পারে। অবশ্য এটা হবে মিশ্রণের ফল। সময় যদি সকাল হয়, তবে উভয় রঙই ব্যবহার করা যেতে পারে। দুপুর হ'লে হলদে রঙটা কাজে লাগবে। সূর্যাস্তের সময়েও। কেবল চাঁদের আলোর ক্ষেত্রে হাত বাড়াতে হবে নীল রঙের দিকে। জানলার নীচের অংশে যখন অস্তাচলগামী সূর্যের আলো এসে পড়ে তখন সে আলো খুব নীচু কোনো কোণ থেকে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। কিংবা যখন সদ্য উদিত সূর্যের আলো এসে পড়ে ছাদের ওপরে—দিগন্ত থেকে; তখনও ওই নীচু কৌণিক বিন্দু থেকেই আলো ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। সব সময়েই মনে রেখো, জানলার পর্দাটা কিন্তু আলোক-প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মঞ্চের অভ্যন্তর: পেছনের পট

জানলার বাইরে থেকে এবার আসা যাক মঞ্চের ভেতরের দৃশ্যে। পেছনের পট মানে 'ব্যাকিংস'। এখানে একটি আলো ব্যবহার করলে দরজার মধ্যভাগের অংশটিকে আলোকিত করতে অন্য একটি আলো থাকলে ভালো হয়। খোলা দরজা হ'লে একটি স্পট ব্যবহার করা যেতে পারে। এই স্পটের দ্বারা দু'টি কাজ একই সঙ্গে সম্পন্ন করাও সম্ভব: দরজার খোলা অংশ এবং পাত্রপাত্রীদের প্রয়োজনমাফিক প্রবেশ ও প্রস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা। যদি এখানে কোণাকুণি আলোকসম্পাতের কোনো পরিকল্পনার কথা তোমাদের মাথায় আসে তখন সতর্ক থাকতে হবে যে, পাত্রপাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় মঞ্চে যেন তাদের ছায়া পড়ে। বেশিরভাগ মঞ্চালোকবিজ্ঞানীই জানেন না যে, চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান নাট্যের সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ অংশের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমেই নাট্যনির্দেশক অনেক কথা বলতে পারে (দ্রষ্টব্য নাট্যবিজ্ঞান-৩/প্রয়োগবিজ্ঞান)। যদি দৃশ্যসজ্জার ব্যাকিংস বা তার সংলগ্ন দৃশ্যপট আলোর গভীরতায় আচ্ছন্ন থাকে তা হ'লে দর্শকদের কাছে অভিনয়শিল্পীদের গুরুত্ব কমে যায়—একথা আগেও বলা হয়েছে। তার মানে আমি বলতে চাইছি, পেছনের আলো যতো নরম ও সরল হবে ততোই সুবিধে। স্পট এখানে ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী ফ্লাড। এছাড়া ছোট এক ধরনের ক্লু লাগানো স্পটকে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে ব্যবহার করে দেখা গেছে, তার আলো সব থেকে বেশি কার্যকর।

অভিনয় এলাকা

মঞ্চ-বিভাজন সম্পর্কিত সচিত্র আলোচনা যথাক্রমে নাট্যবিজ্ঞান-১, নাট্যবিজ্ঞান-২ ও নাট্যবিজ্ঞান-৩ এ করা হয়েছে। এই গ্রন্থ থেকেই জেনে নিতে পারবে কেন মঞ্চভূমির বিভাজন প্রয়োজন। কেউ নয়টি ভাগে, কেউ পনেরোটি বা তারও বেশি অংশে মঞ্চকে ভাগ করে থাকেন। এই অংশগুলি অবশ্যই অঙ্কিত থাকে না কিন্তু মঞ্চবিভাজন ও তার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কিত একটা ছক মঞ্চস্থপতি, নির্দেশক ও মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাছে থাকে। আসলে কি জানো? সমগ্র নাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শক কেবল একটি এলাকা-কেই দেখতে পায়—তা হ'লো সমগ্র মঞ্চটি। আমি আগে 'বনবাস' নাটক সম্পর্কে কিছু বলেছি। নাটকটি আরম্ভ হচ্ছে ভোর ভোর সকালে। প্রথমে একজন মহিলা ভেতর বাড়ি থেকে দরজা দিয়ে মঞ্চের হল-ঘরে প্রবেশ করছে। আস্তে আস্তে সে এসে দাঁড়াচ্ছে জানলার কাছে। জানলার পর্দা খুলে সে বাইরে তাকাচ্ছে। পরে ওই একই প্রবেশ পথ ধরে আসছে একজন বৃদ্ধ চাকর। প্রথমে সে থমকে দাঁড়িয়ে যাবে মহিলাকে দেখে। পরে আস্তে আস্তে এগোবে মহিলার দিকে। এর মধ্যে বাইরের দরজা দিয়ে রেল স্টেশন থেকে সরাসরি এখানে এসে প্রবেশ করে এক মহিলা। ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের ফার্নিচার প্লটিং-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। আস্তে আস্তে বেলা বাড়ে, সূর্য ওঠে। এবার আসা যাক দ্বিতীয় দৃশ্যে। একটা পুরনো বাগানবাড়ির ঘর। ফার্নিচার প্লট বলতে রয়েছে একটি স্টীলের খাট, সোফাসেট, সাদা পাথরের বড়ো টেবিলের ওপর একটা সেতার। দেওয়ালের রঙ কিঞ্চিৎ মলিন সবুজ। জানলা একটি। দরজা তিনটি। একটি প্রবেশের দরজা, একটা ভেতর বাড়ির বাগানে যাবার দরজা। জানলাটি আপাতত বন্ধ রয়েছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে—বাগানের দিকের দরজা দিয়ে দেখা যায়। চরিত্র একজন। সে ঘনঘন হাতঘড়ি দেখছে এবং ব্যস্তসমস্ত হয়ে পায়চারি করছে। কিছুক্ষণ পরে ঢুকলো এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। ব্যস্ত লোকটি বাধ্য হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। তার রেইনকোট খুলে নিয়ে কোণের দিকের ব্রাকেটে রাখলো। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সোজা এসে সোফায় বসলো। ব্যস্তসমস্ত লোকটি ইতিমধ্যে বার কয়েক সোফাসেট চক্কর দিয়ে এসেছে। শুরু হলো সংলাপ। মঞ্চ বিভাজন থেকে বোঝা যাবে কোন চরিত্রের কোন পর্যন্ত বিচলন। তার ক্রিয়া কী। এ-ছাড়া মঞ্চের কোন এলাকায় কোন ফার্নিচার রয়েছে (নাট্যবিজ্ঞান-৩ এর বিচলনবিজ্ঞান দ্রষ্টব্য)। এরই ভিত্তিতে আলোকসম্পাতের ছক বা নকশা রচনা করতে হবে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে। তার মানে মঞ্চ-বিভাজনজনিত প্রত্যেকটি অংশ সম্পর্কে তাকে বিশদভাবে জেনে ও বুঝে নিতে

হবে। মঞ্চে আলোকসম্পাতের সমস্ত ব্যবস্থা পরিকল্পনানুযায়ী সমাপ্ত হবার পর, অভিনয়শিল্পীরা দৃশ্যের কোন কোন এলাকায় অভিনয় করবে সে-সব জায়গায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মঞ্চালোকবিজ্ঞানী পরীক্ষা করে নেবে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী তার দাঁড়ানো এলাকাগুলোতে আলোকসম্পাতের কাজ ঠিকঠিক হচ্ছে কিনা। এতেই বোঝা যাবে কোথায় কেমন এবং কী ধরনের অসুবিধে হতে পারে। সেই অসুবিধে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই যে পদ্ধতি—এর সঙ্গেই মঞ্চ বিভাজন পদ্ধতির ও নকশার সম্পর্ক গভীর। আবার এমন মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কথাও জানা আছে যিনি মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আলোক-পরিকল্পনার কাযকর অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন না। তিনি বসে থাকেন দর্শকদের আসনে একটি মাউথপিস হাতে নিয়ে, মঞ্চে দাঁড় করানো হয় অন্য লোককে। মঞ্চালোকবিজ্ঞানী তখন দর্শকদের দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যক্ষণগুলো বিচার করে আলোকসম্পাতের দোষত্রুটি সংশোধন করে নেন।

মঞ্চে ঝোলানো আলো

এ-ক্ষেত্রে কিন্তু কেবলই মঞ্চবিভাজন পরিকল্পনাকে কাজে লাগানো হয় না। এর সঙ্গে সৃজনশীল মঞ্চালোক-নির্দেশনাকেক কাজে লাগিয়ে আলো ব্যবহারে নতুন মাত্রা সংযোজন করা যায়। আর তার জন্যই প্রয়োজন Fan-setting system—অর্থাৎ মঞ্চে ঝোলানো আলো।

মঞ্চে একজোড়া স্পট যখন ব্যবহার করা হয় তখন তা থাকে অভিনয়শিল্পীর অবস্থানের দুই পাশে। কেন? কারণ এর ফলে অভিনয়শিল্পীর মুখের দু'পাশই স্পষ্ট হয় এবং দর্শকদের দেখার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধের সৃষ্টি হয় না। এবার মঞ্চটিকে তিনটি ছক-এ ভাগ করা যাক। তার মানে এই তিনটি মঞ্চ-এলাকার জন্য প্রয়োজন হবে ছয়টি স্পট-এর।

এবার এসো উদাহরণে।

অ আ ই
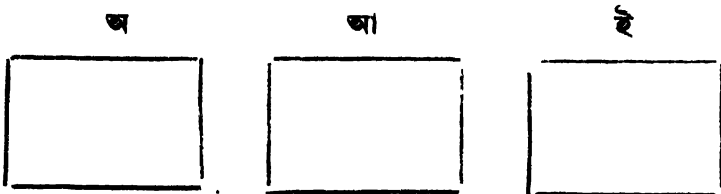
ওপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে যে-অভিনয়শিল্পী মঞ্চের 'অ' এলাকায় অবস্থান করছে তার জন্য ১ ও ৪ নম্বর স্পট। মঞ্চের 'আ' এলাকায় দাঁড়ানো অভিনয়শিল্পীর জন্য ২ ও ৫ নম্বর স্পট এবং ই এলাকায় দণ্ডায়মান অভিনয়শিল্পীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে ৩ ও ৬ নম্বর

স্পট। এবার লক্ষ্য করো ১, ২, ৩ নম্বর স্পট বৈদ্যুতিক পাখার মতন ঝোলানো। হয়েছে একপাশে, অন্য পার্শ্বে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৪, ৫ ও ৬ নম্বর স্পট ঠিক একইভাবে। তার মানে স্পটগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে অভিনয়শিল্পীদের স্থান পরিবর্তন তথা বিচলন-এর ওপরেও সমান মানের আলো পড়তে পারে। মঞ্চের পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও কোণাকুণিভাবে আলোর ব্যবহার সহজ হয়ে উঠতে পারে। আর একটি মস্ত সুবিধে এতে পাওয়া যায় যে, যেহেতু মঞ্চ এলাকায় সমতলভাবে আলো ব্যবহৃত, সে কারণেই স্পটগুলির জন্য আলাদা আলাদা ডিমার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। আবার প্রসেনিয়াম আর্চ-এর পেছন দিকে একটি ঝুলন্ত 'বার' ব্যবহার করে স্পটকে কাজে লাগানো হয়েছে। ঠিক এইভাবে পনেরো ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মঞ্চে পাঁচ ফুট অন্তর অন্তর এই 'বার' ব্যবহার করে ঝুলন্ত স্পটগুলোকে দিয়ে কাজ করানো যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, মঞ্চের একেবারে পেছনের দিকে ব্যবহার করতে হবে সব থেকে উঁচু 'বার'। সাধারণ একটি নাট্যের ক্ষেত্রে দু'টি ঝুলন্ত স্পটই মঞ্চ আলোকিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়। তবু মঞ্চের পেছন দিককার স্পট-বার থেকে আলোক প্রক্ষেপণের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা ঠিক হবে না। এবার আসা যাক মঞ্চের সম্মুখভাগে। এখানে প্রয়োজন FOH. মঞ্চস্থাপত্যের সুবিধের জন্য যেখানে FOH ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যাবে, সেখানে FOH লাগানো দরকার। মনে রেখো গুণগত দিক থেকে FOH এবং বার-স্পটের আলোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য অনেক। তবু দু' ধরনের আলোই কাজে লাগাতে হয়। সুতরাং মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীর ভারসাম্যবোধের প্রয়োজন।

মঞ্চে আলোক-সম্পাতের ভারসাম্য

মঞ্চালোক মারফৎ ব্যঞ্জনা রচনা করার কাজটি খুব সহজ বলে মনে করা হয় না কিন্তু মঞ্চালোকবিজ্ঞানী হাতে কলমে কাজ করতে করতে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে যে, ওই কাজটি তার কাছে জটিল মনে নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য-বোধের মূল্য সব থেকে বেশি। এই বোধ আসে উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, সৃষ্টির প্রেরণা থেকে।

একজন বিখ্যাত মঞ্চালোকবিজ্ঞানী আমাকে তাঁর একটি জটিল আলোক-পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন এবং ভারসাম্য রচনার ক্ষেত্রে এই জটিলতা কীভাবে সাহায্য করে নকশা এঁকে তিনি তা আমাকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই পরিকল্পনা

আমাকে কেবল অবাকই করে নি, তার প্রত্যেকটি বিশদ কোনো কারণেই বিস্মরিত হওয়ার নয়।

এ-প্রসঙ্গে সেই জানলাঅলা ঘরে আমরা চলে যাই। সেই বিখ্যাত আলোক-বিজ্ঞানীকে জানলার দৃশ্যের কথা বলায় তিনি বললেন, "কেন, জানলার বাইরের দিকে ২১ ও ২২ নম্বর সার্কিটের সাহায্যেই তো ধূসর এবং ফিকে নীল ব্যবহার করে আকাশের দৃশ্যপটটি অনায়াসে সুসজ্জিত করা সম্ভব। নীচের দিকে ধরা যাক ২৫ ও ২৬ নম্বর সার্কিট-এর সাহায্যে একটু ভিন্ন ধরনের নীলচে আভাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এবার তৃতীয় একটি গ্রাউণ্ড-ড্র সার্কিটকে আমি কাজে লাগাবো—যা দেবে উজ্জ্বল সূর্যাস্তের রঙ। মঞ্চের মধ্যবর্তী জায়গায় যে 'বার' লাগানো হয়েছে সেখানে একটি ২৩ নম্বর প্রোফাইল স্পট মারফৎ মন্দির, মসজিদ বা গীর্জার চূড়াকে স্পষ্ট করার কাজে লাগাতে দোষ কোথায়? হ্যাঁ, নীচের দিকে অবশ্যই থাকবে দুটি ফ্রেসনেল স্পট—যার একটি ২৭—উজ্জ্বল আলোর জন্য; অন্যটি ২৮ নরম আলোর জন্য। মঞ্চের দরজার বাইরে লাগাবো ১৯ ও ২০ নম্বর সার্কিট। অর্থাৎ এই দু'টি আলোর দ্বারা মঞ্চের পেছন দিকের দৃশ্যপট, প্রবেশ ও প্রস্থান-পথকে আলোকিত করা সোজা। তবে হ্যাঁ, স্পট-বার-এর ওপরে ১, ৩ ও ৫ নম্বর, মঞ্চের পেছনের বাঁ দিক থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে। এর সঙ্গে দক্ষিণ দিকে ৮ ও ১০ এবং ১২ নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যেতে হবে। ৪ ও ৯ নম্বর সার্কিট মঞ্চের সম্মুখভাগের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আলোকরশ্মি ফেলতে হবে। কেন বলতো? কারণ FOH আলোর সমতল-রশ্মির বিরুদ্ধে এটা কিন্তু জব্বর রকমের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। মঞ্চের পাশে ২ আর ১১ নম্বর সার্কিট থেকে নিয়ন্ত্রিত মৃদু ফ্লাড-লাইট ব্যবহার করলে ক্ষতি কী? আর ইঙ্গিতবহ প্রবেশ প্রস্থান বলছো? বেশ তো ৬ নম্বর সার্কিটকে কাজে লাগাও।"

আমি বললাম, জানলার সামনে এসে যখন কোনো অভিনয়শিল্পী দাঁড়ান তখন যদি তাঁকে ছায়ামূর্তি'র মতো দেখায়?

শুনে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। চিৎকার করে বললেন, "নম্বর সেভেন। নম্বর সেভেন ইজ দ্য ওয়ে অব সল্ভ। ৭ নম্বর সার্কিটের সাহায্যে ওখানে আলো ফেললেই ছায়ামূর্তি পালাবার জন্য ছুট মারবে।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, মঞ্চের মধ্যবর্তী এলাকা এবং পেছন দিকে আলো ফেলতে হলে তো ১৩ আর ১৪ নম্বর সার্কিটকে আড়াআড়িভাবে দাঁড়ের সাহায্যে বৈদ্যুতিক পাখার মতন ঝুলিয়ে রাখতে হবে। আর একই সঙ্গে ১৬ ও ১৭ নম্বর সার্কিটের সাহায্যে আলো ফেলতে হবে মঞ্চের অপর পার্শ্বে। এবার ১৫

আর ১৮ সার্কিট-এর মাধ্যমে নরম ধরনের আলো ফেলা যেতে পারে—যার দাঙ ব্যবহৃত হবে নীচের দিকে।

এবার রইলো, ধরো, মঞ্চের সম্মুখভাগের মধ্যবর্তী এলাকা তো? বেশ ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৭, ৩৮, ৩৯ নম্বর সার্কিটের সাহায্যে এই ঝুলন্ত আলোকে ব্যবহার করে ভাখো। চমৎকার রেজাল্ট পাবে। অবশ্য ৩৫ নম্বর সার্কিট থেকে একটা পরিপূরক আলোর প্রয়োজন হতে পারে এখানে। ৩৪, ৩৬ নং সার্কিট থেকেও নরম আলো ফেললে ব্যাপারটা একেবারে নতুন ডায়মেনশন আনবে। তবে হ্যাঁ, মনে রেখো মঞ্চগৃহের পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে ৩৯ এবং ৪১ নম্বর সার্কিটের মাধ্যমে মঞ্চের মধ্যবর্তী স্থানে আড়াআড়িভাবে আলো ফেলতে হবে। এবং অন্যান্য দূরবর্তী পার্শ্বে ৩০ আর ৪০ নম্বর সার্কিটের সাহায্যে ফেলা আলোও কিন্তু অনুরূপই হবে। তার মানে ব্যালান্স বলতে যা বোঝায় তা এভাবেই হতে পারে।"

বলতে দ্বিধা নেই, পরিকল্পনাটি বিজ্ঞানসম্মত, সাফল্যে পৌঁছবার বিশ্বস্ত যান সত্যিই। কিন্তু ব্যয়বহুল তো বটেই। কথাটা আমি বলেও ফেলেছিলাম। ভদ্রলোক জব্বর চটে উঠলেন। বললেন, "দর্শকরা কি ডায়াবেটিস-এর রোগী যে মিষ্টিতে ভয়? আরে ভাই যতো চিনি ততো মিষ্টি। তুমি যখন রসই পরিবেশন করছো তবে ভালো মিষ্টি তোমাকে দিতেই হবে। পিঁপড়ের পেছন টিপে আর্টের রস বার করা যায় না।"

ডিপ্রসেনিয়াম মঞ্চে আলোর কাজ

প্রসেনিয়াম-এর দেওয়াল ভাঙার প্রয়াস আজ কিছু নতুন নয়। এবং এই আন্দোলনও কিছু অভাবিত আবিষ্কার হতে পারে না। কারণ নাট্য তো একদিন কেবলই মানুষের মধ্যে ছিলো; মানুষের নাগালের মধ্যে—যেখানে হাত বাড়ালেই অভিনয়শিল্পীকে ছোঁয়া যায়। মাঝিখানে মঞ্চবেদী অথবা বেদীহীন আসরে অভিনয় পরিবেশনই ছিলো আদি নাট্যরীতি। কালক্রমে সেই মুক্তবিহঙ্গীকে তিন দেওয়ালের খাঁচায় বন্দী করা হয়। এবং তখন থেকেই প্রসেনিয়াম পদ্ধতির নাট্যচর্চা, অনুশীলন এবং পরিবেশনের শুরু।

শিল্প বস্তুত বহমান নদীর মতো। তার এ-পার ভাঙে ওপার গড়ে ওঠে। আবার ওপার ভাঙে এপার গড়ে ওঠে; শাখা প্রশাখায় সে ছড়িয়ে পড়ে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাকে পা মিলিয়ে চলতে হয়। না চললে সে পেছনে পড়ে থাকা ক্লান্ত কাহিল এবং মুমূর্ষু বলেও প্রতিপন্ন হয়। ভাঙাগড়ার এই নিয়ম-এর পথ ধরে চলার নাম পরীক্ষানিরীক্ষা, নতুন আবিষ্কার, নব্য আঙ্গিক দান। এ কারণে নাট্যের এই প্রসেনিয়ামে

কমীয় ব্যাপারটাকে দোষ দেওয়া যায় না। মানুষ তার জীবন-যাপনের সকল অঙ্গেই পরিবর্তন চায়। রুচি পরিবর্তনের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলই হলো পরিবেশ ও সমাজ পরিবর্তন, পোশাক-আশাক, খাদ্য, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি মিলে যে কৃষ্টির পরিবর্তন, তাই। এই অনিবার্য রুচির পরিবর্তন আবার প্রসেনিয়ামের তীর্থভূমিতে নিয়ে এলো নাট্যের সেই পুরনো আঙ্গিক ও পদ্ধতি—যাকে বলা হচ্ছে থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ড, ওপেনএয়ার থিয়েটার, এরিণ্য থিয়েটার প্রভৃতি। এরা আবার প্রসেনিয়ামের দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে এলো। এবং আমরা দেখছি, এখন প্রসেনিয়াম আর ডিপ্রসেনিয়াম দু'ধরনের অভিনয় পরিবেশন পদ্ধতিই সমানভাবে চলছে। কোথাও ডিপ্রসেনিয়ামের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, কোথাও বা প্রসেনিয়াম তার পৈতে ধরে কাঠ হয়ে বসে আছে।

মঞ্চালোকবিজ্ঞানী যদি প্রফেশনাল হয়, তা হ'লে তাকে মুক্ত-মঞ্চে আলোর কাজ সম্পর্কেও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আমি এখানে এ-প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে অগ্রসর হচ্ছি।

প্রসেনিয়াম-এর দেওয়ালগুলোকে সরিয়ে দিলে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর সামনে থাকে অবাধ স্বাধীনতা। এখানে দেওয়াল নেই, সিলিং-এর বালাই নেই। সুতরাং মনের মতো আলোক-সম্পাতের কাজ করতে কোনো নিষেধের দেওয়ালও থাকছে না। নিজের সৃজনশীল বুদ্ধি, ভাবাবেগ, রসবোধ অনুযায়ী এখানে আলোর আল্পনা আঁকার কাজটি সহজ হয়ে ওঠে।

ভারতে যখন সর্বত্র বিজলীবাতি বা বিদ্যুতের প্রচলন ছিলো না, তখন ঐতিহ্যময় মুক্তাঙ্গন অভিনয় আসরে গ্যাসবাতি, হ্যাজাক, ডে-লাইট ঝুলিয়ে অভিনয় হতো। বঙ্গদেশের যাত্রার অবস্থাও ছিলো একই। যাত্রা তখন গ্রামেগঞ্জেই ঘোরাঘুরি করতো। স্বাধীনতা লাভের পর যাত্রার বাজার পড়ে আসে। ফলে মুমূর্ষু যাত্রাদল-গুলি ধুঁকতে শুরু করে। কয়েকশত লোক—যাঁরা এই শিল্পের দানে খেয়েপরে বাঁচতো—তাঁদের সুখের ভাতের পরিমাণ কমে আসতে থাকে। ১৯৫৯ সালে যাত্রার এই দুরবস্থা আমি প্রত্যক্ষ করি। শিল্প হিসেবে শিক্ষিত মহলে তখনও যাত্রা ছিলো আসলে শূদ্র। ১৯৬১ সালে আমি স্থির করেছিলাম, যাত্রার পুনর্জাগরণ সম্ভব করতে হলে আগে কলকাতার দর্শকদের সমর্থন চাই। এরই ফল শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রা উৎসব (বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'চিৎপুর চরিত্র' গ্রন্থটি অবশ্য পঠিতব্য)। ওখানেই অনুষ্ঠিত পর পর কয়েকটি আলোচনা সভায় পালাভিনয়ের নবীকরণ পরিকল্পনা প্রচণ্ড বিতর্ক ও বিরোধিতার মধ্য দিয়ে গৃহীত হয়। গৃহীত হয় যাত্রাশিল্পের সজীবতা রক্ষা এবং ভবিষ্যতের দর্শকদের কথা ভেবে। ওখানেই আমার প্রস্তাবগুলো ব্যাখ্যা সহকারে বলি।

যাত্রাকে আধুনিক সাজে সজ্জিত করার ক্ষেত্রে আসরে আলোর ব্যবহার নিয়েও কথা ওঠে। এবং স্থিরীকৃত হয় যে টোটালিটি বজায় রাখার জন্য যাদের প্রয়োজন তাঁরা যাত্রা-পালায় আলোর ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু গ্রামগঞ্জের সকল আসরে আলোর কাজ, টেপ রেকর্ডার ব্যবহার, মাইক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জায়গা দরকার। অতএব আসরের একটি প্রবেশ পথকে দু'টি (প্রবেশ ও প্রস্থান) পথ করতে হবে। এবং ওই দুই প্রবেশ প্রস্থান পথের মাঝখানে আসরের পেছনদিক বসানো হবে নিয়ন্ত্রণের সব যন্ত্রপাতি।

আসরে আলোর কাজ করতে হলে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে নির্ভর করতে হবে পালার বিশেষ স্টাইলের ওপর। কিন্তু কথাটা বলতে যতো সোজা, কাজটা কিন্তু ততো সোজা বা সরল নয়। মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে জেনে রাখতে হবে পালা তথা নাট্যের সব স্টাইলের পেছনেই থাকে বাস্তবতা। সেটা প্রাগৈতিহাস যুগ, পুরাণের যুগ, ইতিহাসের যুগ অথবা বর্তমান কাল যাই হোক। এ-ছাড়া আছে কল্পিত কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদির পালাভিনয়। প্রত্যেকটি প্রযোজনারই একটা বাস্তব ভিত্তি থাকবেই থাকবে। আর থাকবে কাহিনী ও প্রযোজনাভিত্তিক স্টাইল। নাট্যে যা ঘটেছে, ঘটবে, এবং ঘটছে তার ভিত্তি বাস্তব—যেহেতু তা মানুষকে নিয়েই রচিত এবং দর্শকও মানুষ। দেবতাও মানুষ। তার পোশাকপত্র, অলঙ্কার, সাজসজ্জা, রূপরাগ যাই থাক; যে রকমই হোক। এবার কালানুযায়ী তাদের আচার আচরণ-এর মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু থাকতে পারে না। এই যে মুক্তমঞ্চ নাট্যাভিনয় পদ্ধতি অর্থাৎ ভিপ্রসেনিয়াম ফর্ম, এর মধ্যে যাত্রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নৃত্যগীতকে বাদ দিয়ে হতে দেখা যায় না। আবার অতি বাস্তব যাত্রাভিনয়ের অভাব যে রয়েছে তাও নয়। সুতরাং প্রযোজনার স্টাইল অনুযায়ী ওই অবধি স্বাধীনতা সত্ত্বেও পালার জন্য একটি লাইটিং লেআউট করে নিতে হবে আলোকবিজ্ঞানীকে। সে একটু অতিমাত্রিক অভিনয় হলেও। যাত্রায় আলোর অতিমাত্রিক ব্যবহারও যে দেখা না যায়, তা নয়। নানা রকমের কলাকৌশলযুক্ত আলোর জাদুও দর্শকরা গ্রহণ করেন, আবার প্রত্যাখ্যান করেছেন এমন যাত্রাপালা প্রযোজনার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

আগে যাঁরা যাত্রাভিনয়ে আলোর কাজ করতেন, তাঁদের প্রবণতা ছিলো রঙিন আলো ব্যবহারের দিকে। রঙিন আলোর প্রতি যাত্রামোদীদের একটা দুর্বলতা থাকেই। কিন্তু আলো ব্যবহারের বছর দুইয়ের মধ্যে দেখা গেলো, আলোকসম্পাতকারী একটি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন—সে বিষয়টি হলো: কোন রঙ কোন আলোকে খেয়ে নেয়। এই অসচেতনতার ফলে কস্টিউমড্ পালা—অর্থাৎ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক পালায় জাঁকজমক পোশাকগুলো তাদের নিজস্ব সৌন্দর্যকে বজায় রাখতে পারছে না।

এ-রকম একটি চূড়ান্ত মহলা প্রত্যক্ষ করার পর মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে বলতেই হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাদা আলোর ব্যবহার করলে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এবং তা কেবল জাঁকজমক কস্টিউমড্ পালার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরীক্ষা করে দেখা গেলো সত্যিই আশ্চর্য ফল পাওয়া যাচ্ছে।

এ-ধরনের অভিনয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের ওপর গুরুত্ব থাকে অনেক বেশি। যাত্রার দর্শকরা 'গেট' ভালোবাসেন। 'গেট' মানে প্রস্থানকালকে হাইলাইট করা। এখানে একই সংলাপাংশ বহুবার ব্যবহৃত হতে পারে, আঙ্গিক অভিব্যক্তি প্রাধান্য পেতে পারে অথবা প্রস্থান পথের খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে আবার একখণ্ড অভিনয়ও হতে পারে। যাত্রার কোনো চরিত্রই বিনা সংলাপে আসরে প্রবেশ করতে পারতো না, প্রস্থানও নয়। এখনও তারই প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু কেটে কেটে দৃশ্যান্তর করার পদ্ধতিও চালু রয়েছে। কাজেই প্রযোজনার সিনপ্রটিং এবং মুহূর্ত বুঝে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে কাজ করে যেতে হবে। এখানে বলে রাখা ভালো, হালের যাত্রায় এমন সব আধুনিক আলোক-যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে যা প্রসেনিয়াম মঞ্চ ভাবতে পর্যন্ত পারে না। ডিপ্রসেনিয়াম পদ্ধতির অভিনয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডায়মেনশন্যাল আলোর ব্যবহার করা দরকার। কারণ এখানে দৃশ্যসজ্জা বলতে কিছু নেই। এখানে ব্যাটেন, ঝুলন্ত স্পট, ফ্লাড সবই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে। এ-ধরনের অভিনয়ে আলোক যন্ত্রগুলি দর্শকরা দেখতে পায়—কিন্তু দর্শকরা তা গ্রহণ করতেও রাজি। কেন? কারণ ওঁরা বুঝে নিয়েছেন অভিনয়শিল্পীর মতন এও প্রয়োজনীয়। সুতরাং এ-রকম ক্ষেত্রে নাট্যরসাস্বাদনে দর্শকদের কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। তার মানেটা কী? আলোকবিজ্ঞানীর আরও স্বাধীনতা। তবে দেখতে হবে, মাত্রাতিরিক্ত আলোকসম্পাত যেন অভিনয়ের স্বাভাবিক গতিকে ক্ষণিকের জন্যও স্তব্ধ করে না দেয়।

মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে ডিপ্রসেনিয়াম পদ্ধতির আলোক-সম্পাতেরও নকশা করে নিতে হবে—যেমন করে সকলের সঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে প্রসেনিয়াম পদ্ধতির লাইটিং লে-আউট বা স্কীম তৈরি করতে হয়। নির্দেশকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনাই এর মূল সূত্র।

১২

নাট্যে বৈচিত্র্যময় আলোর আরোপিত প্রভাব : চলমান দৃশ্যে তাৎপর্যময় আলোর প্রতিক্রিয়া, প্রজেক্টারের ব্যবহার, ছায়া রচনায় কাজ, স্ট্রোব্‌স্‌, শব্দের ছন্দ ও আলোর ছন্দ, কালো আলোর কাজ, বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাত রচনা, ধোঁয়া ও কুয়াশা রচনা, শব্দ ও আলোর সৃষ্টি, ছবি-আঁকা স্বচ্ছ পর্দার ব্যবহার ··

এতদূর আসার পর নিশ্চয় মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর বুঝতে অসুবিধে থাকছে না যে, আলোক-সম্পাতের ক্রিয়া উপস্থাপনারই একটি অখণ্ড অঙ্গ। এ-দুইয়ের সম্পর্ক নিবিড়, অঙ্গাঙ্গী, ঘনিষ্ট পরন্তু নিরবচ্ছিন্ন। এটা বেশি করে বোঝা যায় যখন নাট্যে আলোর তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। দৃশ্যে মেঘ ভেসে যাওয়া, অবিরাম ধারাপাত, ঝড়সহ বিদ্যুতের চমক, নদীর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, জলস্রোত দেখানো, আগুনের দাউদাউ লেলিহান শিখা সৃষ্টি করা—এ-সবকে বলা হয় 'এফেকটস্‌'—যার বাংলা পরিভাষা হতেপারে বৈচিত্র্যময় আলোর আরোপিত প্রভাব। এগুলি কাজে লাগবে যদি নির্দেশক প্রয়োজন মনে করেন। এবং প্রযোজনার ক্ষেত্রে এসব এফেকটস্‌-এর প্রয়োজন হয়। আসলে আগেই বলা কঠিন, কোন্‌ নাট্যে সঠিক কী কী প্রয়োজন। তবে সব রকম কাজের জন্যই মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে তৈরি থাকতে হবে।

চলমান দৃশ্যে তাৎপর্যময় আলোর প্রতিক্রিয়া

একে বলা হয়ে থাকে মুভিং এফেকটস্‌। মোটর-চালিত একটি চাকতির সাহায্যে মঞ্চে চলমান দৃশ্য ব্যবহার করা হয়। মোটর চালিত এই চাকতিটি দৃশ্যে তুলি ধরার জন্য যে প্রজেকটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা সম্মুখভাগে আটকে নেওয়া যেতে পারে এর সাহায্যে নানা ধরনের মেঘের ছবি, আগুনের শিখা, বৃষ্টি, বরফ পড়া, জলপ্রপাত, নদী বা সাগরের ঢেউ পর্দায় প্রতিফলিত করা সম্ভব। এই সব কারুকর্ম যাই দেখানো হোক, তখন কিন্তু মঞ্চের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের আলোর দ্যুতি কমিয়ে আনতে হবে। একটি ঝাপসা অস্পষ্ট দৃশ্য প্রয়োজনে যুক্ত হতে পারে নাট্যে কিন্তু নিখুঁত ছবি রচনার ক্ষেত্রে তা থাকতে পারবে না। নিরীক্ষার মাধ্যমে আরও অনেক রকম পন্থা আবিষ্কৃত হতে পারে অবশ্যই, তবে চলমান কোনো দৃশ্যের গভীরতা মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে আরও কিছু যন্ত্রপাতি এবং আলোর বিচ্ছুরণকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

আলোকবিজ্ঞানীকে তখনই দক্ষ মনে করা হবে, যদি সে প্রজেকটর ছাড়াই এ-সব প্রতিক্রিয়া রচনা করতে পারে উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা। অগ্নিশিখা রচনার ক্ষেত্রে প্রজেকটার বা স্লাইড ব্যবহার না করেও এমন লেলিহান শিখা রচনা করা সম্ভব যা অধিকতর বাস্তব মায়া রচনা করতে পারে। অগ্নিশিখা যদি যথেষ্ট লেলিহান না হয় তবে কাঁপাকাঁপা আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণকে কৌশলে কাজে লাগালে প্রজ্বলিত অগ্নিকাণ্ডের ইমেজ কিন্তু রচিত হতে পারে। আর যদি দাউদাউ লেলিহান শিখা দেখাতে হয় তবে ছেঁড়া কাপড়ের ফালিকে কাজে লাগানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ কৌশলে এই ছেঁড়া কাপড়টিকে নাড়ানোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ওই ধরনের অগ্নিশিখার প্রতিফলন। চিক্‌চিকে ঝিকঝিকে আলোকে কাজে লাগিয়ে সত্যিকারের জলের এমন দৃশ্য রচনা করা সম্ভব যা প্রজেকটারের চাইতে বেশি আকর্ষক হয়ে উঠবে। তার মানে আলোকবিজ্ঞানীকে রীতিমতো অনুশীলন এবং পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে প্রথম দিকে ডুবে থাকতে হবে। আমি দেখেছি, এক ট্রে জলে আলো ফেলার পর ট্রেটি নাড়িয়ে সুন্দর ঢেউ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এর চাইতেও সহজ উপায় কি নেই? আছে। মোটর-চালিত আলোক শিখা কাঁপানো যন্ত্র ফ্রেসনেল্-এর সম্মুখে লাগিয়ে এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় রঙের ফিল্টার ব্যবহার করে বাঞ্ছিত অগ্নিশিখাও রচনা করা যেতে পারে, আবার জলোচ্ছ্বাসও রচিত হতে পারে।

প্রজেকটারের ব্যবহার

মঞ্চে প্রজেকটারের সাহায্যে দৃশ্যসজ্জা কি কোনো ছবি (ফেটোগ্রাফ) ফুটিয়ে তোলার কাজটির জন্য বেশ আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন। এখন এমন নাট্য অবশ্যই হতে পারে যেখানে প্রজেকটারটি অবশ্য প্রয়োজনীয়—না হ'লে নাট্যনির্দেশকের লক্ষ্যে পৌঁছনো কঠিন। এ-ক্ষেত্রে প্রজেকটার ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকতে পারে না। কাজেকাজেই মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে প্রজেকটার ব্যবহার করতেই হবে। এখানেও প্রযোজনার নিজস্ব স্টাইল বুঝে প্রজেকটারের কাজ যুক্ত করতে হবে। ধরা যাক এমন একটি নাট্যে আলোকবিজ্ঞানীকে কাজ করতে হচ্ছে, যেখানে, পলকে পলকে রয়েছে নাট্যদৃশ্যের পরিবর্তন বা অভিনয় এলাকার পরিবর্তন—যেটা সাধারণ আলো দ্বারা করা সম্ভব নয়; তখন প্রজেকটার আবশ্যিক বলে গণ্য হতে বাধ্য। মঞ্চে সাধারণত পেছন দিকেই প্রজেকটার স্থাপন করা হয়। কিন্তু সব মঞ্চেই এ-রকম ডেপথ পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। মঞ্চের পেছন দিকে সিনিক প্রজেকশনের কাজ করার জন্য একটা আলাদা পর্দা টাঙাবার প্রয়োজন হয়। তারও পেছনে প্রজেকটার

এবং এ-সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য বেশ কিছুটা জায়গার অবশ্যই প্রয়োজন। সাধারণত প্রজেক্টার এবং তার যন্ত্রপাতিকে সরাসরি বসালে বাঞ্ছিত ক্রিয়া পাওয়া যায় না বলে একটু কোণাকুনিভাবে এগুলো স্থাপন করা বিধেয়। পর্দাটিকেও কৌণিক দূরত্ব বুঝে একটু কোণাকুনি স্থাপন করলে পর্দায় চিত্র- সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে থাকে না। আলো ফেলার প্রয়োজনীয় ল্যানটার্নগুলোতে থাকে বিশেষ ধরনের লেন্স। এগুলির সাহায্যেই পর্দার ওপর যথাযথ আলোর ব্যবহার একই সঙ্গে করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে লেন্সগুলো যাতে ঠাণ্ডা থাকে তার ব্যবস্থাও রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। না হ'লে লেন্স-এর ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এ-কাজ করতে হ'লে তাপ নিরোধক এক ধরনের যান্ত্রিক পাখা—যা পাওয়া যায়, তার ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। এর জন্যে তাপ নিরোধক কাচও কিন্তু পাওয়া যায়। এখানে অবশ্যই রাখতে হবে ডিসচার্জ ল্যাম্প। ৩৫ মিলিমিটারের কোডাক ক্যারৌজেল প্রজেক্টর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে অভিজ্ঞ মঞ্চালোকবিজ্ঞানীরা বিবেচনা করেছেন। এর অসুবিধের দিকটি হচ্ছে, মঞ্চের পেছনে সমগ্র দৃশ্যপটকেই কাজে লাগানো যায় না। সুবিধের দিক, একাধিক পর্দার সাহায্যে এর দ্বারা অনেক চমকপ্রদ দৃশ্য উপস্থাপনা করা সম্ভব।

ছায়া রচনার কাজ

সিনেবাক প্রজেক্টার ছায়া রচনার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে অনেকদিন ধরে। এক ধরনের বস্তুর ওপর ছবি এঁকে, তার ওপর যে আলোকরশ্মি ফেলা হয় তা একটি কালো বাক্সের মধ্য থেকে আসে। লেন্স বা প্রতিফলক কাচ-এর কোনো প্রয়োজন এখানে থাকে না। কিছু দূর থেকে স্ট্যাণ্ডের ওপর বসানো ল্যানটার্ন কাজ করতে থাকে। তবে দূরত্ব অনুযায়ী পর্দার মাপের হেরফের করতেই হয়। ব্যবহার করার আগে এই প্রজেক্টার নিয়ে মঞ্চালোকবিজ্ঞানী নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই করতে পারে। সেটা জরুরী প্রয়োজনের পর্যায়েও ফেলা যেতে পারে। এখানের পদ্ধতিগত কিছু নিয়ম-কানুনকে মেনে চলতে হয়।

স্টেবিস্

স্ট্রোবোস্কোপ যন্ত্র একসঙ্গে অনেক আলোর ঝলকানি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তৈরি করে যেতে পারে। এই আলোকযন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন নাট্যক্রিয়া বা ঘটমান দৃশ্যকে বেশ কয়েকটি ঝাঁকুনির দ্বারা নিশ্চল করে দেওয়ার কাজটিও কিছু কঠিন নয়। এ-যন্ত্রটিকে

অত্যন্ত যত্ন সহকারে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। মনে রেখো এর অপব্যবহার নাট্যকে ধরাশায়ীও করে দিতে পারে। বিখ্যাত আলোকবিজ্ঞানীরা বলেছেন, সেকেণ্ড প্রতি আটটির বেশি আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করা উচিত নয়।

শব্দের ছন্দের সঙ্গে আলোর ছন্দের যোগাযোগ

প্রিজ্‌ম্‌-এর মারফৎ, যে প্রিজম ঘূর্ণায়মান, তারই সাহায্যে মঞ্চে বিভিন্ন রঙ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমরা জানি এই বিশ্বের সব কিছুই ছন্দ-নির্ভর। ছন্দের মূল কথা তাল, লয়। ছন্দের অভাব হলেই তা বেতাল। বেতাল মানেই গোলমেলে। আর্টের ক্ষেত্রে প্রধান কথাও কিন্তু ছন্দ। বাস্তব জীবনে মানুষের চলা, কথা বলা, ক্রিয়াকর্ম; পাখির ওড়া, বৃষ্টিপাতের ধারা, ঝড়ের গতি এমনকি সমুদ্রের ঢেউ পর্যন্ত ছন্দোবদ্ধ। ছন্দের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে নাট্যবিজ্ঞান / ২ গ্রন্থে। নাট্য ছন্দপ্রধান। সুতরাং তার সমস্ত অঙ্গগুলোকেই মূল ছন্দের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করে যেতে হয়। মঞ্চালোকবিজ্ঞান তো এর বাইরের নয় সুতরাং তাকেও ছন্দ মাফিকই কাজ করে যেতে হবে। তা না করলে গোটা প্রযোজনাকেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে হায় হায় করতে হয়। নাট্যের সংগীত, অভিনয়শিল্পীর চলাবলা, এফেক্ট মিউজিক, ধ্বনির ব্যবহার—এ-সবই কিন্তু নাট্যের মূল ছন্দ ধরে এগোবে। জল ও তেল রঙের মিশ্রণে বিচিত্র বর্ণ উৎপাদন করা যায়। তোমরা জানো কি, সংগীতকে অনুসরণ করে যাতে আপনাআপনি আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করা যেতে পারে তার জন্য শব্দকে আলোয় রূপান্তরিত করার যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। তা কাজেও লাগানো হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে তাকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এককেন্দ্র-মুখী একটি যন্ত্রচালিত চাকতি ব্যবহার করে নিশ্চল স্লাইডের মধ্যে ও গতি আনা সম্ভব।

কালো আলোর কাজ

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে মঞ্চে অতি-বেগ্‌নী আলোকসৃষ্টি করা কিছু অসম্ভব কাজ নয়। এই আলোর নামকরণ করা হয়েছে 'আলট্রা-ভায়োলেট'। নির্ভেজাল অতি বেগনী আলোর বিকিরণ অবশ্যই ক্ষতিকারক। সুতরাং এই আলো ব্যবহার করতে গেলে মঞ্চে বিশেষ ধরনের ল্যাম্প-এর প্রয়োজন। এর সঙ্গে এক ধরনের কাচ ব্যবহৃত হয় এবং সেই কাচের সঙ্গে লাগানো থাকে ফিল্টার। চারফুট মাপের আলট্রা-ভায়োলেট ফ্লুরোসেন্ট টিউব ব্যবহার করলে কাজটা আরও সহজ হয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজনীয় আভা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটুকু বাদে বাকি সব অংশকেই কালো রঙে রঙ্ করতে হবে।

যে সব কাপড়ে এই আলো যথাযথভাবে কাজ করে বাজারে তারও অভাব নেই। সেগুলো ছাপানোও হতে পারে, হতে পারে রঙ করাও। যে-সব কাপড় কোনো রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা পরিষ্কার করা হয় তাতেও ফ্লুরোসেন্ট আলো ভালোভাবে ফুটে ওঠে।

বিদেশের বিখ্যাত কয়েকটি মঞ্চে এই কালো আলোর ব্যবহার দেখা গেছে। আলট্রা ভায়োলেট আলোর সঙ্গে অন্যান্য আলোর সীমিত ব্যবহার মঞ্চের ওপর জাদুকরী মায়া রচনা করতে পারে।

মঞ্চে বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাত রচনা

ইংরেজিতে এ-রকম দৃশ্য ব্যবহারের রীতিপদ্ধতিকে যথাক্রমে বলা হয় ফর্ক (Fork) এবং শীট (Sheet)। প্রজেক্টারের সাহায্যে বজ্রপাত, বিদ্যুৎ-চমক রচিত হলে তাকেই বলা হয়ে থাকে ফর্ক পদ্ধতি। আবার একটি প্রোফাইল স্পটে এক ধরনের ধাতব পদার্থ ব্যবহার করেও অনুরূপ পরিবেশ রচনা করা সম্ভব। যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক, একখণ্ড কার্ড বা একটি শাটার হাতে নিয়ে এই আলোর ঝলকানি রচনা করাই সুবিধেজনক। যদি প্রজেক্টার ব্যবহারের সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় তা হ'লে আলাদা একজন অপারেটরের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। কেন? কারণ আকাশের বিভিন্ন দিকে এর ক্রিয়া দেখাতে হ'লে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ফর্ক বা প্রজেক্টারটিকে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘোরাতে ফেরাতে হয়। কিন্তু শীট-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করলে ক্যামেরায় যে ধরনের ফ্লাশ-ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়ে থাকে অনুরূপ ল্যাম্প মঞ্চে ব্যবহার করতে হবে। পর পর কয়েকটি ফ্লাশ-এর সাহায্যে এমন ক্ষণ রচনা সম্ভব। এ-ধরনের ফ্লাশ-এর গভীরতার রঙ হয় শাদা। একে বলা হয় **ফোটোফ্লাড**। মনে রাখতে হবে ফোটোফ্লাডের সাহায্যে যখন মঞ্চে বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ ঝিলিকের সৃষ্টি করা হয়, তখন মঞ্চটি যেন থাকে প্রায়ান্ধকার। গ্রাউণ্ড-ড্র-এর ঠিক পেছনে এবং আকাশের দৃশ্যপটের ঠিক নীচ থেকে এই শীট-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে। ইলেকট্রনিক-এর সাহায্যেও মঞ্চে এ-ধরনের কাজ করা যায়। এবং সে-ধরনের যন্ত্র বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়।

ধোঁয়া ও কুয়াশা রচনার কাজ

মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে-পদার্থ দ্বারাই ধোঁয়া এবং কুয়াশার সৃষ্টি করা হোক তা যেন দৃষ্টিকে কোনোরূপ আঘাত না করে। খুব সোজা পদ্ধতি হলো বন্দুকের নলে গ্লিসারিণ ব্যবহার করে ধোঁয়ার সৃষ্টি করা। এ-ধরনের বন্দুক জোগাড় করা কঠিন নয়। বাজারেই বিক্রি হয়ে থাকে। চাপ সৃষ্টি এবং পরিমাণ মতো তাপকে কাজে লাগিয়ে গ্লিসারিণকে রূপান্তরিত করা যায় ধোঁয়ায়। কুয়াশা?

ফুটন্ত গরম জলে বরফের টুকরো ফেলে কুণ্ডলী পাকানো কুয়াশার সৃষ্টি করা যায়। এই পদ্ধতিটি ধোঁয়া রচনার ক্ষেত্রেও কার্যকর। এ থেকে সৃষ্ট কুয়াশা বা ধোঁয়াশা বাতাসের চাইতে ভারী বলে মঞ্চে তা কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে চলতে পারে। আসলে কী ধরনের ধোঁয়া কোন নাট্যে প্রয়োজন তা এখানে বলা সম্ভব নয়। সেটা নির্ভর করবে নাট্যের প্রয়োজনের ওপর। কিন্তু মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনো ধোঁয়া বা কুয়াশাই যেন দর্শকদের কাছে গিয়ে হাজির না হয়।

শব্দ সৃষ্টি ও আলোর ঝলকানি

মঞ্চে শব্দ সৃষ্টির জন্য কোনো বোমা ফাটানোর যখন প্রয়োজন হবে, তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

অগ্নিনিরোধক বস্তু দিয়ে ফ্লাশ-বক্সটি তৈরি করা হয়। এই বক্সের শেষ প্রান্তে থাকে একটি সলতে। এক রকমের দাহ্য পদার্থ, যা উজ্জ্বল, তা এই সলতেয় মাখানো থাকবে। বিদ্যুতের সাহায্যেও এতে আগুন ধরিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। এ ভাবেই শব্দ এবং ফ্লাশ-এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার একটি তারের জালের মধ্যে ফ্লাস-বক্সটি রেখে বৈদ্যুতিক চার্জ দিয়ে বোমা ফাটানো যায়। এই বোমাকে বলা হয় 'মেরুন'।

মঞ্চে ছবি আঁকা স্বচ্ছ পর্দার ব্যবহার

এই ধরনের পর্দা দু'রকমের হয়: (১) জালির মতো যার ফুটোর সংখ্যা বেশি; (২) অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রের ঘন বুনুনী। এতে ফুটোর অস্তিত্ব থাকে না বললেই চলে। এই দুরকমের পর্দা দিয়ে মঞ্চে অলৌকিক, অবিশ্বাস্য আবার বাস্তব সৌন্দর্যও সৃষ্টি করা যায়। যদি এই পর্দার ওপর সামনের দিক থেকে আলোকরশ্মি ফেলা হয়, তা হলে পর্দার ওপর যে-ছবি আঁকা থাকে সেগুলো দর্শকরা স্পষ্ট দেখতে পাবে। আর যদি কেবল পেছনের দৃশ্যাবলীর ওপর আলোকরশ্মির আপতন ঘটে তবে পর্দাটি আরও স্বচ্ছ দেখাবে এবং এর ওপর আঁকা দৃশ্যটি সম্পূর্ণ আলাদা একটি মাত্রা পাবে। মঞ্চের পার্শ্ববর্তী এলাকা বা ওপর থেকে আলো ফেলেও পর্দার পেছনের দিকের দৃশ্যটিকে স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব। অনেক সময় পেছনে একটি কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে মঞ্চের আলোতে মঞ্চাবস্থিত চরিত্রদের যথাস্থানে অবস্থিতির চিত্র তুলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য যে কাজগুলি করণীয় তা হলো:

(ক) মঞ্চে যে আলোগুলি রয়েছে তা নিভিয়ে দিতে হবে;

(খ) কালো পর্দাটি দেখা যাবে না ;

(গ) পেছনের আলো জ্বলে উঠবে ;

(ঘ) পর্দার আলো মুছে যাবে ;

(ঙ) সম্মুখভাগে আরও আলো যুক্ত করতে হবে

অবশ্য এগুলি করতে হবে প্রয়োজন অনুপাতে ।

১৩.

মঞ্চালোক পরিকল্পনার সাংগঠনিক কাজ : মঞ্চালোক পরিকল্পনা, মহলা পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনার নকশা, দৃশ্য বিশেষের মডেল রচনা, আলোকসজ্জা রচনার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম-এর বিন্যাস এবং তালিকা, কিউ সিনোপসিস, ফোকাসের-এর বিশদ; সুইচবোর্ড ব্যবহারের পদ্ধতি ও পরিকল্পনা, সুইচ, কন্ট্রোলবোর্ডের নতুন যন্ত্রের তালিকা…

মঞ্চালোক-পরিকল্পনার সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কে একটা প্রচলিত সমীকরণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেটি হলো: উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা+উপকরণ+মঞ্চসজ্জা+সাংগঠনিক কর্মধারা—মঞ্চালোকবিজ্ঞানের কাজ। মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে মনে রাখতে হবে, অভিনয়-চলাকালীন মঞ্চের সঙ্গে দর্শকদের যোগসূত্র রচনার দায়িত্ব মূলত তারই। এই যোগসূত্রটি আসলে মঞ্চে কী ঘটছে কেবলমাত্র তাই নিয়ে। মনে রাখতে হবে তার কাছে অর্থাৎ মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর কাছে সময় হবে শত্রুর মতন। অন্তত তাই ধরে নিতে হবে। কারণ সময় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ধেয়ে আসে—যা খুবই ভয়ঙ্কর। আসলে প্রয়োজনীয় আলোক-যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম যথাযথ স্থানে স্থাপন না-করা পর্যন্ত তো আলোর প্রয়োগ কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠতে পারছে না। আবার দেখো, বিদ্যুৎ সরবরাহ না হ'লে আলোগুলো থাকবে একেবারে কানা হয়ে। মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর এখানে করবার মতো কিছুই নেই। যদি মঞ্চের পাত্রপাত্রীরা যথাযথস্থানে অবস্থান না করে তা হ'লে কিসের ওপর আলো ফেলা হবে? এবং কোন কৌণিক বিন্দু থেকেই বা কোন আলোর রশ্মিকে মঞ্চ পাঠানো হবে? অতএব এমত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতেই হয় যে, মঞ্চ সম্পর্কিত সমস্ত কাজ শেষ হবার পরই মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে কোমর বেঁধে কাজে নামতে হবে। তার আগে কিছুতেই নয়।

মঞ্চালোক-পরিকল্পনা :

শিক্ষার্থী এবং অদক্ষ মঞ্চালোকবিজ্ঞানী মহলায় উপস্থিত থেকে একজন দক্ষ আলোকবিজ্ঞানীর মতন নাট্যনির্দেশককে কিছুতেই বলতে পারে না, 'এখানটা কেমন যেন অস্পষ্ট থাকছে। যদি এই অংশটা এমনভাবে হয় তবে আমার পক্ষে এই ক্ষণটিকে হাইলাইট করতে সুবিধে হয়।' মনে রাখতে হবে, মঞ্চালোকবিজ্ঞানী নাট্যের অন্যান্য বিভাগীয় পরিচালকদের মধ্যেই একজন। এবং কেবলই আলো নিয়ে একটা নাট্য কিছুতেই হতে পারে না। তার মানে নাট্যনির্দেশক কী চাইছেন তার ওপর নির্ভর

করতে হয় মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে—যেমন করে নির্ভর করেন অন্যান্য বিভাগীয় অধিকর্তা। এখানে বরং নির্দেশককে বলা যেতে পারে, 'আপনি যেমনটি বলছেন আমি করে দেখাচ্ছি। তবে এর বিকল্প কোনো দিকের সম্ভাবনা থাকতে পারে। প্রয়োজন হ'লে ভেবে দেখতে পারেন।'

মঞ্চালোকবিজ্ঞানী নিজেই যদি প্রধান ইলেকট্রিসিয়ানের কাজ করেন তা হ'লে ব্যাপারটি হয় সোনায় সোহাগার মতন। না হ'লে একজন দক্ষ ইলেকট্রিসিয়ানকে ওই কাজে নিয়োগ করতে হয়। ওই দক্ষ পরিচালক যদি মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর সঠিক নির্দেশগুলি প্রত্যেকটি পর্যায়ে মেনে চলে, তা হলেও নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

আগেই বলা হয়েছে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে নাট্যের সকল বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে পরিকল্পনা রচনার আগে। নাটক পাঠ হবার পর থেকে বিশেষ কয়েকটি মহলা পর্যন্ত মঞ্চালোকবিজ্ঞানী নানাবিধ সৃজনশীল প্রক্রিয়া প্রয়োগের কথা ভাবতে পারে এবং মঞ্চালোক-পরিকল্পনার একটি ছকের সম্ভাবনাও তার মনে উঁকি দিতে পারে। কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত আলোচনায় বসা না হচ্ছে পরন্তু নির্দেশক কী চাইছেন জানা যাচ্ছে—ততোক্ষণ কোনো সিদ্ধান্তেই পৌছনো ঠিক হবে না। সরাসরি একটি পারিবারিক কাহিনী-ভিত্তিক নাট্য হ'লে জানতে হবে, দেওয়ালের রঙ, মঞ্চ দৃশ্যের অবস্থিতি ও চরিত্র, মঞ্চভূমির কোন এলাকা পর্যন্ত দৃশ্যটির বিস্তার এবং কোথায় শুরু; সেটে সিলিং-এর আভাষ থাকছে কিনা। যদি সোফা সেট থাকে তবে মঞ্চভূমির কোন এলাকায় কীভাবে তা বসানো হচ্ছে এবং তার পর্দার রঙ, দরজা বা জানলা থেকে তার দূরত্ব কতোটা ইত্যাদি।

মহলা পর্যবেক্ষণ :

মহলায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার প্রধান অর্থ হলো নাট্যের কাহিনী কী ভাবে বর্ণিত হচ্ছে, কোন খাতে বইছে, তার গতিবেগ কেমন—এ-সব তো রয়েছেই পরন্তু রয়েছে কম্পোজিশন, পিকচারাইজেশন, চরিত্রদের মুভমেণ্ট, অবস্থান, বাচন-প্রতীক অভিব্যক্তি, ক্রিয়া, স্টেজ-বিজনেস, খণ্ড খণ্ড সঠিক নাট্যমুহূর্তের অবস্থান, বিকাশ, সংলাপ-এর কোন অংশ গুরুত্বপূর্ণ, কোন অংশ নয়; কোথায় একটি প্রেমের মুহূর্ত রয়েছে, কোথায় রয়েছে সংযত অথবা কথা কাটাকাটি লড়াই। তার মানে নাট্যের আনুপূর্বিক বিশদ জানা না থাকলে মঞ্চালোক-পরিকল্পনায় খুঁত থেকে যাওয়া সম্ভব। মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীকে মনে রাখতে হবে, কেবল বিশেষ কোনো চরিত্র বা কম্পোজিশনকে আলোক-সমৃদ্ধ করাই তার কাজ নয়—চরিত্রের ব্যক্তিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নাট্যের মূল ও শাখা দ্বন্দ্বের

খুঁটিনাটি সবিস্তারে তার জ্ঞানের সীমার মধ্যে থাকা চাই। মুহূর্তগুলোর কোথায় আবেগ কাজ করবে, কোথায় করবে না এবং এই সব মুহূর্তগুলোর সময়-সারণি কেমন সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীর পক্ষে কাজে হাত দেওয়াই বৃথা হয়ে যাবে।

অতঃপর পরিবেশ। নাট্যের চরিত্ররা কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি; তাদের আর্থনীতিক সঙ্গতি, সামাজিক বিধি ও স্তর; যোগ্যতা এবং এরই ভিত্তিতে পোশাক-পরিকল্পনা। যতোক্ষণ না চূড়ান্ত মহড়া আসছে ততোক্ষণ পোশাক আশাক বা রূপরাগের বাস্তব চেহারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কিছু মহড়ার পর্যবেক্ষণ মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে এ-বিষয়ক একটি ধারণাতে পৌঁছে দিতে পারে। এই ধারণা তার মনে থাকবে। অবশেষে পরিকল্পনার নকশাটি যখন পাকা করা হবে তখনই তা থেকে বেরিয়ে পড়বে বাধ।

মঞ্চালোকবিজ্ঞানী মহড়া পর্যবেক্ষণের সময় কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে বসলে ভালো হয়। নোটসগুলো নিতে পারে, এবং কিউ চার্ট বা কিউ সিনোপসিস রচনার ক্ষেত্রেও এতে সুবিধে হয়।

মঞ্চালোক পরিকল্পনার নকশা রচনা

১ ফুটের একটি স্কেল নাও। এবার মঞ্চালোক-পরিকল্পনার নকশাগুলি আঁকতে আরম্ভ করো। নকশা আঁকার কাগজটির বাঁ-দিকে বেশ একটু জায়গা ছেড়ে দাও। কারণ এই ফাঁকা জায়গাটি পরে তোমার নির্দেশনাজনিত ইঙ্গিত চিহ্ন দেবার কাজে লাগবে। অথবা মঞ্চসজ্জার নকশাটির ওপর ট্রেসিং-পেপার পিন দিয়ে এঁটে নাও। এবার এর ওপর চিহ্নিত করো দৃশ্যসজ্জার কোথায় কী ধরনের আলো ব্যবহৃত হবে। এর মধ্যে পড়বে কোন এলাকায় কী ধরনের ল্যানটার্ন ব্যবহার করা বিধেয়, মঞ্চের কোন কোন এলাকায় সেগুলি স্থাপিত হবে, ল্যানটার্নের সঙ্গে কী কী রঙ ব্যবহার করা দরকার, কী ধরনের ডিমার ল্যানটার্নের পক্ষে উপযুক্ত। প্রাথমিক ছকটা বারবার করতে হতেও পারে। এবার চূড়ান্ত নকশা রচনার কাজ। প্রত্যেকটি নকশার কয়েকটি কপি করাও প্রয়োজন। এবং সেগুলো সকল বিভাগীয় প্রধানদের দিলে সহজভাবে কাজ করার সুবিধে হবে।

মঞ্চে যদি প্রতীকী আলো ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তবে যে-সব ল্যানটার্নের সাহায্যে এই প্রতীকী আলো মঞ্চে ব্যবহার করা হবে, নকশায় সেই ল্যানটার্নগুলোর পাশে একটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। তা ছাড়াও প্রোফাইল,

ফ্লাড, ফ্রেসনেল, বাইফোকাল, লেন্স স্পট ব্যবহারের প্রতীকী চিহ্নও থাকবে। নকশার পাশের জায়গায় রুল টেনে এ-সব প্রতীকী চিহ্ন ব্যবহার করার পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রতীক চিহ্নের পাশেই রঙের সংখ্যাগুলো লিখতে হবে এবং ডিমার ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া থাকবে। অর্থাৎ কোন কোন ল্যানটার্নের ক্ষেত্রে কী কী ডিমার প্রয়োজন। হরাইজেনটাল বার-এর প্রতীক চিহ্নও দিতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু 'বুম'-এর প্রতীকী চিহ্ন ব্যবহারে কিছু অসুবিধে দেখা দিতে পারে।

এখানে বলে রাখা ভালো, মঞ্চালোকবিজ্ঞানের চূড়ান্ত নকশা ড্রেস-রিহার্সাল-এর আগে কিছুতেই রচিত হতে পারে না। চূড়ান্ত মহলার নিবিড় পর্যবেক্ষণের পরই এটি রচনা করা সম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও হতে পারে ড্রেস-রিহার্সালের পরেও প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তনজনিত ভাবনা আসতে পারে বা নাট্যনির্দেশক সেরকম পরিবর্তন চাইতেও পারেন। এ-ক্ষেত্রে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে তার রচিত নকশার কিছু রদবদল করতেই হয়।

মঞ্চালোকসজ্জা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

মঞ্চালোকবিজ্ঞানীকে জানতে হবে, মঞ্চে আলোর কাজ করার ক্ষেত্রে কোন কোন ল্যাম্প বা স্পট দরকার। যদি জানা না থাকে কতো রকমের ল্যাম্প এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কতগুলো স্পট—তা হলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা দিতে পারে। এখানে আমি বিশদ তালিকা যুক্ত করছি :

ল্যাম্প : (ক) জি এল এস অর্থাৎ জেনারেল লাইটিং সার্ভিস ল্যাম্প ;

(খ) টাংস্টেন হ্যালোজেন ল্যাম্প ;

(গ) প্রজেকটার ল্যাম্প ;

(ঘ) রিফ্লেকটার ল্যাম্প ;

(ঙ) নন্ ফিলামেন্ট ল্যাম্প ;

(চ) ডিসচার্জ ল্যাম্প ;

(ছ) আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প ;

(জ) প্যানোরামা ল্যাম্প ;

(ঝ) হ্বাইজেন ল্যাম্প

স্পট লাইট: (ক) ফোকাস ল্যানটার্ন ,

(খ) লেন্স স্পট ;

(গ) কনডেনসার স্পট ;

(ঘ) ফ্রেসনেল স্পট,

(ঙ) প্রোফাইল স্পট ;

(চ) বাইফোকাল স্পট ;

(ছ) এলিপসয়ডিয়াল স্পট ;

(জ) মিরার স্পট ;

(ঝ) ফলো এবং হাই স্পট ;

(ঞ) সানস্পট ;

(ট) জোন স্পট ;

(ঠ) বেভ-বীম।

কাজ শুরু করার আগে দেখে নিতে হবে :

(১) প্রতিটি স্পটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ল্যাম্প আছে কিনা এবং তার গুণমান স্পটের উপযুক্ত কিনা ;

(২) রিফ্লেকটার ও লেন্সগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা ;

(৩) ল্যানটার্নের অন্যান্য অংশগুলো, যেমন, লেনসটিউব, শাটার, ফোকাস-নব ব্যবহারের উপযুক্ত অবস্থায় রয়েছে কিনা ;

(৪) যে-যন্ত্রের দ্বারা এগুলো আটকে রাখা হয় সেগুলি যথাযথ রয়েছে কিনা ;

(৫) ঝুলন্ত বোল্ট-এর সঙ্গে যে নাট ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা ঠিকঠিক আনা হয়েছে কিনা ;

(৬) প্লাগ-পয়েন্ট দ্বারা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থাগুলো সঠিক হয়েছে কিনা ;

(৭) এ-গুলির সঙ্গে আর্থ সংযোগের ব্যবস্থা ঠিকমতন সুসম্পন্ন কিনা ;

(৮) বৈদ্যুতিক সংযোগের দ্বারা সমস্ত চ্যানেলে ঠিকমতন আলোগুলি জলছে কিনা

এর পরের পর্যবেক্ষণটি হলো সুইচবোর্ডটি ঠিকঠিক মতন কাজ করার জন্য তৈরি আছে কিনা। প্রত্যেকটি চ্যানেল কাজের উপযুক্ত কিনা, দেখে নিতে হবে জলে যাওয়া কোনো ফিউজ রয়েছে কিনা। যদি থাকে সেগুলিকে কাজের উপযোগী করে নিতে হবে।

আলোর সংকেত এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

একে বলা হয় কিউ সিনোপসিস (Cue Synopsis)—মঞ্চের আলোক পরিবর্তন এর মূল কথা। Cue এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : This is the signal given by the stage manager (or directly from the actin on the stage) to carry out a plotted change of lighting. The change may be

slow or fast. A cue is ofcourse not restricted to lighting. অর্থাৎ মঞ্চের আলো যখন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তখনই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সংকেত দিয়ে আলোর পরিবর্তনের কাজটি আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাটি বজায় থাকে বলা হয় 'সংকেত সময়'। সংকেত এর মাধ্যমে যখন পরিবর্তনের কাজটি শুরু হয় ঠিক তার পরবর্তী আলোর অবস্থাকে বলা হয় cue state. এইভাবে আলো যখন নতুন কোনো গতি নেয় তখন তাকে বলতে হবে cue five এবং সেটি যেখানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে তখন ওই অবস্থাকে বলার নিয়ম cue five state. পরিকল্পনায় লেখার নিয়েম্ QT, QS, QS ST.

সংকেত্-সংক্ষিপ্তসার-এর তালিকাটি হচ্ছে কয়েকটি 'Q' সংখ্যা এবং সময় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশ। এই তালিকাটির মধ্যেই লেখা থাকে নাট্যের কোন দৃশ্যে কখন আলো পরিবর্তন করতে হবে বা কোন আলো কতক্ষণ স্থায়ী হবে। নাট্যের বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে কিউ-সিনোপসিস রচনা করলে ভালো হয়। কারণ এর মধ্যে মঞ্চস্থাপত্য, সংগীত, পোশাক-পরিচ্ছদ-এর সম্পর্কও জড়িত। এতে থাকবে Q নাম্বার, Q টাইম, পাণ্ডুলিপির পাতার নম্বর, স্টেজ এ্যাকশন, স্টেজ বিজনেস, স্টেজ মুভমেণ্ট এবং আলোর ব্যবহার। প্রত্যেকটি কিউ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর তা প্রম্পটারের খাতাতেও তুলে দিলে ভালো হয়। যদি কোনো অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে অন্য এক অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ফাঁক জায়গাটুকু সংলাপ দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে, অথবা ব্যবহার করা যেতে পারে সংগীতের স্বরও। মনে রেখো, সত্যিকারের সুশৃঙ্খল সংকেতসার আলোর কাজের বহু সমস্যাকেই সমাধানের করে পৌঁছে দিতে পারে।

ফোকাসিং-এর বিশদ

সবগুলো প্রয়োজনীয় ল্যানটার্ন ঝোলানোর কাজটি শেষ হলে, সেগুলি জ্বলে উঠবার পর ফোকাস দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে থাকে। মঞ্চ দৃশ্যসজ্জা স্থাপিত হলে, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বসবে। তারপর আলোকবিজ্ঞানীর কাজের শুরু। ফোকাসিং-এর জন্য মঞ্চে কমপক্ষে চারজন লোক রাখলে ভালো হয়। ডিমারের সুইচগুলো চালাবার জন্য মইয়ের ওপর চড়ে সব ঠিকঠাকভাবে বসানো আছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করার জন্য চাই একজন আলাদা লোক। তার মানে মঞ্চে কাজের সময় বেশ কয়েকজন সহকারী নিলে মঞ্চালোকবিজ্ঞানীরই সুবিধে বাড়বে। মনে রাখতে হবে সময় এখানে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ সময়ের সঙ্গে তাল রেখেই কাজ করে যেতে

হবে। ইলেকট্রিসিয়ান যদি মইয়ের ওপরে ওঠে তবে অন্য একজনকে নিয়োগ করতে হবে ডিমার নিয়ন্ত্রণের কাজে। ফোকাসিং-এর সমগ্র কাজটি চলাকালীন মঞ্চালোক-বিজ্ঞানীকে স্বয়ং মঞ্চে উপস্থিত থাকতে হবে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবকিছু পরখ করে নিতে হবে তাকে।

সুইচ্‌বোর্ড ব্যবহারের পদ্ধতি ও পরিকল্পনা

সুইচবোর্ডের কাজটিকে চাতুরীপূর্ণ কর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিকল্পনাটি কেবল খাতায় লিখে রাখলেই চলবে না, আলোর সংকেতটি কেমনভাবে কাজে লাগতে হবে, সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে সুইচবোর্ডের আয়তন অনুযায়ী পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। তার মানে সুইচবোর্ড-এর মাপ অনুযায়ী আলোর সংকেতগুলোকে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একটি জুনিয়ার—৮ সুইচবোর্ডের ক্ষেত্রে তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিচার করে কাজ করার নিয়ম। আবার মিনি-২ টাইপ বোর্ডের বেলায় কেবল আঙুলের দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ ও কাজ করা সম্ভব। যে সব মঞ্চে অনেকগুলো প্রিসেট থাকে সেখানে সব কাজগুলিই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে করতে হয়। এর জন্য যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তা কাজ করতে করতেই লাভ করা যায়।

এই বিশ্বের বিখ্যাত মঞ্চালোকবিজ্ঞানীরাই এমনভাবে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, এবং নিয়মকানুন তৈরি করে নিয়েছেন যে, তা অত্যন্ত সহজ ও সরল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সুবিধেটুকু এই যে সারল্য ও সহজ চিন্তার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই সংকট আকারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। এই সব পরিকল্পনার দু'টি দিক থাকে; (১) তৈরি করে নেওয়া একটা অংশ; (২) ওই অংশকে কার্যকর করে তোলা বা কার্যে রূপ দেওয়া। এই যে আপন আপন পরিকল্পনা তার মধ্যে নিজস্বতা তো থাকেই আরও থাকে বৈশিষ্ট্য। ফলে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি, বোধের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়। বিখ্যাত একজন মঞ্চালোবিজ্ঞানী বলেছেন: আলোকসজ্জার জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনার মধ্যেই সমস্ত কিছু বিশদভাবে দেখানো সম্ভব নয়, কারণ যাঁরা এ-কাজ করেন তাঁরা সকলেই রক্তমাংসের মানুষ। কাজেকাজেই কাজ করতে গিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা যেতে পারে; অভিজ্ঞতা খুলে দিতে পারে রহস্য জগতের বন্ধ দুয়ার। তা ছাড়া মানুষের একটু বিশ্রাম বা দম নেবার মতন সময় দরকার। সুইচবোর্ড সম্পর্কে এই রচনায় বিশেষ ধরনের যে দু'টি দিকের কথা উল্লেখ করা

হলো সেটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। নমুনা মাত্র। এ ছাড়াও এ-যাবৎ আবিষ্কৃত যতো সুইচ বা কন্ট্রোল বোর্ড রয়েছে তার একটা তালিকা দেওয়া হলো :

(a) Mini 2 6 way 2 kw. dimmer packs ;

(b) Load patch panel 5kw. Lamp circuit ;

(c) control patch to connect 200 dimmer to 30 control Levers ;

(d) 144 channel duplicate preset ;

(e) 3 Preset control with common switches ;

(f) 100 channel Three set controll with seperate switches ;

(g) 80 channel Thorn series PM 3 presets ;

(h) Original Izeneur 44 channel console ;

(h) Thorn A master 2000 ;

(i) 240 channels as rockers.

১৪.

অনুশীলন : লেভ্ তলস্তয়-এর 'দি ফ্রুটস অব এনলাইটেনমেণ্ট' নাটক অবলম্বনে 'সায়ক' নিবেদিত 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' নাট্যের মঞ্চালোক-পরিকল্পনার খুঁটিনাটিসহ বিশদ—মঞ্চালোক-উৎস, ল্যাম্প, স্পট, ডিমার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় আলোক-সরঞ্জামের তালিকা ; আলোক-সরঞ্জামের ব্যবহারিক নির্দেশ ও ইঙ্গিত, গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চালোক নির্দেশনামা ; গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে চূড়ান্ত আলোর কাজ-এর বিশদ ।

মঞ্চালোক-উৎস, ল্যাম্প, স্পট, ডিমার প্রভৃতি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-তালিকা

(1)+(2)=DINKY (মোট ৬টি) । ২টি থামের পেছন থেকে রেলিং আলোকিত করার জন্য । এগুলো 100 ওয়াট এবং Blue কাগজে মোড়া থাকবে ।

(3)+(4)=২টি 500 ওয়াট জোড়া B Type আলাদা ডিমারে (শাদা)

(5) =২টি 1000 „ জোড়া SPOT (শাদা)

(6) =২টি 1000 ওয়াট জোড়া SPOT [রাত্রির Sequence BLUE এবং ভোরের Sequence-এ AMBER. অন্য সময় শাদা ।

(7) =২টি 1000 ওয়াট জোড়া SPOT (শাদা) (পোর্টিকোর জন্য) ।

(8) =২টি জোড়া BABY SPOT 250 [মঞ্চভূমি ঘেঁষে বসানো থাকবে যাতে বসলে অভিনয়শিল্পীর জন্য আলো পাওয়া যায় ।]

(9) =১টি 250 BABY SPOT (BLUE)

(10) =TOP MIRROR (Amber)

(11) =Stand-এ 500 ওয়াট B TYPE (শাদা) সিঁড়ির জন্য । ভোরে Amber হবে ।

ব্যবহারিক নির্দেশ ও ইঙ্গিত

(১) সর্বদা LIGHTS ON —Back থেকে Front অর্থাৎ (1) To (7) ;
সর্বদা LIGHTS OFF —Front থেকে Back অর্থাৎ (7) To (1)

(২) Day Sequence =ALL LIGHTS
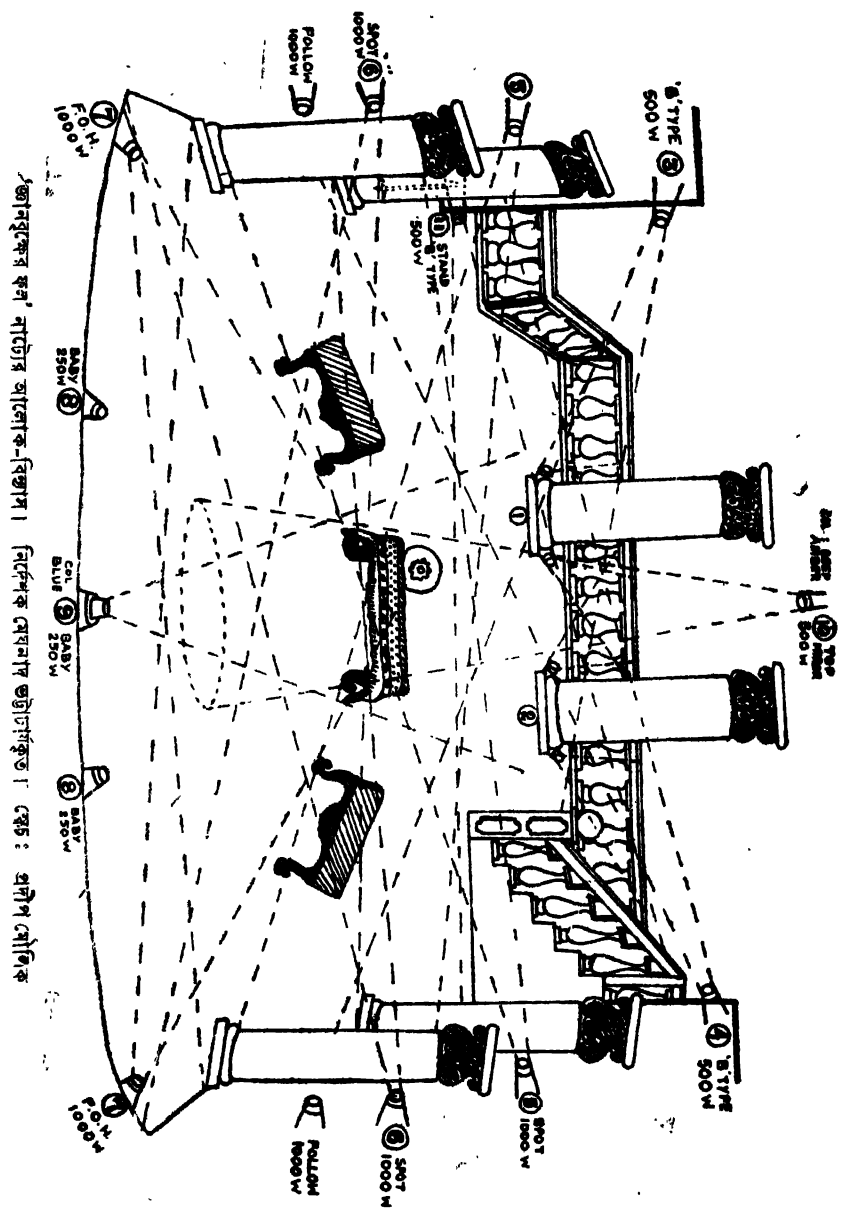
'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' নাট্যের আলোক-বিন্যাস। নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্যকৃত। স্কেচ : প্রদীপ মৌলিক

(৩) Night Sequence =শাদা—(3)+(4)
=BLUE (6) জোড়া এবং Follow ছাঁদা BLUE দিয়ে।

(৪) Morning Sequence=(3)+(4) শাদা
(11)—Amber দিয়ে
(Follow)—শাদা
(6) জোড়া—Amber দিয়ে

(৫) পোর্টিকো (পর্দার সামনে)
Day Sequence : (7) জোড়া (শাদা)
(6) জোড়া (শাদা)
Follow (শাদা)
Night Sequence : (6) জোড়া (Blue)
Follow (ছাঁদা Blue)

গুরুত্বপূর্ণ লাইট-সিকোয়েন্স ও তার প্রয়োজনীয়তা

(১) সঙের দলের নাচের সময় Followতে YELLOW অথবা AMBER থাকবে।

(২) **প্ল্যানচেট টেবিল :** প্ল্যানচেট অধিবেশন মুহূর্তে কেবলমাত্র টেবিল থেকে অভিনয়শিল্পীদের ওপর আলো আসবে। অন্য কোনো লাইট-সোর্স ব্যবহৃত হবে না।

প্ল্যানচেট টেবিলে মিডিয়ামের ওপর আলো ফেলার জন্য 250 ওয়াট BABY টেবিলে লুকনো থাকবে ডিমারসহ এবং ২টি+২টি=৪টি DINKY (নীল কাগজে মুড়ে)র নীলচে আলো অন্যান্য অভিনয়শিল্পীর ওপর। মিডিয়ামের ওপর ভার এলে BABY ওঠানামা করবে।

(৩) জমিদার স্তোত্রপাঠ করতে করতে দোতলার সিঁড়িতে গেলে কেবলমাত্র (4) দিয়ে জমিদারের উঠে আসা দেখাতে হবে। চাষীরাও মঞ্চে ওই LIGHT-এই থাকবে, যাতে নীচ থেকে জমিদারের ঐ ওপরে যাওয়াটা যুক্তিসহ হয়। অন্য কোনো লাইট-সোর্স থাকবে না। অনুরূপভাবে জমিদার-পুত্রের ঘোড়ার গাড়ি করে কলকাতা যাত্রা করাটা কেবলই (3) লাইট-সোর্স চাষাদের ওপরে ফেলে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

(৪) মিত্তু বিরতির আগের Sequence-এ যখন মিডিয়াম হবার কথা ভাববে তখন OPPOSITE FOLLOW ১টি মিত্তুর মুখের একদিক ধরে থাকবে। এবং Music

নিয়ে অল্প ওঠানামা করবে, যাতে মিতুর মনের আলোড়িত অবস্থাকে বোঝানো সম্ভব হয়। মোক্ষদা মঞ্চে মিতুকে ডাকতে আসার সঙ্গে সঙ্গে অল্প FOLLOW আসবে।

যে-মুহূর্তে মোক্ষদাকে মিতু তার গোপন পরিকল্পনাটি বোঝাতে বলবে, সঙ্গে সঙ্গে Follow instant CUT করে (4) BABY জোড়া আসবে। Music-এর সঙ্গে (4) BABY জোড়া Fade out করবে এবং TOP MIRROR (10) amber IN করবে। মিতু মোক্ষদা ফ্রিজ হলে কেবল থাকবে TOP MIRROR. বিরতির পর্দা পড়বে।

(৫) মিতুর যখন ভর হবে তখন অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের ওপর কেবল (4) এবং (11) লাইট-সোর্স থাকবে। মিতুর ওপর ২টি Followতে Violet এবং Green চাপিয়ে আলো ফেলা হবে। মিতুর শরীরের দোলানী এবং Music-এর তালে তালে B TYPF (4) এবং (11) INSTANT alternatively আসবে-যাবে—যাতে অন্যান্য চরিত্রাভিনেতাদের অভিব্যক্তি ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি বোঝানো যায়।

(৬) মিতুর প্রথম ভর-এর পর সমস্ত অভিনয়শিল্পীরা চলে গেলে যখন মিতু আর মোক্ষদা থাকবে এবং জমিদার মিতুকে মিডিয়াম করার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নেবে তখন রেলিঙে (1)+(2) চরিত্রেরা প্রায় sillhoutte থাকবে আর মিতু মোক্ষদার ওপর খুব ছোট করে (কেবল মুখটা) ২টি Follow থাকবে। Sequence শেষ হবে মিতু মোক্ষদার ওপর Dimmer Follow ও পেছনের (1)+(2) দিয়ে sillhoutte করে।

(৭) জমির দলিল চাষীদের হাতে দিয়ে জমিদার যখন তাদের চলে যাওয়া দেখবেন তখন তার অসহায়তা বোঝাবার জন্যে তাকে দাঁড়াতে হবে প্ল্যানচেট-রুমের দরজায়। তখন লাইট-সোর্স (2) ব্যবহৃত হবে এবং ধীরে ধীরে পর্দা পড়বে।

(৮) নাট্যের একদম শেষে অধ্যাপক-এর কথার ওপর জমিদার যখন ধমক দেবেন সঙ্গে সঙ্গে (9) ও (11) Blue দিয়ে instant ফেলা হবে। সকল চরিত্ররা ফ্রিজ হবে। ওদের সামনে দিয়ে চাষীরা যখন নাচতে নাচতে যাবে তখন Followতে AMBER ব্যবহার করতে হবে। ওরা চলে গেলে Follow FADE OUT করবে এবং ফ্রিজ হওয়া চরিত্রদের ওপর (9) ও (11)তে Blue আসবে।

সায়ক অভিনীত 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' নাট্যের দৃশ্যদীপন

[সম্প্রতি প্রযোজিত 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' নাট্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে আলোর কাজ-এর বিশদ পরিবেশিত হলো। শিক্ষার্থীরা এটি পাঠ করে, বুঝে নিয়ে হাতে-কলমে অনুশীলন করতে পারে বা শিক্ষক মশাইরাও করাতে পারেন তাদের দিয়ে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা সায়ক-এর অভিনয়-আসরে উপস্থিত থেকেও আলোর কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। যে-সব দৃশ্যে সব আলোই ব্যবহৃত বা তেমন উল্লেখযোগ্য দৃশ্য নয় তা এখানে বর্জিত হলো।]

চতুর্থ দৃশ্য

পড়ন্ত বিকেল

ALL LIGHTS

বলাই রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে থাকলে আস্তে আস্তে সন্ধ্যে নেমে আসবে

EFFECT

Follow ২টি Blue Mask পরিয়ে FADE IN করার পর একই সঙ্গে (6) জোড়া 1000W FADE OUT হবে। এরপর (6) জোড়া Blue Mask পরিয়ে Slowly IN করবে এবং সঙ্গে (6) জোড়া FADE OUT করবে।

বলাই ॥ ওই তো মা এয়েচেন···

[বলাই রান্নাঘরের দিকে যায় ওপরের সিঁড়িতে সুধামুখীকে দেখা যায়]

ডাক্তার ॥ কী ব্যাপার! আমি তো ওপরেই যাচ্ছিলাম।

সুধামুখী ॥ তর সইছে না। সকাল থেকে আমার পেটটা আইটাঁই করছে—বুকের এ-দিকটা—না, এ-দিকটা ব্যথা; মাথাটা কেমন কেমন করছে···আমার বোধ হয় ইনজিকশন লাগবে।

ডাক্তার ॥ না, লাগবে না। সৃষ্টিধর দত্তকে আপনি ডাক্তারী শেখাবেন?

সুধামুখী ॥ না। বলছিলাম শরীরটা যে আমার ভেঙে পড়ছে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ॥ ভেঙে পড়েছে! এই ভাঙার নমুনা?

সুধামুখী ॥ তার মানে, আপনি চাইছেন আমার শরীর ভাঙুক?

Contd···

আস্তে আস্তে
সন্ধ্যাবেলার
পরিবেশ
রচিত হবে।
(3)+(4)
DIMMER-হবে

ডাক্তার॥ আমার চাওয়ার ওপর কি নির্ভর করে আপনার শরীরটা? কই দেখি, হাত দেখি···

[ডাক্তার হাত দেখতে যায়। সুধামুখী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মোক্ষদাকে ডাকেন। মোক্ষদা গামলায় জল আনে। ডাক্তার নিরুপায় হয়ে হাত ধোয় এবং সুধামুখীকে দেখে।]

সুধামুখী॥ আমার ভেতরে তা হ'লে এখনও অসুখ আছে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার॥ অসুখ কি আপনাকে ছাড়তে পারে—না আপনি অসুখকে ছাড়তে পারেন? এত সহজে তো আপনি কাউকে ছাড়ার লোক নন।

[জলের বালতি নিয়ে মৃত্তিকা বাড়ির ভেতর থেকে আসে। ডাক্তার এবং বাহকের মাঝখানের বাক্সের পেছন দিকে সশব্দে রাখে বালতিটা।]

ডাক্তার॥ তোমার আবার কী মৃত্তিকা?

মৃত্তিকা॥ ধোবো।

ডাক্তার॥ ধোও···

সুধামুখী॥ সন্ধ্যে হয়ে এলো, এখনও ধুস নি?

মৃত্তিকা॥ সময় পেলাম কোথায়? এইবার ধোবো মা।

সুধামুখী॥ দেখছেন ডাক্তারবাবু! রোগ না এসে পারে? এটা কি মানবাড়ি?

Contd···	মোক্ষদা, জল দে ·· (প্রস্থানোদ্যত) ডাক্তার ॥ যান। চান করুন গে··· সুধামুখী ॥ (ঘুরে) সে আপনি বলার অপেক্ষায় থাকবো ভেবেছেন? ছিঃ ছিঃ মিতু, তুই যে এত বে-আক্কেলে হবি—মোক্ষদা, জল দে···(সিঁড়ির দিকে যায়, ফিরে আসে আবার) অ্যাই, বলাই কোথায় রে? মৃত্তিকা ॥ রান্নাঘরে— সুধামুখী ॥ শিগ্গির আগে আমার ওষুধটা আনতে দে। তোদের দ্বারা কোনো একটা কাজ···মোক্ষদা, জল দে—(সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যায়।)
সুধামুখী ওপরে উঠে গেলে (3)+(4) OUT	[মৃত্তিকা রান্নাঘরের দিকে ছুটে বেরোতে গিয়ে আবার ফিরে আসে ডাক্তারবাবুর কাছে] মৃত্তিকা ॥ দিন, কাগজটা দিন ডাক্তারবাবু। আগে বলাইদাকে খুঁজতে পাঠাই। নইলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে। (দৌড়ে ভেতরে চলে যায়)
মৃত্তিকা বেরিয়ে গেলে (6) OUT	ডাক্তার ॥ উঃ কী কাণ্ড! (জুতো পরে ব্যাগ নিয়ে—উঠে চলে যেতে গিয়ে ফিরে বাহকের কাছে এসে দেখে—) ঝাড়-বাতি! (ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যায়।)
ডাক্তার বেরিয়ে গেলে Light Board Side Follow CUT Otherside Follow বাহকের ওপর থাকবে। এবং Back বেলিঙ (1)+(2) শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে Follow OUT বাহক Silhoutte থাকবে।	[নেপথ্যে শাঁখ বাজে। ৩ বার। বাহক একাকী। হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়।]

৮ম দৃশ্য

সকাল

FULL LIGHTS

জেনো, যদি আমি সত্যি কথা দিয়ে থাকি, তবে নিশ্চয়ই আমার মনে পড়বে। (ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়) ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো। তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন।

সুরথ ॥ তিনি যেন আপনাকে ঠিক মনে করিয়ে দেন কর্তা।

অহিভূষণ ॥ তোমরা আমার জমি-জায়গা চাষ করো। আমার শখের আপেল গাছ বাঁচিয়েছ। তোমরা আমার অতিথি—আত্মীয়—আপনজন ; পর নও।

দশরথ ॥ আপনার মত মানুষ হয় না কর্তামশাই—তাই তো বড় আশা করে এয়েচি

অহিভূষণ ॥ অসংখ্য বাসনার······

অহিভূষণ কথা বলতে বলতে Up Stage-এ সিঁড়ির দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবে। (7)+(6)+(5) OUT হবে।

ও ভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্যই জীবের সংসারে মোহবন্ধন। সর্বসংস্কার বর্জিত মায়াহীন অবস্থাই জীবাত্মার আপন স্বভাবস্বরূপ—

[বলতে বলতে ঘুরে গিয়ে সিঁড়ির কাছে চাষীদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। চাষীরাও এর মধ্যে অহিভূষণকে অনুসরণ করে চৌকির সামনে থেকে পেছনে চলে গেছে।]

অহিভূষণ ॥ মনে রেখো মায়ামাত্রামিদং দ্বৈত্যং অদ্বৈত্যং পরমার্থতঃ

সিঁড়ি দিয়ে অহিভূষণ উঠতে থাকবে
(3)+(11)
OUT হবে।
কেবল থাকবে (4).
Other lights OFF

—

[ঘুরে সিঁড়িতে উঠে বলতে বলতে চলে যায়। চাষীরা ঊর্ধ্ব-গগনমুখী হয়ে অহিভূষণের সিঁড়ি দিয়ে গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে]

সরকার ॥ হুঁ!

ক্রমান্বয়ে
(3)+(5)
(11)+(6)+ (7)
IN করবে

—

[বলেই গটগট করে বাইরের দিকে বেরিয়ে যায়। চাষীদের চটকা ভাঙে।]

মৃত্তিকা ॥ কেমন আছ কাকা ?

[দ্রুত চাষীদের কাছে গিয়ে দশরথ, সুরথকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।]

FULL
LIGHTS

—

দশরথ ॥ আর থাকা মা। এই চলে যাচ্ছে—। থাক মা, থাক।

সুরথ ॥ তা হ'লে এই সেই মিতু।…কতো বড় হয়ে গেছে এঁ্যা—

দশরথ ॥ ক্ষেতুদা মরি………তাই নারে ?

মৃত্তিকা ॥ হ্যাঁ, কাকা।

সুরথ ॥ তা হ'লি দশরথ……অপেক্ষা করতি হয়।

দশরথ ॥ এ ছাড়া গতি কি বলো ?

মৃত্তিকা ॥ ঘাবড়াবার কিছু নেই কাকা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

[দেবেন বাড়ির ভেতর থেকে সিগারেট টানতে টানতে আসে।]

দেবেন ॥ কী ব্যাপার ?

চাষীরা ॥ পেন্নাম ছোটবাবু।

দেবেন ॥ জমিতে গণ্ডগোল বেঁধেছে ?

দশরথ। না ছোটবাবু……বাবুর সে-কথাটা মনে নেই।

দেবেন ॥ সেকি! ……আমার সামনে কথা হয়েছে।

Contd... FULL LIGHTS		
	সুরথ ॥	হ্যাঁ ছোটবাবু……আদেশ দিয়েছেন।
	দেবেন ॥	আমি অবশ্য……টাকা এনেছ তো ?
	দীনু ॥	আজ্ঞে……পুরো টাকাটাই নে এয়েচি।
	দেবেন ॥	হাউ স্প্লেনডিড……আমি, আমি আদায় করে দেব।
	দশরথ ॥	বাবু অবশ্য ……জিজ্ঞেস করে বলবেন।
	দেবেন ॥	বোগাস……আজ নয় কেন ?
	মৃত্তিকা ॥	দু'দিন ধরে……আজও আসে নি।
	দেবেন ॥	তা হ'লে আর কি করা যাবে! কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তুই এদের দেখিস…
দেবেন বাইরের দিকে যাবার জন্য Up-stage-এ move করলে (7)+(6) +(5)+(11) OFF হবে এক এক করে।		[দেবেন বাইরে বেরোবার জন্য উইংসের কাছাকাছি যায়।]
	মৃত্তিকা ॥	তোমরা একটু বসো কাকা। আমি আসছি।
		[মিতু বাড়ির ভেতরের দিকে যায়।]
	দেবেন ॥	(ঘুরে চাষীদের)—ও জমি তোমাদের জিতেই হবে। আমি বলে দেব। (প্রস্থান)
	দশরথ ॥	একটু আখবেন ছোটবাবু।
দেবেন বেরিয়ে গেলে (4) OUT হবে। কেবল (3) Source-এ দাঁড়িয়ে থকেবে। অন্য Light থাকবে না।		[দেবেনের যাওয়ার পথের দিকে সানন্দে তাকিয়ে থাকে চাষীরা। প্রণাম করে। নেপথ্যে মহিমের জুড়ি-গাড়ি ছাড়ার শব্দ। ঘোড়ার খুরের শব্দে গাড়ি চালু হয়। চাষীরা আশান্বিত দৃষ্টিতে মুখ তোলে।]

॥ পর্দা আসে।

নবম দৃশ্য

সন্ধ্যা

(6)
Blue Mask
দিয়ে Follow জোড়া
(Blue Mask)

রাজেন ॥ আপনি যাবেন? কী যে বকবক করেন যেখানে সেখানে। হ্যাঁ চলুন। তবে কিনা...সোআরনার ইথারিয়াম—রেসপনসিভ, অনেস্ট মেয়েদের মধ্য থেকেও আমরা মিডিয়াম পেয়ে যেতে পারি। এবং এ-কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে: শান্তিপুরের কিছু বিদগ্ধ মানুষ একত্রিত হয়ে—

রাজেন ও ধরণী বেরিয়ে গেলে (6) OFF হবে। এবং Light Board side Follow CUT হবে। কেবল other-side Follow মিতুর মুখে ছোট করে পড়বে এবং music-এর সঙ্গে ওঠানামা করবে।

[বলতে বলতে ধরণী রাজেনকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।
মিতু একাকী পায়চারী করে। ভাবে। মাথায় হাত বোলায়।
নেপথ্যে আবহ। মোক্ষদা প্রবেশ করে]

মোক্ষদা ঢুকলে
Follow আসবে
Boardside

মোক্ষদা ॥ কী রে মিতু......ওদিকে যে কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেলো।

মৃত্তিকা ॥ মোক্ষদাদি, শোনো—

মোক্ষদা ॥ এখন শোনার সময় নেই। চ'!

মৃত্তিকা ॥ আহা, শোনই না।

[মিতু মোক্ষদাকে টেনে নিয়ে দু'জনে এক সঙ্গে বসে পড়ে]

মোক্ষদা ॥ কী যে বলিস্! তোর বলাই-এর কথা তো? কী বলবি তাড়াতাড়ি বলে ফেল্।

শলাপরামর্শের জন্য ২ জন বসে পড়লে Instant Follow CUT (8) জোড়া আসবে। মিতু,

[দু'জনই বসে মাইমে শলা-পরামর্শ করে।

Contd...	
মোক্ষদা ফ্রিজ হলে আস্তে আস্তে TOP (10) IN করবে। (8) OUT হবে। পর্দা আসবে।	নেপথ্যে আবহ। পর্দা আসে। বিরতি হয়।

দ্বাদশ দৃশ্য

সকাল

FULL LIGHTS

....

[মিতু হঠাৎ গোঁ গোঁ করতে করতে মেঝেতে পড়ে যায়।]

গোপাল ॥ একি মিতু···এই মিতু···কী হলো! মিতু...মিতু (মোক্ষদার প্রবেশ)

মোক্ষদা ॥ কী হয়েছে মিতুর?

গোপাল ॥ কী জানি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ গোঁ গোঁ করে পড়ে গেলো।

মোক্ষদা ॥ ওমা সেকি! নিশ্চয়ই তুই কিছু বলেছিস। শিগগীর পালা এখান থেকে

[গোপাল সভয়ে পালায়]

ওরে কে কোথায় আছিস শিগগীর আয়—ছাখ মিতুর কি হলো···

[মোক্ষদার চিৎকার শুনে এদিক ওদিক থেকে বাড়ির চাকরবাকরেরা, দারোয়ান —সবাই ছুটে আসে। মিতু ডিভানের সামনে, মঞ্চের মাঝামাঝি পড়ে আছে তাকে ঘিরে সকলের জটলা। গুঞ্জন।]

সকলে ॥ কী হয়েছে···কী হলো···একি···কই? দেখিদেখি···এই ডাক্তারবাবুকে ডাক

[সরকারমশাই নিজেই ডাক্তারবাবুকে ডাকতে যায়। কী হয়েছে বলতে বলতে অহিভূষণ, রাজেন, সৃষ্টিধর, ধরণী, সঙ্গে সরকার মঞ্চে আসে। ওপর থেকে সিঁড়িপথে সুধামুখী ও প্রিয়ংবদা নেমে আসে। সকলের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে সুধামুখীর স্বর···

Contd... FULL LIGHTS	সুধামুখী ॥ অ্যাই—কী হয়েছে কি ? এত চিৎকার চেঁচামেচি কিসের ? বলাই ॥ আজ্ঞে মা—ঐ মিতু—কাজ করতে করতে গোঁ গোঁ করে পড়ে গেলো। অহিভূষণ ॥ ডাক্তার, নাড়িটা দেখো তো— (ডাক্তার মিতুর কাছে গিয়ে বসে। নাড়ি দেখে।) ডাক্তার ॥ নাঃ—নাড়ী তো ঠিক আছে! (উঠে) মৃগিটৃগি আছে নাকি ? চোখেমুখে জল দাও— সরকার ॥ আরে জুতো শোঁকাও— [মিতু হঠাৎ অস্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে উঠে বসে]
(7)+(6)+(5) OUT Follow দু'টিতে (Violet ও Blue Mask) Zark দিয়ে মিতুকে ধরবে এবং Dimmer-এ (4)+(11) অন্যান্য অভিনয়-শিল্পীদের ওপরে থাকবে।	মিতু ॥ (চিৎকার) হরিদাস—। হরিদাস, এখানে ন্যাংড়া আমের গাছ পুঁতবো—ন' পাড়ার জমিতে ন্যাংড়া কলম দেবে শিবু— রাজেন ॥ কী বলছে এসব ? [অহিভূষণ মিতুর দিকে এগোয়] সুধামুখী ॥ উহুঁ, কাছে যেও না— মিতু ॥ হরিদাস—হরিদাস ! ন' পাড়ার জমিতে শিবুকে বলে গাছগুলো লাগাবার ব্যবস্থা কর।
	রাজেন ॥ ন'পাড়ার জমি ! শিবু ! হরিদাস ! —কার কথা বলছে ? তা আমি কী করে জানবো আমিও তো শুনছি। স্ট্রেঞ্জ ! দশরথ । অ সুরথদা—এ মিতুর বাবা নয় তো ?

Cue		
Contd...	স্বরথ ॥	আরে তাই তো। এ তো ক্ষেতু! মিতুর ভর হয়েছে গো—
	সকলে ॥	ভর হয়েছে !...
	স্বরথ ॥	মিতুর ওপর ওর বাপ ক্ষেতুর ভর হয়েছে।
	সকলে ॥	অ্যাঁ, বলে কি !
	দশরথ ॥	আমাদের পাশের গাঁয়ে ন'পাড়ার ক্ষেতুদার ধানের জমি ছিলো। তার কথাই বলছে...
(4) ও (11) alternatively আসবে, যাবে Instant.		**[মিতু আবার গোঁ গোঁ আওয়াজ করে মাটিতে কপাল ঠোঁকে। চুলের ঝাপটা মারে। অস্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে উঠে বসে। নেপথ্যে আবহসংগীত।** মিতুর মাথা দোলানীর তালে তালে উপস্থিত অভিনয়শিল্পীদের মাথাও দুলতে থাকে।]
	মিতু ॥	কাছে আয় মা মিতু, কাছে আয়। তোর বাপের কথায় রাগ করিস নে মা। আমি তো তার সঙ্গে তিরিশ বছর ধরে ঘর করেছি। ওর মেজাজটাই যা চড়া—
ALL LIGHTS	স্বরথ ॥	ওমা, এযে মিতুর মা-র কথা !
	দশরথ ॥	ক্ষেতুদার বউ—নীরুদির কথা।
	ধরণী ॥	এখানেও ক্রস কানেকশন। অহিবাবু দেখেছেন, এক আত্মার উপর আর এক আত্মা এসে পড়ছে ! স্ট্রেঞ্জ ! দেয়ার আর মোর থিঙ্গস্ ইন হেভেন—
	স্মৃতিধর ॥	এই এক রোগ। যখনই সুযোগ পাবে, তখনই—

(4) ও (11)
Alternatively
আসবে, যাবে

[মিতু আবার আগের মত নিজের মাথা মাটিতে আছড়ায়। উঠে বসে। সেই সঙ্গে উপস্থিত চরিত্রদের মাথাও সামনে পেছনে দোল খায়। নেপথ্যে আবহ

এক সময় মিতু অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে উঠে বসে]

মিতু ॥ আয়—আয় পটলা—ইদিকে আয়। ও রামদাস, দেখ, তোর ছেলে কী করছে!

সুরথ ॥ রামদাস—ক্ষেতুর ভাই—নসিবপুরে থাকতো।

দশরথ ॥ পটলা রামদাসের ছেলে। ভাল নাম পটুলাল।

দীনু ॥ কিন্তু পটুলাল তো মারা গেছে আজ দশ বৎসর

বৃন্দাবন ॥ মা শেতলার দয়া হয়েছিলো গো—কী কাণ্ড।

রাজেন ॥ চুপ করো। শুনতে দাও।

[মিতু তেমনি মাথা ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে। নেপথ্যে একই আবহ সংগীতের সুর। মিতু আবার অস্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে উঠে বসে।]

মিতু ॥ ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে তবু ছোঁকছোঁকামি—লাজলজ্জা নেই গ—

বৃন্দাবন এ বোধ হয় ক্ষেতুদার বেধবা বোন পদি।

সুরথ ॥ অল্প বয়সে বেধবা হয়েছিলো। বড়ই মুখরা ছেলো। বাড়িতে কাক চিলটাও বসতে দিতোনি—

Contd...

মিতু ॥ আর যদি তোকে দেখেছি ঢ্যামনা—

দীনু ॥ পা[illegible]র বাড়ির নিবারণকে বলছে বোধ হয়।

মিতু ॥ ওরে ধর ধর, গরুটাকে ধর। ক্ষেতে ঢু:ক সব নষ্ট করে দিলো রে। অ্যাই—হ্যাট…হ্যাট…হ্যাট (ক্রমশ উঁচু হয়)

দীনু ॥ হ্যাট…

Follow
CUT
Full liights
IN

[মিতু ধপাস করে পড়ে যায়]

ধরণী ॥ যাঃ কেটে গেলো !

প্রিয়ংবদা ॥ মিতুর খুব কষ্ট হচ্ছে।

সৃষ্টিধর ॥ তাতো একটু হবেই। ধকল যাচ্ছে।

ধরণী ॥ কী অহীবাবু…খুঁজুন, পেয়ে যাবেন।

সৃষ্টিধর ॥ আপনি তো অনেক কিছুই বলেন।

ধরণী ॥ ধুর মশাই। শুধু বলি না, প্রমাণ দেখুন জিওমেট্রিক্যালি প্রুফ…

[মিতু উ উ উ করে আস্তে আস্তে উঠে বসে।

ALL LIGHTS
½ Dimmer-এ
Follow
IN

সকলে ॥ আবার আসছে। আবার আসছে…

[বলতে বলতে সকলে সভয়ে, বিস্ময়ে আগের জায়গায় ফিরে আসে।

মিতু উঠেই আবার নেতিয়ে পড়ে যায়।]

Fallow
OUT
all lights
FULL

সুধামুখী ॥ ওমা এয়ে নেতিয়ে গেলো গো !

প্রিয়ংবদা ॥ মিতুর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

সৃষ্টিধর ॥ বলছি তো হচ্ছে। ওকে এখন একা থাকতে দাও। সব যাও। ভিড় হঠাও—

[ধরণী, অহিভূষণ, রাজেন, সৃষ্টিধর, সুধামুখী, প্রিয়ংবদা, মোক্ষদা, ছাড়া সবাই চলে যায়। মোক্ষদা মিতুর মাথাটা কোলে নিয়ে বসে।]

Contd...	প্রিয়ংবদা ॥ মোক্ষদাদি, তুমি থাকো। একেবারে একা……
	সুধামুখী ॥ ওকে ভাল করে চৌন করিয়ে…কী অলুক্ষুণে কাণ্ড রে বাবা—[সুধামুখী, প্রিয়ংবদা সিঁড়িপথে ওপরে চলে যায়।]
Follow (Light Board side) white	ধরণী ॥ অহিবাবু, এদিকে আসুন— [মঞ্চের বাঁ-দিকে সকলে চলে আসে। চারজনকে একত্রে ফিসফাস করে পরামর্শ করে। মঞ্চের মধ্যিখানে মোক্ষদার কোলে মাথা রেখে মিতু অসাড় অবস্থায় শুয়ে…]
	ধরণী ॥ আমি বলছি অহিবাবু…চালাতে পারি
	রাজেন ॥ এদিকে ব্রজ দাসের…বিলাই করা যায় না।
	সৃষ্টিধর ॥ আর অধিবেশন…ট্রাই করা যাক।
	ধরণী ॥ ট্রাই কি……ইথারপথ সোজাসুজি।
	সৃষ্টিধর ॥ আরম্ভ হলো...
	অহিভূষণ ॥ যাক যাক। আর বিতর্কে কাজ নেই। আমরা তা হ'লে একমত হলাম যে, মিতু মা-ই এখন থেকে আমাদের নতুন মিডিয়াম।
	অন্যান্যরা ॥ নতুন মিডিয়াম !
	অহিভূষণ ॥ প্রফেশন্যাল মিডিয়াম ব্রজ দাসের এখন থেকে আর দরকার নেই।
	অন্যান্যরা ॥ দরকার নেই !
	অহিভূষণ ॥ তা'হলে চলুন, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করি।
	ধরণী ॥ হ্যাঁ, তাই চলুন…1835-এ প্রাসগ্যোতে
ওরা বেরিয়ে গেলে অন্যান্য লাইট Fade out	[কথা বলতে বলতে ধরণী, সৃষ্টিধর ভেতরের দিকে

Contd......... র। বল ২টি Follow একটি ভু ও মোক্ষদা, অন্যটি হিভূষণের ওপরে থাকবে।	প্রস্থান করে। অহিভূষণ যেতে গিয়ে মিতুর দিকে সস্নেহে তাকায়। আবহসংগীত।
অহিভূষণ চলে গেলে Follws CUT মীতু+মোক্ষদা Silhoutte	অহিভূষণ ।। মোক্ষদা—ওকে একটু দেখিস। চোখে-মুখে জলটল দিস। [চলে যেতে যেতে অহিভূষণ সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আবার মিতুর দিকে তাকায়। মুখে হাসি। আবহসংগীত ।। একটু থেমেই অহিভূণ চলে যায়। মোক্ষদা মিতুকে নিয়ে বসে থাকে। ।। পর্দা আসে ।।

পঞ্চদশ দৃশ্য

বিকেল

FULL LIGHTS

....

রাজেন ॥ কর্তাবাবু, আমি আসি। কোর্ট ফেরতা আমি আবার আসবো।

[অহিভূষণ ঘাড় নাড়ে। রাজেন প্রস্থান করে পেছনের দরজা দিয়ে।]

দশরথ ॥ তা হ'লে কর্তাবাবু···মেইয়ে আমাদের মিতু মা।

অহিভূষণ ॥ বারবার... আনন্দের কথা।

দশরথ ॥ তাই বলছিলাম কর্তা... সঙ্গে নে যেতাম।

অহিভূষণ ॥ বিয়ের জন্য ছুটি দেবো না? নিশ্চয়ই দেবো। দু'জনেই আমার ঘরের লোক। যাও—দু'মাসের ছুটি দিলাম।

দশরথ ॥ পেন্নাম বাবু।

চাষীরা প্রস্থান করলে অহিভূষণ ধীর গতিতে UP STAGE-এ দরজার দিকে যেতে শুরু করলে

(6)+(5) FADE OUT হবে

কেবলমাত্র (2) দরজার আলোয় অহিভূষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। বাকি সব আলো নিভবে।

[চাষীরা প্রস্থান করে ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। অহিভূষণ গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়ায়। দরজার পর্দা খোলা। ঘরেও আলো কম। দরজার বাইরে, বারান্দার আলোয় অহিভূষণের দীর্ঘ ছায়া ঘরের ভেতরে এসে পড়ে। অহিভূষণ চাষীদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

॥ পর্দা আসে ॥

সপ্তদশ দৃশ্য

সকাল

FULL LIGHTS	....
	ধরণী ॥ ভেঙে পড়বেন না অহিবাবু···তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।
	সৃষ্টিধর, রাজেন ॥ জ্যামিতি!
	ধরণী ॥ আঃ, সাইলেন্স......অহিবাবু অপেক্ষা বৃহত্তর। ক্লিয়ার?
	সৃষ্টিও রাজেন ॥ না।
	ধরণী ॥ একি! তা এর থেকে মুক্তির উপায় কি? এর থেকে মুক্তির উপায় আমার ফর্মুলা। একটা ব্ল্যাকবোর্ড পেলে ভালো হতো। যাকগে। এক্ষেত্রে আমরা কতগুলো ডিজিট পাচ্ছি? ধর্ম, আত্মা, মিডিয়াম এবং মনোবাঞ্ছা পূরণ। আমরা জানি এ যোগ বি যোগ সি ইজ ইকোয়াল টু···অতএব ধর্ম+আত্মা+মিডিয়াম=২ মনোবাঞ্ছা পূরণ। ও-কে···
	অহিভূষণ ॥ থামুন···
Instant All Lights CUT কেবল Foot Baby (9) Blue Mask এবং (11) Blue Mask Source-এ চরিত্ররা ফ্রিজ হবে। ডাউন স্টেজে Followতে Amber Mask দিয়ে চাষীদের নাচতে নাচতে চলে যেতে দেখা যাবে। চলে গেলে Follow CUT (9)+(11) আসবে।	[সকলে ফ্রিজ হয়ে যায়। নীল আলোতে সবাই স্থির। আবহসংগীত চলে। মঞ্চের সামনের অংশে দেখা যায় চাষীরা আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছে। হাতে দলিল, বাক্স ইত্যাদি। সঙ্গে বলাই, মিতুও। চাষীদের ওপর কেবল Amber। পেছনে নীল আলোতে সবাই স্থির। চাষীরা মঞ্চের একপাশ থেকে নাচতে নাচতে অন্য পাশ দিয়ে প্রস্থান করা মাত্রই ধীরে ধীরে যবনিকা আসে।

॥ সমাপ্ত।

মঞ্চালোকবিজ্ঞান
পরিভাষা

A.

All electric : আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—যার সঙ্গে অন্য কোনোরকম যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল) ব্যবস্থার যোগাযোগ বা যোগসূত্র থাকে না।

Arc : আর্ক ল্যাম্প। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আলোর উৎস, যা কার্বন পোড়ায়। FOH-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অডিটোরিয়ামের পেছন দিক থেকে 'স্পট লাইট প্রজেকটারের' মতন কাজ করে।

Aptitude : ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Anode : ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Anion : „ „ „

Angle of Deviation : ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

B.

Baby spot : ছোট একটি আলোর বিক্ষেপক আধার। সাধারণত ২৫০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন বাল্ব এতে ব্যবহার করা হয়। এবং এই বাল্বের সঙ্গে নিক্ষেপক আলো মঞ্চে ব্যবহারের জন্যে অন্যান্য সাজসরঞ্জামগুলিকেও কাজে লাগানো যায়। মঞ্চের অথবা দৃশ্যের একটি ছোট, প্রয়োজনীয় এলাকাকে এর দ্বারা আলোকিত করা হয়ে থাকে।

Biolumineseem : ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

Backing : বস্ত্রখণ্ড বা ফ্ল্যাট—যা সাধারণত দরজা জানলার বাইরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Bar : মঞ্চে স্পট-লাইটগুলোকে প্রয়োজন মতো স্থাপন করার জন্য অথবা ঝুলিয়ে রাখার জন্য আনুভূমিক ধাতব টিউবে তৈরি এক প্রকার বা এক ধরনের মাচা। কোথাও কোথাও একে 'পাইপ'ও বলে।

Barndoor : ফ্রেস্‌নেল স্পট-এ এটি লাগানো থাকে। চারটি ঘূর্ণায়মান শাটার-এর সমাহার-এ এর যান্ত্রিক ব্যবহার। এর দ্বারা আলোকরশ্মিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং ছড়িয়ে-পড়া আলো এর দ্বারা কেন্দ্রান্বিত করা সম্ভব।

Barrel : সাধারণত দেড় ইঞ্চি গ্যাস-পাইপ—যা আনুভূমিক পদ্ধতিতে টাঙানো। ল্যানটার্ন এবং দৃশ্যকে দূরে নিয়ে গিয়ে ছোট আকারে দেখাতে পারে বা

কোণাকুনিভাবে স্থাপিত ল্যানটার্নগুলোকে 'বুম'-এর সঙ্গে লেগে থাকতে সহযোগিতা করে।

Batten : তিন কি চারটি দণ্ড পরপর মঞ্চের ওপরের অংশে ঝোলানো থাকে। এর সাহায্যে ফ্লাড-লাইট-এর উপকরণগুলি ঝুলিয়ে রাখা যায় এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মঞ্চে একই সঙ্গে নানারকম রঙ-এর মিশ্রণের কাজও সম্পাদন করা সহজ।

Beam angle : ল্যানটার্নের আলোর মোচাকৃতি কোণ।

Beam lights : ল্যানটার্নে লেন্স ব্যবহার না করেও অর্ধবৃত্তাকার প্রতিফলক সৃষ্টি করে এমন সমান্তরাল আলোর রশ্মি সৃষ্টিকারক আলোকযন্ত্র।

Bifocal spot : প্রোফাইল স্পট্-এর সঙ্গে বাড়তি শাটার ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে একই ল্যানটার্নের সাহায্যে নরম ও উজ্জ্বল আলোর কিনারা একই সঙ্গে মঞ্চে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Black light : আলট্রা ভায়োলেট আলো।

Blackout : আলোকবিহীন অবস্থা অথবা আলোগুলোকে সুইচ্-এর সংযোগ থেকে সরাবার ব্যবস্থা।

Boom : মঞ্চে লম্বভাবে স্থাপিত দণ্ড। এই দণ্ডের সাহায্যে প্রয়োজনে মঞ্চে ল্যানটার্ন তুলে ধরা যায়।

Board : Console দ্রষ্টব্য।

Boom Arm : বুম্-এর সঙ্গে যুক্ত ব্রাকেট। এই ব্রাকেটের সাহায্যে ল্যানটার্নগুলোকে আটকে রাখা হয়।

Border : মঞ্চে দৃশ্যাবলী টাঙানোর সীমা চিহ্নিত করণের জন্য পরিকল্পনামাফিক লোহার কিংবা কাঠের পাত বা দণ্ড স্থাপন করা হয়ে থাকে। দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে এগুলো স্থাপিত হয়ে থাকে।

Brail : লাইটিং ব্যাটেন বা ঝোলানো দৃশ্যাংশ। পেছন ও সম্মুখ মঞ্চে কোণাকুনিভাবে স্থাপিত।

Build : ৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Button : Master Control দেখো।

Cable : রবার অথবা তন্তুজাতীয় পদার্থে মোড়া বৈদ্যুতিক তার—সুইচ্ বোর্ড থেকে এই তারের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত করা হয়। অথবা মঞ্চের যে জায়গায় বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেখান থেকে এই তার-এর সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির সংযোজন ঘটানো হয়ে থাকে। মঞ্চের বাইরে অথবা মঞ্চের ভেতরে চলাফেরা করার সময় অভিনয়শিল্পী অথবা মঞ্চকর্মীকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন খোলা তার-এ কোনো অঙ্গ স্পর্শ না করে। তার মানে মঞ্চের বাইরে বা ভেতরে কোথাও খোলা তার না থাকে।

Cathode : ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Cataon : " " "

Channel : মঞ্চে ব্যবহৃত সমস্ত রকমের বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের পথগুলো অবশ্যই। এমনকি ডিমার ব্যবস্থাসহ সব কিছুকেই বোঝায়।

Check : আলোর গভীরতাকে, ঔজ্জ্বল্যকে কমাবার সংকেত।

Cinemoid : ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Circuits : যে-পথে, যে-মাধ্যম দিয়ে মঞ্চের ল্যানটার্নগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর সঙ্গে যখন ডিমারকেও যুক্ত করা হয় তখন এটি হয় চ্যানেল। এ-সত্ত্বেও প্রচলিত নাম সারকিটই।

Columba : ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Compartmental Flood Light : ৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Colouvred : ফ্রেসনেল স্পট-এর লেন্সের পেছন দিকে কালো রঙের দেওয়া আবরণ। এর সাহায্যে অনাবশ্যক আলোর বিচ্ছুরণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

Continuous Spectrum : ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Control Desk : ৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Control Channel : ৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Cross fade : মঞ্চে আলো পরিবর্তন করার সময়ে চ্যানেল-এর আলোর গভীরতা বাড়ানো এবং যুগপৎ অন্যান্য আলোর গভীরতা কমিয়ে দেওয়া।

C. S. I : (Compact source of Iodin) : উচ্চ গভীরতা-সম্পন্ন এক ধরনের ডিসচার্জ ল্যাম্প। বৈদ্যুতিক শক্তির বা ব্যবস্থার দ্বারাও এর আলো ক্ষীণ করা যায় না।

Cue : আলোর পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের সংকেত।

Cue states : ৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Cut : অতি দ্রুত সুইচ পরিবর্তনের সংকেত—যা আলো এবং ধ্বনিকে এক থেকে নিমেষে অন্য অবস্থায় নিয়ে পারে।

Cyclorama : মঞ্চের বিভিন্ন দিকে এবং ওপরের অস্থায়ী দৃশ্য হিসেবে ব্যবহৃত সাধারণ কাপড়। আলোর ব্যবহার। কখনও এর রঙ আকাশী নীল হয়ে থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি হিসেবে অন্য রঙ—অবশ্যই প্রয়োজনে। সোজাভাবে ব্যবহৃত হতে পারে আবার মঞ্চের শেষ প্রান্তে কিছুটা বাঁকা ভাবেও।

D.

Dimm down : বাড়ানো অবস্থা থেকে আলোর গতিকে কমানো।

Dimmer : বিশেষ ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা বলা যেতে পারে ইলেকট্রনিক প্রতিরোধ (Electronic resistance) ব্যবস্থা। যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক শক্তির গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে আলোর গভীরতার বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য এর দ্বারা আনা সম্ভব। আলোর গতিকে কাছ থেকে অথবা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকেও নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আলোর গতি নিয়ন্ত্রণের এই যন্ত্রটিতে নানা ধরনের প্লেট, স্লাইড, রিএ্যাকটার, তড়িৎপ্রবাহের শক্তি কমাবার নানারকম যন্ত্র (transformer) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবং ইলেকট্রনিক-এর সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সুইচের জন্যই বোর্ডে একটি করে আলোর গতি নিয়ন্ত্রক যন্ত্র থাকা উচিত। মঞ্চালোক-বিজ্ঞানী যে-সব আলোর গতি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন মনে করবে সে-ক্ষেত্রেই এর সাহায্য নেবে এটা মনে রাখা দরকার।

Dimm thrown : আলোর গতিকে কমিয়ে আনা। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সীমায় বা গভীরতায় এই আলোর গতিকে কমিয়ে আনতে হয়।

Dimm up : কম অবস্থা থেকে আলোর গতিকে বাড়ানো।

Dimming system : ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Dips : মঞ্চের ভূমিতে বৈদ্যুতিক সকেট বসাবার জন্য কতগুলো পথ বা রেখে-দেওয়া ফাঁক। একে 'ফ্লোর পকেটস' নামে অভিহিত করা হয়।

Discharge : ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Discharge Lamp : অতি উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক ধরনের আলো। মঞ্চে এর ব্যবহার খুবই সীমিত। স্পট-লাইট বা প্রজেকটার ব্যবহারের ক্ষেত্রেই কেবল এর প্রয়োজন। বিদেশের সব মঞ্চেই 'প্রোফাইল স্পট' এর সঙ্গে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Dispersion of light : ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

E.

Electrolysis : ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Electrolyte : ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Effets : ১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Electrode : " " "

Electrics ground : ৬৯ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য।

Electromagnative wave : ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Emergeney lights : জরুরী অলোক-ব্যবস্থা। অগ্নিকাণ্ড বা নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে—মঞ্চ, নাট্যশালার মধ্যবর্তী স্থান এবং প্রবেশ প্রস্থানের পথগুলোকে আলোকিত করাই এই অলোক-ব্যবস্থার কাজ। এর জন্য জেনারেটর-ব্যবহৃত হতে পারে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল উৎপত্তিস্থল থেকে বিদ্যুতে সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কাজ সম্পন্ন করতে হয়। সুইচবোর্ডের সঙ্গে এ-সব আলোর লাইন যুক্ত রাখা বিপজ্জনক। তবে ইলেকট্রিসিয়ান যাতে এগুলিকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে জন্য এর উৎসকে সুইচবোর্ডের কাছে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

Ellipsoidal : বিশেষ ধরনের প্রতিফলক কাচ। প্রোফাইল স্পটেও এ-ধরনের কাচ ব্যবহার করার বিধি প্রচলিত আছে। কোথাও আবার সকল স্পট-এর ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে।

F.

Fades out : ডিমারের সাহায্যে আস্তে আস্তে আলোকে একেবারে কমিয়ে

আনা। অর্থাৎ আলোর দ্যুতি একেবারে শেষ বিন্দু পর্যন্ত কমিয়ে আনা। কিন্তু নেভানো নয়।

Fades down : ৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Fades-up : " " "

Falls proscenium : মঞ্চের সম্মুখভাগের প্রবেশ পথ।

Fill up : ১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Filter : ১০৯ " "

Floats : ফুটলাইটের সহায়তার জন্য এগুলোকে ব্যবহার করা হয়।

Flood : কোনো ল্যানটার্নের সাহায্যে যখন অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ একই উচ্চ গভীরতাসম্পন্ন আলো মঞ্চে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকেই বলা হয় ফ্লাড্।

Floor Pockets : 'Deep' দেখো।

Focal Length : ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Focal plans : " " "

Focus : মঞ্চে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি (চরিত্র/অভিনয়শিল্পী), বস্তুকে স্পষ্টভাবে দর্শকদের সামনে প্রতীয়মান করার ব্যবস্থাজনিত আলোক প্রক্ষেপন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যন্ত্রটিকে আলোর গতিপথ এবং রশ্মি নিয়ন্ত্রণের কাজেই বেশি লাগানো হয়।

Focus spot : ৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Focusing : ১০১ " "

FoH : মঞ্চের সম্মুখভাগে অথচ প্রসেনিয়াম-এর বাইরে—তার মানে দর্শকদের দিক থেকে ব্যবহার করা আলো। ব্যাখ্যা : ফ্রন্ট্ অফ হাউস।

Follow spots : প্রোফাইল স্পট-এর সাহায্যে মঞ্চের সর্বত্র প্রয়োজনীয় আলো ফেলার আলোক যন্ত্র। মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র এই একটি আলোকযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন অপারেটার প্রয়োজন।

Foot-lights : রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপ। ঢাকনাবিহীন লম্বা এবং চওড়ায় খাটো মাপের ধাতু-নির্মিত পাত্রের মধ্যে নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলোর সারির খোপ—মঞ্চের সামনে, ঢালুমতন জায়গায় বসানো থাকে। একে এ্যাপ্রণও বলা হয়ে থাকে কোথাও

কোথাও। তার কারণ দর্শকরা দেখতে পান না। এই আলোগুলোকে একাধিক স্তরে সাজানো যেতে পারে। তবে চালু ব্যবস্থা: তিন স্তর।

Foot-lights trap : পাদপ্রদীপের কৌশল। মঞ্চের সম্মুখভাগে পর্দার সামনে একটি বিশাল আয়তাকার মঞ্চমুখ থাকে। এর দু'দিকের দু'প্রান্তের নীচু দিকে দু'টি খুঁটি থাকে। ওপর থেকে নীচু করে খুঁটি দুটির মাঝখানে একটি গড়ানে ধরনের কাঠামো নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এর ওপরে পাদপ্রদীপের আলো জ্বালবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের নিয়ম অনুযায়ী, এদেরকে নীচু করা হয় শুধুমাত্র মঞ্চে অভিনয়ের সুবিধার্থেই নয়, প্রয়োজনে এটিকে ফেলে মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার করে ফেলাও সম্ভব। সুবিধের জন্য ওপরে খুঁটির প্রান্ত থেকে একজোড়া দড়ি টানানো হয় এবং নীচে, ভূগর্ভস্থ ঘরের মধ্যবর্তী স্তম্ভদণ্ডের পিপার সঙ্গে তা বাঁধা হয়। কাঠামোটির ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দড়িকে ওই একই পিপা থেকে বিপরীত দিকে ভার দেওয়া হয়। স্তম্ভদণ্ড থেকে মঞ্চের মেঝের নীচে একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত কপিকলের সাহায্যে একটি অবিরাম তার টানা থাকে। একটি ভারোত্তলন যন্ত্র দিয়ে ওপরে তোলা যেতে পারে।

Fork : ১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Frequency of Wave : ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Fréshnel spot : এই স্পট মঞ্চে নরম কিণারাযুক্ত আলোক ব্যবহারের কাজে লাগানো হয়।

Fuse : এ একটি কার্টিজ বা একটি বৈদ্যুতিক তার। বিপদ থেকে রক্ষার জন্যও এটি কাজে লাগে। নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ যখনই ব্যবহৃত হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে কার্টিজটি গলে যাবে। একে বিপদ-নিরোধক ব্যবস্থাও বলা যেতে পারে।

G.

Gel : ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Gelatine : আলোকে নানা রঙে রঞ্জিত করার একটি উপাদান। একদিকে আঠা লাগানো কাগজের মতন পাতলা চাদর বিশেষ। আলোক সরঞ্জাম-এর ফ্রেম-এর ওপর এই কাগজের মতো পাতলা নানা রঙের চাদর ব্যবহার করা হয়।

Gate : প্রোফাইল স্পট-এর মধ্যস্থান। এখানে শাটার ব্যবহার করা হয়। রামধনু রঙ সৃষ্টিকারী 'লেন্স' বা 'গোবো'ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

Gauze : মিহি বস্ত্র। এতে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। নেট বা জালের মতো। এর মধ্যে আলো প্রতিফলিত হ'লে কখনও একে স্বচ্ছ দেখায়, কখনও বা নিরেট। এর অন্য একটি নাম : স্ক্রিম।

Gobo : প্রোফাইল স্পটের মুখের মধ্যিখানে বসিয়ে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কাজ হচ্ছে আলোর আকার নিয়ন্ত্রণ করা।

Ground Master : আলোর গতি নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের (ডিমার) হ্যাণ্ডল বা সুইচ-বোর্ডে যে সুইচটি সমস্ত আলোক-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার নাম।

Ground draw (Electric) : তিন কি তিনের বেশি ফ্লাডলাইটকে মঞ্চে ব্যবহার করার ব্যবস্থা। এগুলো অনেকটা 'ফুট লাইট'-এর মতো। মঞ্চভূমিতে অথবা মঞ্চের ওপর ঝুলিয়ে প্রয়োজনমতো আলোর কাজ করে নেওয়া হয়। মঞ্চে দৃশ্যসজ্জার জন্য আলাদা যে 'গ্রাউণ্ড ড্র' (মঞ্চস্থাপত্য—নাট্যবিজ্ঞান / ১ দেখো) সাধারণত সেটি দিয়েই একে আড়াল করে রাখা হয়।

Ground draw (Scenic) : একখণ্ড দৃশ্যাবলী। একে মঞ্চের ওপর খাড়াভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়। উচ্চতা ৫ থেকে ৬ ফুটের বেশি হয় না।

Group : পরিকল্পিত সম্পূর্ণ দৃশ্যসজ্জার একটি স্থায়ী অথবা অস্থায়ী অংশকে এ নামে অভিহিত করা হয়।

Grid (Valve) : থারমিওনিক ভাল্‌ভ্‌সম্পন্ন গেট—যা ইলেকট্রনের প্রবাহকে রেগুলেট করে।

Ground row : একটি অঙ্কিত দৃশ্যের অংশ—যা মঞ্চদৃশ্যের বা সাইক্লোরামার নিম্নাংশকে আড়াল করতে পারে।

H.

Handle : 'Master Control' দেখো।

High hat : নলাকার বস্তু। স্পট-লাইট-এর সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে আলোর কালিকে মঞ্চে খুব সুন্দরভাবে ফেলা যায় এবং আলোকরশ্মিকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা যায়।

Hood : আবরণ বা ঢাকনা অথবা বড়ো ধরনের ধাতুপাত্র বা আধার। এই

পাত্রের মধ্যে আলোক-সরঞ্জাম রাখা হয় এবং এখান থেকেই সেগুলি রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করার কাজ করে।

Hook clamp : মঞ্চস্থিত লম্বা লম্বা বার-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় ল্যানটার্নগুলো ঝুলিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত আংটা।

House-lights : প্রস্থানপথের আলোগুলো ছাড়া রঙ্গগৃহের সমস্ত আলো। এই আলোগুলি সুইচবোর্ড থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। এগুলিকেও ডিমারের ওপর বসানো উচিত।

I.

Image : ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Ion : ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Instrument : মঞ্চে ব্যবহৃত ল্যানটার্নেরই অন্য নাম।

Intake : মিটার, মেইন সুইচ, গিয়ার রাখার ঘর—যেখান থেকে মঞ্চে আলোক সম্পাতের তড়িৎপ্রবাহ বিতরিত হয়।

Iris : গোলাকার এক মধ্যচ্ছদা। প্রোফাইল স্পট-এ ব্যবহার করে 'গেট'এর আকার পরিবর্তন করা হয় এরই সাহায্যে। মঞ্চে আলোর গভীরতা পরীক্ষা করে দেখার জন্যও এটি চোখে লাগিয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

J.

Jack plags : ৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Jill sockets : " " "

K.

Killowatt : এক হাজার ওয়াট। 'ওয়াট' শব্দটির অর্থ তড়িৎশক্তির মান, পরিমাণ।

Knob : ৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

L.

Lamps : একক বৈদ্যুতিক বাল্ব বা টুনি। এগুলো বিভিন্ন শক্তির হয়ে থাকে। মঞ্চে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ৩০০০ ওয়াট পর্যন্ত। (ল্যানটার্ন থেকে যে আলো জোগান দেয়। কখনও কখনও এই শব্দটি ল্যানটার্নের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে শোনা যায়।)

Lens : ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Lantern : আলোক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করা ব্যবস্থা। মঞ্চের কাজের জন্য প্রয়োজন মতো এ-গুলো তৈরি হয়ে থাকে আলাদা আলাদাভাবে। অনেকে একে 'লণ্ঠন'ও বলেছেন।

Laser : ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Layout : প্রযোজনার প্রত্যেকটি ক্ষণে প্রয়োজনে মঞ্চে ও মঞ্চবহির্ভূত স্থানে বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, নানা ধরনের আলোক-যন্ত্র ; ল্যানটার্ন, ল্যাম্প, ডিমার, কণ্ট্রোল বোর্ড বসানোর পরিকল্পনার নকশা।

Laws of Refraction : ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Leks : এলিপসোইডাল প্রোফাইল স্পটকেই অনেক জায়গায় এই নামে অভিহিত করতে শোনা যায়।

Light area : মঞ্চের কোনোকোনো অংশ—নাট্যক্ষণ অনুযায়ী কেমন আলোকজ্জল হবে সেই সব এলাকা। একটি আভ্যন্তরীণ দৃশ্য কল্পনা করা যাক : এ দৃশ্যে মোটামুটি ৬টি আলোর এলাকা বর্তমান। তিনটি আপস্টেজে, তিনটি ডাউন-এ। এবার আলোর এলাকাগুলি চিহ্নিত করা যাক : ১—নিম্নবাম ; ২—নিম্ন মধ্যকেন্দ্র ; ৩—নিম্ন ডান ; ৪—ঊর্ধ্ব বাম ; ৫—মধ্যকেন্দ্র ; ৬—ঊর্ধ্ব ডান। এই অংশগুলি আলোকিতব্য।

Limes : কলো স্পটে ব্যবহারের জন্য এ এক বাড়তি ব্যবস্থা।

Linnebach : মঞ্চস্থাপত্য : নাট্যবিজ্ঞান / ১ দেখো।

Lens : দৃষ্টি সহায়ক বা দৃষ্টি সম্বন্ধীয় কাচ। এই কাচটি (আলোকবিজ্ঞান অংশ

দেখো) সাধারণত আলোর প্রতিসরণের দ্বারা আলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। আবার আলোকে কেন্দ্রীভূত করার জন্যও এই কাচ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়। স্পটলাইটে ব্যবহারের জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন।

Load : ল্যানটার্নকে যখন ডিমারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ ওই ল্যানটার্নে সরবরাহ করা হয় তাকে 'লোড' বলে।

M.

Masking : দৃশ্যাবলী অথবা অন্য কোনো উপকরণ-এর সাহায্যে মঞ্চের সীমা নির্দেশিত হয়ে থাকে। এবং এরই সাহায্যে মঞ্চের অন্যান্য আনুষঙ্গিকগুলোকে দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়। এই উপকরণগুলো সাধারণত মঞ্চের কারিগরি উপাদান।

Master : ভারোত্তলক যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ দৃশ্যসজ্জা অথবা দৃশ্যসজ্জার অংশকে মঞ্চে তুলে ধরা হয়।

Micro Wave : ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Memory : আলোক নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাকে আগে থেকে মনে রাখা বা এ-সম্পর্কিত ব্যবস্থা করে রাখার নাম। ইলেকট্রনিক চালিত বোর্ডের সাহায্যে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

Meroon : ১৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

N.

Neutral : ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

O.

Optical Centre : ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Optical Medium : ২৪ " "

Opposite Prompt (O.P.) : দর্শকদের ডানদিক এবং উপরোল্লিখিত নিয়ম

অনুযায়ী দাঁড়ানো অভিনয়শিল্পীর বাম দিক (দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে)। কোথাও কোথাও বলা হয় 'স্টেজ রাইট'।

P.

Pan : মঞ্চে সমান্তরালভাবে বসানো ল্যানটার্ন বাম কি দক্ষিণ দিকে যখন ঘোরাতে হয় তখন এই সাংকেতিক নামটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Patch : একটি কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মতো ব্যবস্থা। এখান থেকেই 'ডিমার'-এর সঙ্গে সকেট-এর বাইরের দিকের পথগুলি সংযোজিত।

Patch Pannel : ৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Perches : প্রসেনিয়ামের ঠিক পেছন দিকের উভয় পার্শ্বের আলোর অবস্থা।

Phosphorescene : ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Pin matrix : ছাঁচের মধ্যে চিনি ডুবিয়ে কণ্ট্রোল চ্যানেল নির্বাচন করার পদ্ধতি।

Photon : ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Pipe : বার।

Portal : ফ্রেমের মধ্যে আঁটা একটি বস্তু। এর সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আঁটা থাকে পায়াবিশিষ্ট এই বস্তুটি। এর দ্বারা মঞ্চে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোকে আড়াল করে রাখা হয়। একে নানারকমভাবে সুসজ্জিত করতেও দেখা গেছে।

Practical : মঞ্চের দৃশ্যে যখনই টেবিল ল্যাম্প, দেওয়াল বাতি, ব্রাকেট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেখানে বৈদ্যুতিক তার-এর সংযোগে এগুলিকে কাজে লাগানোর নাম।

Prefocus cap : একটি ঢাকনী। আলোর গতিপথ নির্ণয় করার জন্য এটি স্পট লাইটে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Preset : একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি চ্যানেলের সঙ্গে একাধিক ভারোত্তলক

যন্ত্র (lever) যুক্ত থাকে। যার ফলে কিউ-এর আগেই এর সাহায্যে আলোর গভীরতা আনা সম্ভব।

Prism : ৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Principul axis : ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Profile spot : এমন এক ধরনের স্পট লাইট—যার সাহায্যে মঞ্চে কোনো বস্তু বা পাত্র-পাত্রীর একটি নির্দিষ্ট দিক না বা অংশের ওপর আলো ফেলা হয় এবং এর সাহায্যে পরিকল্পিত অকারকে রূপ দান করা সম্ভব। কোথাও কোথাও একে 'লোকো' বা 'এলিপসোডাইল' বলাও হয়।

P. S. (Prompt side) : দর্শকদের ডানদিক এবং উপরোল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী দাঁড়ানো অভিনয়শিল্পীর বাম দিক। অন্য নাম 'স্টেজ লেফট'।

Photoflood : ১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Principal Focus : ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Propagation and velocity : ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Psychedelic : মঞ্চে ব্যবহৃত অত্যন্ত উজ্জল আলোর ছন্দের সঙ্গে শব্দের ছন্দের যোগাযোগ বা সহযোগিতা।

Q.

Quantam Theory : ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

R.

Ray of light : ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Radiowave : ৫১ " "

Rating : তড়িৎশক্তির সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক পরিমাণ। সারকিট বা চিনার চ্যানেল দিয়ে একে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

Rascolin : ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Rectifier :

Reflection of light : ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Refractive Index : ৩২ " "

Remote controls : ৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Resistance dimmer : পুরনো ধরনের ডিমার-এর যান্ত্রিক ব্যবস্থা—এর দ্বারা ল্যানটার্নের তড়িৎপ্রবাহ কমিয়ে আনা হয়।

S.

Secondary Lighting :

Shadow : ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Scatter : প্রধান অলোকরশ্মির চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আলো।

Scenic Projector : ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Screw cap : সাধারণ আলোর আধার। কেবল ব্যাটেন, ফ্লাড্ এবং পুরনো ধরনের স্পটলাইটও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

Scrim : 'গেজ'-এর আমেরিকান নাম।

Solid State : এমন একটি অবস্থা—যখন আলোর গভীরতা একই বিন্দুতে নিশ্চল হয়ে থাকে।

Source of light : ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Spectroscope : ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Spectrum analysis : ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Spigot : এক ধরনের স্ক্রু। ল্যানটার্নের সঙ্গে যে-ঝুলন্ত বল্টু থাকে তার সঙ্গেই এটি লাগানো থাকে। এর সাহায্যে মঞ্চের মেঝে থেকে ল্যানটার্নকে প্রয়োজন মতো তুলে ধরা যায়।

Spote : ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Smu of Light : ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Spill : প্রধান আলোকরশ্মির বাইরে ছড়িয়ে পড়া দ্যুতি।

Spot light : এই আলোকযন্ত্র থেকে নির্গত আলোর সাহায্যে আলোকরশ্মিকে একটি কৌণিক আকার দেওয়া যায়। এবং যে জায়গায় এর থেকে আলো নিক্ষেপ করা হয়—সেখানেও এই আলো কৌণিকভাবেই পড়ে। উচ্চশক্তির উজ্জ্বল এই আলো ৫০০ থেকে ১৫০০ ওয়াট শক্তি সম্পন্ন স্ফটিক বর্ণসম আলোকশক্তি ধারণ করতে পারে।

Strobe : এর সাহায্যে খুব ছোটছোট আলোকবিন্দু এবং অত্যন্ত দ্রুত সেই আলোর ঝলকানি এমনভাবে ফেলা যায় যে, মঞ্চে চরিত্রদের গতিবিধি ক্রিয়াকলাপ এবং নাট্যঘটনা অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন করা সম্ভব। আবার নিশ্চল অবস্থায় এনে অভিনব মুহূর্ত রচনা করাও সম্ভব হতে পারে।

Shutter : ধাতুর তৈরি এই যন্ত্রের সাহায্যে আলোকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কাচের মুখে অর্থাৎ দৃষ্টি সহায়ক কাচ বা পরকলার মুখে, বাইরের দিকে এটি লাগাবার নিয়ম। প্রয়োজন মতো এর দ্বারা আলোক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণত এই ব্যবস্থায় মঞ্চের ½ ভাগ আলোকিত করা সম্ভব। ছোটবড়ো করা এবং চরিত্রের মুখে আলোকে কেন্দ্রীভূত করা যায় এর সাহায্যে।

T.

Tungsten Lamp : একটি সাধারণ বাতি—যার ফিলামেন্টের ঔজ্জ্বল্য ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। আমাদের বসবাসের ঘরে সাধারণত যে ধরনের ল্যাম্প আমরা ব্যবহার করে থাকি, মঞ্চের ক্ষেত্রে এটি তারই বৃহদায়তন সংস্করণ।

Tungsten Hallogen Lamp : এই আলোর ঔজ্জ্বল্য কমানো যায় না, বাড়ানোও না। আয়ু শেষ না হওয়া পর্যন্ত এর ঔজ্জ্বল্য একই থেকে যায়।

Tormentor Lights : একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। সাধারণত এটি বসাবার জন্য টরমেনটরকে বেঁধে নেওয়া হয়। এর সঙ্গে যুক্ত আলোর সারিগুলো আড়াল করে রাখে এটি। মাঝে মাঝে আবার এমনও দেখা যায়, টরমেনটর আলোগুলি আড়াল করছে না। এক্ষেত্রে মঞ্চের সামনের দিকের প্রান্তটি সরাসরি এর পেছনে স্থাপন করা হয় যাতে সঠিকভাবে আলোগুলি মঞ্চে ফেলা যেতে পারে। আভ্যন্তরীণ কোনো দৃশ্যের এই আলো সব সময়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Throw : অভিনয়শিল্পীর অবস্থান (এলাকারও); মঞ্চদৃশ্য বা দৃশ্যসরঞ্জাম এবং ল্যানটার্ন-এর মধ্যেকার দূরত্ব।

Thrust : যে ধরনের মঞ্চের কমপক্ষে দু'দিকেই দৃশ্যাবলী ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং দর্শকদের বসার আসন থাকে দু'দিকে।

Tilt : লম্বভাবে একটি ল্যানটার্নকে ওপর বা নীচ দিকে (মঞ্চে) তোলা বা নামাবার পদ্ধতি।

U.

Ultraviolet Light : অতি বেগ্‌নী আলোকপ্রক্ষেপক বাতি। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে এ-আলো মঞ্চে ব্যবহৃত হয়। একে 'কালো আলো'ও বলা হয়ে থাকে।

W.

Wave-lngth : ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Wattage : তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ বা ক্ষমতা। অথবা একটি ডিমার-এর সর্বোচ্চ শক্তি। এক কিলোওয়াট শক্তি মানেই ১০০০ ওয়াট।

Ways : নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির চ্যানেল সমূহ।

Wings : মঞ্চের ডান ও বাঁ-পাশে অস্থায়ী ও স্থায়ীভাবে ঝোলানো বা বসানো একাধিক কোণাকুনি আড়াল করা এলাকা। নানা ধরনের যান্ত্রিক মঞ্চ-উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা। প্রবেশ প্রস্থানের কাজেও লাগে, আবার এখান থেকে আলোক প্রক্ষেপণের কাজও চালানো হয় প্রয়োজনে।

Work Lights : মঞ্চে সজ্জিত করা প্রয়োজনীয় আলো। এই আলোগুলোকে মঞ্চে এমনভাবে বসাতে হয় যা দর্শকরা দেখতে পান না। মহলার সময়ে বা দৃশ্য পরিবর্তনের সময় এই আলোকে কাজে লাগানো হয়। মঞ্চের পেছনের আলোগুলিকে 'ওয়ার্কস লাইটস্' বলা বলার রীতি আছে। কারণ এ-আলো না থাকলে নেপথ্য কর্মীরা কাজ করতে ভীষণ অসুবিধের মধ্যে পড়েন। অনেক সময় এর অভাবে মঞ্চের পার্শ্বরেখার আলোগুলি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়।

X.

XRay Border : রঞ্জনরশ্মির কিনারা। এক সারি আলো প্রতিফলকের মধ্যে বসিয়ে সাধারণত মঞ্চের সামনের দিকের কাঠের পাটার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফলে মঞ্চের অভিনয় এলাকাকে আলোকিত করে তোলে। সাধারণত একটি সারিতে ছয় থেকে বারোটি বাল্ব থাকে। এগুলো আলাদা ধাতুর রঙের হতে পারে। যে ধাতুর আধারে আলোক প্রতিফলকগুলো রাখা হয়, তার প্রত্যেকটিতে প্রয়োজন অনুযায়ী কাচ বা ওই জাতীয় বস্তু দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়।

Z.

Zoom : একটি মাধ্যম-এর সাহায্যে দু'টি লেন্সের গতিবিধি মানেই 'জুম'। সাধারণত জুম-এ লেন্সগুলো আপনা থেকেই ঘুরতে থাকে। এই লেন্স প্রোফাইল স্পট এবং প্রজেক্টারেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কৃতজ্ঞতাসহ :

1) LIGHTING THE STAGE-by p. corry.

2) STAGE LIGHTING—by T. Fuchs.

3) EARLY ENGLISH STAGE—AND THEATRE LIGHTING by W. J. Lawrence

4) LIGHTING ART, ITS PRACTICE AND POSSIBILITIES —by M. Luckiech,

5) GLOSSARY OF STAGE LIGHTING—by S. R. Mccandless.

6) A METHOD OF LIGHTING THE STAGE—by „

7) A SYLLABUS OF STAGE LIGHTING—by „ „

8) ELECTRIC WIRING, FITTINGS, SWITCHES, AND LAMPS—by W P. Maycock.

9) LIGHTING OF THEATRES AND AUDITORIAMS-by A. L. Powell.

10) LIGHTING FOR THE NON PROFESSIONAL STAGE PRODUCTION—by A, L. Powell and A Rodgers.

11) STAGE LIGHTING—by C. H. Ridge.

12) STAGE LIGHTING, PRINCIPLES AND PRACTICE— C. H. Ridge and F. S. Aldred.

13) THE TECHNIQUE OF STAGE LIGHTING by R. G. Williams.

14) STAGE EFFECTS, HOW TO MAKE AND WORK THEM— by A. Rose.

15) STAGING THE PLAY by N. Lambourne.

16) FIFTY YEARS IN THEATRICAL MANAGEMENT —by M. B. Leavitt.

17) THE AMERICAN THEATRE AS IT IS TODAY— by J M. Brown.

18) INSIDE THE MOSCOW ART THEATRE—by O. M. Sayler.

19) THE ART OF STAGE LIGHTING—by Frederic Bentham.

20) LET THERE BE LIGHT—by Donald Wenslelzer.

21) THEATRICAL LIGHTING PRACTICE—Rubin and Watson.

22) THE DRAMATIC IMAGINATION—Jones.

23) PRACTICAL STAGE LIGHTING—Emmet Bongar.

24) THE LIFE OF THE THEATRE—Julian Beck